[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Library
425617

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

425617

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

অক্টোবর-২০০৭

*Dhaka University Institutional Repository*

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বিমান চন্দ্র বড়ুয়া কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

০৫.১০.২০০৭

(ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

4·5617

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

সূচি

ভূমিকা

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ধর্ম বিশ্বাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উৎসব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লোকসাহিত্য : মেয়েলীগীত, প্রবাদ ও কীর্তন

তৃতীয় অধ্যায় : জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণ, ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

আমার পিএইচ. ডি. গবেষণার শিরোনাম 'বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে উপরিউক্ত শিরোনামে পিএইচ. ডি. গবেষণার জন্য ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে (রেজি নম্বর ১৫৮/২০০৪-২০০৫) আমি নিবন্ধন লাভ করি। বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। কর্মমুখর সংগ্রামময় জীবনে নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমি এ অভিসন্দর্ভ মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর প্রাজ্ঞ বিবেচনা, সততা, অবিরত প্রোৎসাহ ও অনুপ্রেরণা শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তত্ত্বাবধায়কের অনাবিল আন্ত রিকতা, সুচিন্তিত পরামর্শ, প্রাজ্ঞ নির্দেশনা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর অপরিসীম স্নেহে ধন্য ও অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

গবেষণাকালে বিভিন্ন সময় প্রাজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন বাংলা বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রফেসর রফিকউল্লাহ খান, জনাব বায়তুল্লাহ কাদেরী, আমার সহকর্মী পালি এন্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন মুন্সী, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের জনাব সাখাওয়াৎ আনসারী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জনাব আবদুল বাছির, ইতিহাস বিভাগের ড. আমজাদ আলী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর নেহাল করিম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. মিসেস নাছিমা খাতুন, জনাব সোহরাব হোসেন, পপুলেশন সায়েন্সস বিভাগের জনাব মোঃ মেহেদী হাসান খান, মার্কেটিং বিভাগের ড. সমীর কুমার শীল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. জিনবোধি ভিক্ষু, আমার শ্বশুর প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক ধর্মকীর্তি ভিক্ষু (কুমিল্লা) এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া প্রমুখ। এঁদের সহযোগিতা ও আন্তরিক অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তাছাড়া আমি স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক জনাব মইজ উদ্দিন খানকে, যিনি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণকর্মের প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য আমার স্ত্রী মিসেস নীরু বড়ুয়া এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আমার অনুজ শ্রীমান বড়ুয়ার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

# অবতরণিকা

বাংলাদেশ নানা ধর্মাবলম্বী ও জনগোষ্ঠীর আবাস ভূমি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এদেশে বসতি স্থাপন করে আসছে সুদীর্ঘকাল থেকে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়।

বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী অন্যতম। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উঁচু-নীচু, যে কোনো জাতির কাছে তার নিজস্ব ইতিহাস সবিশেষ মহিমাময় ও উজ্জ্বল। একটি জাতির উত্থান-পতনে বহুবিধ কাহিনী জড়িয়ে থাকে। এ কাহিনীতে একদিকে থাকে আনন্দ-গর্ব ও অহংকার, আবার অন্যদিকে বেদনা ও দুঃখ। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের কাহিনী লোকশ্রুতি ও কিংবদন্তিরূপে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এদেশের ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠী সমূহের অন্যতম। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী থেরবাদী বৌদ্ধভাবধারায় বিশ্বাসী। এ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এ যাবৎ মূল্যায়নধর্মী কোনো মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। ইতিহাসভিত্তিক কিছু লেখা রচিত হলেও ধর্ম পরিপালনে, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্নবিষয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা এককভাবে কোনোরকম গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় এদেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধকরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষী এবং বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী। বাংলাদেশের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি এবং সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী কাজ করে যাচ্ছে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আদিবাসী বৌদ্ধদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে না।

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ দেশ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিও অনেক সমৃদ্ধ। আমি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এ অপূর্ণতা দূর করার মানসে 'বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্রতী হয়েছি। লোকসংস্কৃতির অধিকাংশ বিষয়ই মুখে মুখে প্রচলিত। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য ; তাই গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে উপসংহার ব্যতীত তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায় : বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ : ধর্ম-বিশ্বাস ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উৎসব ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

*Dhaka University Institutional Repository*

বিবাহ ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লোকসাহিত্য : মেয়েলীগীত, প্রবাদ ও কীর্তন। তৃতীয় অধ্যায় : জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণ, ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম।

প্রতিটি অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদে যুক্তিনির্ভর তথ্যে এবং তত্ত্বে প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বিশ্লেষণ করা হয়েছে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সবশেষে রয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার 'উপসংহার' অংশ। তাছাড়া বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

## প্রথম অধ্যায়

# বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বৌদ্ধধর্ম এদেশের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধরা থেরবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী। এদেশের সকল বৌদ্ধ মূলত দু'ভাগে বিভক্ত ; সমতলের বড়ুয়া বৌদ্ধ এবং পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী বৌদ্ধ। উভয়ে থেরবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী হলেও তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ ও ব্যবহারে আরাকানী প্রভাব বিদ্যমান।

### ১. বাংলাদেশে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর আগমন ও বসতি স্থাপন

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এদেশে আগমনপূর্বক বসতিস্থাপন সম্পর্কে সুলিখিত কোনো ইতিহাস নেই। যা কিছু আছে তা-ও আবার জনশ্রুতি ও কিংম্বদন্তী পরম্পরায় কুহেলিকায় আবৃত। এ সংক্রান্ত তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো --

ক. মাহবুব উল আলম মনে করেন, ভারতে বৌদ্ধ নির্যাতনের ফলে তিষ্টিয়া থাকা অসম্ভব হলে বৃজি বা বৃজিকাপুত্র উপজাতির এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র সাতশত অনুচরসহ মগধ হতে পলায়ন করার পথে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং আধুনিক নোয়াখালিতে এসে উপস্থিত হন। বড়ুয়া শব্দটি বৃজি বা বজ্জি কথাটার রূপান্তর মনে করা হয়।[১]

খ. ধর্মতিলক স্থবির এর মতে, তারা (বড়ুয়া জনগোষ্ঠী) ক্রমশ দক্ষিণ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে পরে চট্টগ্রাম বিভাগে এসে উপস্থিত হলেন। চট্টগ্রাম বিভাগ সেইসময় আরাকানের বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল। এখানে ধর্মলোপের ভয় নেই ভেবে আরাকানীদের সাথে সমধর্মাবলম্বী হিসেবে তারা বন্ধুরূপে বসবাস করতে লাগলেন।[২]

গ. 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মগধের লোকেরা উপর্যুপরি শত্রুর আক্রমণে অবশেষে মুসলমানের অত্যাচারে বিধস্থ হয়ে বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম, নেপাল, আরাকান প্রভৃতিস্থানে পলায়ন করেছিলেন।[৩]

ঘ. ধর্মাধার মহাস্থবির-এর ভাষায়, বড়ুয়া জাতির মূল উৎস বৈশালীর বৃজি ও কপিলাবস্তুর শাক্যজাতি। অজাতশত্রু ও বিড়ূঢ়বের আক্রমণে তারা বাস্তুহারা হয়ে আসাম হতে ক্রমশ চট্টগ্রাম এসেছে। মতান্তরে ত্রয়োদশ শতকে মোগলদের আক্রমণে মগধ হতে অনেকে সোজা চট্টগ্রাম এসে বসবাস শুরু করেছে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. আবদুল কমির সাহিত্যবিশারদ বলেন ; বৌদ্ধরা এদেশের আদি নিবাসী। তারা নিজেদেরকে মগধবিতাড়িত ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। মগধ হতে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধধর্ম চট্টগ্রামের ছায়াস্নিগ্ধ বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।[৫]

চ. বৌদ্ধদের বড়ুয়া বলা হয়। বড়ুয়া প্রাচীন আর্যবংশধর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়া চট্টগ্রাম জেলায় পর্দাপণ করেন বলে ক্রমে নানাকারণে বৌদ্ধপ্রভাব এ জেলায় দৃষ্ট হয়।[৬]

ছ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, চাঁটগায়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাঁটগা ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বৌদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে নেপালের বৌদ্ধরাই ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুদের উত্তরাধিকারী।[৭]

জ. দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধদের উপর মর্মান্তিক নির্যাতন ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো সমূলে ধ্বংস করার ফলে সেখানে বৌদ্ধদের বসবাস নিরাপদ নয় মনে করে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে গেল। কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ নেপাল ও তিব্বতে চলে গেল। আর বৈশালীর বৃজিবংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বহুসংখ্যক অনুচরসহ মগধ সাম্রাজ্য হতে প্রাণভয়ে পলায়ণ করে পগাঁর পথে আসাম কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে এসে বসবাস করতে থাকে।[৮]

ঝ. সুকোমল চৌধুরী বলেন, বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আরাকানের মধ্য দিয়ে মগধ থেকে এসেছে।[৯]

১.১. অভিমত পর্যেষণা

মাহবুব-উল আলমের মনে করেছেন যে, অত্যাচারিত, নিগৃহীত ও নির্যাতিত বৃজি বা বৃজিপুত্ররা পগাঁর পথে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে কুমিল্লা ও নোয়াখালি পগাঁ শাসনকালে (১০৪৪-১২৮৩ ইং) পাট্টিকারা (কুমিল্লা) পর্যন্ত পগাঁ সামাজ্য বিস্তৃত ছিল। নির্যাতিত মগধের বৌদ্ধরা সেই সময় যদি চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে থাকে তবে তাদের বংশ পরম্পরায় কুললতিকা বৃজি>বজ্জি>বড়ুয়া রূপান্তরিত হওয়ার ক্রমবিবর্তন ধারার রীতি বিরোধী। সাহিত্যশিল্পী গবেষক মাহবুব-উল আলম ইতিহাস রচনায় সিদ্ধহস্ত পরায়ণ হলেও এখানে তার কোনোরকম ছোঁয়া নেই বললেও চলে। সুতরাং সঙ্গতকারণেই এ জনশ্রুতিটি হয়ে পড়েছে নিথর স্থবির প্রাণস্পন্দনহীন ও অলীকতথ্য নির্ভর। এখানে কোনোরকম বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। ধর্মতিলক স্থবির-এর তথ্যে দেখা যায়, তারা রাজশাহীর উপর দিয়ে আসামে প্রবেশ করে এবং সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং ধর্মলোপের ভয়ে তারা আসাম ত্যাগ করে চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি অনুমান নির্ভর একটি যুক্তি। কারণ আসাম ত্যাগ করে তারা কুমিল্লা, নোয়াখালি কোথাও বসবাস না করে সোজা চট্টগ্রাম চলে যাবার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভিককাল থেকেই ১৩৩৯ ইং পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম,

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালি ও কুমিল্লা আরাকানের শাসনাধীন ছিল। এমতাবস্থায় তারা কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস না করে সোজা চট্টগ্রামে গিয়ে বসবাসের কোনো যৌক্তিকতা এখানে দেখা যায় না। তাছাড়া দীনেশ চন্দ্র সেন, ধর্মাধার মহাস্থবির ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ এদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে মগধ থেকে আগত বলে স্ব-স্ব অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। নুরুল হক তার বক্তব্যে ৬ষ্ট/৭ম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের বসবাস করার কথা উল্লেখ করে বলেন, এ সময় শশাঙ্কের অসম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ অনুসারীদের চলে আসা স্বাভাবিক। তবে তারাও কুমিল্লা এবং নোয়াখালি অঞ্চলে বসবাস না করে সোজা চট্টগ্রাম গিয়ে বসতি স্থাপনের কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় তাঁর এ তথ্যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কোনোরকম বাক্-বিতণ্ডায় বা বির্তকে না গিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বৌদ্ধদেরকে ভারতবর্ষীয় বলে অভিহিত করেছেন। নূতন চন্দ্র বড়ুয়ার বক্তব্যটি অনেকাংশেই যুক্তিনির্ভর হলেও তিনিও তাদের সংখ্যা উল্লেখ করেননি। সুকোমল চৌধুরীর উক্তিটি কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা তার এহেন মনগড়া জনশ্রুতি ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুকদেরকে নিরুৎসাহিত করবে। তিনি মনে করেন বড়ুয়ারা আরাকানের মধ্য দিয়ে মগধ থেকে এসেছে। এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিমত তাঁর । যা উপরিউক্ত সকল তথ্য ও অভিমতকে বিরোধিতা করছে। আরাকান সুদূর প্রাচীনকাল থেকে স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল ; ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তখন ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়ানমার) অস্তিত্ব ছিল না।[১০] আরাকানে যেতে হলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যেতে হয় কিন্তু মগধ থেকে সরাসরি পদব্রজে আরাকানে গমনাগমনের যোগাযোগের কোনো উপায় আগেও ছিল না এবং বর্তমানও নেই।

সচরাচর জনশ্রুতিকে লোকপ্রবাদ এবং কিংবদন্তী বলা হয়। অনেক সময় জনশ্রুতি জনরব বা গণরবে পরিণত হয়। উল্লেখ থাকে যে, জনশ্রুতি কালে নতুনত্ববর্জিত হয়ে পূর্ব প্রথানুযায়ী প্রচলিতধারার অনুগামী হয়ে গড়ে উঠে এবং অসাধারণভাবে অলংকৃত হলেও সর্বোপরি ভাষার পরিবর্তনের ন্যায় বহুল রূপান্তরিত হয়। অতিশয় আবেগময় ব্যাখ্যা, অলীখ, অস্বচ্ছ, বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্নভাবে উপস্থাপিত এবং সৃষ্ট এহেন জনশ্রুতি অন্তকালের পথে তেমন কোনো বেশী স্থায়ী হয় না। বরং অনেকাংশে বির্তক ও জটিলতা বাড়ায়। সুতরাং বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এদেশে আগমন তথা বসবাসের সঠিক কোনো সন-তারিখ কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ঐতিহাসিক তথ্য-তত্ত্ব প্রমাণ ও যুক্তি নির্ভর দলিলাদিও একেবারে নেই। প্রাণসংহারের আশঙ্কায় মগধবাসীরা ৬/৭ শতকে প্রথমবার ১২শ শতকে দ্বিতীয়বার এদেশে এসেছিলেন বলে উল্লিখিত তথ্যে দেখা যায়। আবার অনেকে পেশোরারে গিরিগুহায়, কাশ্মীরের উপত্যাকায়, নেপালের তরাই অঞ্চলে ও আসামের বনজঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে।[১০] বাংলাদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ দেশের আদি বাসিন্দা। খৃ. পূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারের জন্য সুবর্ণভূমিতে যেই মিশন প্রেরণ করেন তারা চট্টগ্রাম হয়ে সুবর্ণভূমিতে (বর্তমান মায়ানমার)

Dhaka University Institutional Repository

গমন করেন। তৎসমকালীনসময়ে ভারতবর্ষ থেকে সুবর্ণভূমিতে গমনের এটাই ছিল সহজ পথ। স্বাভাবিকভাবে ধর্ম প্রচারকরা এ সময় চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তখন চট্টগ্রামের স্থানীয় আদি জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল।[১১] সবশেষে বলা যায়, মগধ থেকে বিতাড়িত হয়ে চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের বসবাসের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়। চট্টগ্রাম ৬/৭ শতাব্দী বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তারা যেহেতু বৌদ্ধ ছিল সুতরাং তাদের হাতে প্রাণসংহারের কোনো ভয় না থাকায় তারা ঐ অঞ্চলে এসে বসতিস্থাপন করে নিরাপদে নির্ভয়ে বসবাস করে। তাছাড়া বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়।[১২] পৃথিবীর সর্বত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা সংখ্যালঘিষ্ঠ-এর উপর নানারকম নির্যাতন নিপীড়ন করলে তারা নিকট স্বধর্মীদের নিকট আশ্রয় নেয়। এমতাবস্থায় মগধে (আধুনিক দক্ষিণ বিহার) ধর্মীয় সঙ্কিুতা অরাজকতা দেখা দিলে বঙ্গের আরাকানের শাসনাধীন অঞ্চলে বৌদ্ধরা চলে আসা খুবই স্বাভাবিক নয় শুধু যৌক্তিক বটে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সেই সময় এইদেশে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ছিল না। এদেশে মুসলিম রাজত্বের বহুপূর্বে বৌদ্ধরা বসবাস করতো।[১৩] নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই সত্যতা প্রতিপাদন করে -- মগধাগত বৌদ্ধরা ধর্মীয় সূত্রে একাত্ম হয়ে আত্মরক্ষার ঠাঁই পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, তারা (আরাকানী) মগধের সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন করে নিল।[১৪]

## ১. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উদ্ভব ও বিকাশ

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, একসময় এ বাংলাদেশ বৌদ্ধদের পুণ্যময় পবিত্র তীর্থভূমি ছিল। কালের বিবর্তনের ক্রমধারায় নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে আজো এদেশে হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। এ জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই বসবাস করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। বর্তমানে কিছু কিছু আদিবাসী বৌদ্ধ বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, নঁওগা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলেও বসবাস করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। বড়ুয়া বৌদ্ধ ও আদিবাসী বৌদ্ধ। আদিবাসী বৌদ্ধরা পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে এবং বড়ুয়া বৌদ্ধরা চট্টগ্রামে বসবাস করে।

নৃতত্ত্ববিদদের বক্তব্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্নকারণে ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে আগমন করেছিল ---- নিগ্রো (Negrito), অস্ট্রিক (Proto Australoid), মঙ্গোলীয় (a. Palaeo Mongoloid, b. Tibeto Mongoloid), দ্রাবিড় (a. Palaeo Mediterranean b. Mediterranean), আলাপানীয় (Alpinoid) আর্মেনীর (Armenoid), দিনারীয় (Dinaric), নর্ডীয় (Nordic), আর্য (Aryan) প্রভৃতি গোত্রের বহিরাগত জনগোষ্ঠী। তাদের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতি তথা বাঙালি জাতি।[১৫] বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এ দেশের

*Dhaka University Institutional Repository*

বৃহত্তর বাঙালি জাতিভুক্ত। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক পর্যায় শব্দটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। সাধারণত সমসাদৃশ্য বিশিষ্ট কোনো এক বিশেষ শ্রেণীকে আমরা জাতি হিসেবে অভিহিত করি। যেমন ---- আর্যজাতি, হিন্দুজাতি, মুসলিমজাতি, আদিবাসীজাতি, বড়ুয়া জাতি ইত্যাদি। এখানে সকল জাতিই নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী অনুসরণ করে। এতে বোঝা যায় বিশিষ্ট অবয়বগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বিশেষ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করার ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান থাকলেও সবাই নিম্নলিখিত[১৬] লক্ষণগুলো একবাক্যে স্বীকার করে নেন। যেমন ----

ক. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং

খ. গায়ের রং

গ. চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য

ঘ. দেহের দীর্ঘতা

ঙ. মাথার আকার

চ. মুখের গঠন

ছ. নাকের আকার

জ. শোণিতবর্গ (Blood group)

বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মূলত চট্টগ্রামকেন্দ্রিক হলেও জীবনসংগ্রামে তারা এখন বাংলাদেশের সর্বত্রে বসবাস করছে। চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে ১৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকানে প্রথম রাজ্য স্থাপন কর্তা রাজা চন্দ্র সূর্যের চট্টগ্রাম অভিযানে অংশগ্রহণকারী মগধাগত সৈনিকদের সংমিশ্রণে চট্টগ্রামে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসীদের উদ্ভব হয়।[১৭] আরাকানে এখনো অনেক বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা বসবাস করে। নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই সত্যতা প্রদান করে --

> আরাকানে বেশ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ অধিবাসী বাস করে। তারা বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করে। তাদের সঠিক লোকসংখ্যা জানা যায় না। বড়ুয়া বৌদ্ধরা চেহারা ও দৈহিক গঠন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা মঙ্গোলীর রক্তের ধারক ও বাহক সুপ্রাচীন আরাকানী বর্ণ সংকর। কিন্তু অভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও আরাকানের বড়ুয়া বৌদ্ধরা আরাকানী বৌদ্ধদের সাথে মিশে যেতে পারে নি। কারণ আরাকানীরা বড়ুয়া বৌদ্ধদের সাথে রক্তের সম্পর্ক স্থাপনে নারাজ।[১৮]

আরাকানী শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজজীবনে মগধ এবং আরাকানের প্রভাব বিদ্যমান। বৌদ্ধসমাজ জীবন ও সংস্কৃতির মানসগঠনে এক মিশ্রিত রক্তধারার বহমান প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।[১৯] আরাকানের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত গ্রন্থ 'রাজোয়াং' সূত্রে জানা যায়, ১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধের চন্দ্রসূর্য (১৪৬-১৯৮ খৃষ্টাব্দ) নামক এক সামন্ত রাজা চট্টগ্রামে রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার রাজা হন। তখন মগধ থেকে রাজা চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে আগমনকারী সৈন্য-সামন্তরা এই রাজ্যের অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে প্রথম ভারতীয় ধর্ম, ভাষা সংস্কৃতিতে দীক্ষা দান করেন।[২০] বর্মী ইতিহাসপঞ্জি অনুসারে ৬-৭ শতক চট্টগ্রাম বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীন ছিল। ৭৮৮-১০১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে বেসালি[২১] নগরে এক চন্দ্রবংশ রাজত্ব করেছিলেন। এ বংশের আদিপুরুষ মহাসিংহ চন্দ্র[২২] (৭৮৮-৮১০) এবং তাঁর বংশধর চূড়াসিংহ চন্দ্র[২৩] (৯৫৩-৯৫৭) পর্যন্ত চট্টগ্রাম অধিকার ও শাসন করেন। সুতরাং ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামের আদিবাসিন্দার একটি অংশকে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

ঐতিহাসিক যুগের অধিকাংশকাল আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রাম একই ধর্ম পরিপালনকারী আরাকানী বৌদ্ধদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে রক্তের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং মোঙ্গলীয় রক্তের বিস্তার লাভ করে। তার প্রমাণ দেখা যায় বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর দৈহিকগঠনে, আকারে, নাক ও মুখের অবয়বে। স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী আরাকান ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আভারাজ বোধপয়া (১৭৮২-১৮১৯) প্রথম আরাকানরাজ্য জয় করে ব্রহ্মদেশ ভুক্ত (বর্তমান মায়ানমার) করেন।[২৪] বোধপয়ার আক্রমণে আরাকানবাসীরা নানাভাবে নির্যাতিত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হতো এবং শিশু-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে নিহত হতো। এ সময় প্রাণরক্ষার্থে হাজার হাজার আরাকানবাসী বাস্তুভিটা বা বসতবাড়ীর মায়া-মমতা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসময় তারা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করার ফলে জৈবিক চাহিদার (Biological needs) কারণে স্থানীয় বৌদ্ধ ও আরাকানী বৌদ্ধদের মধ্যে পুনরায় বৈবাহিক সম্বন্ধ শুরু হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আরাকানে বর্মীশাসন (সমগ্র মায়ানমার) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যান্দাবুর চুক্তির (য়্যাগুনো সন্ধি) ফলে আরাকানে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে একদেশ থেকে অন্যদেশে (আরাকান-চট্টগ্রাম) যাবার কোনোরকম বাধা-বিপত্তি কিংবা অসুবিধা থাকলো না। ফলে এদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কুমিল্লা অঞ্চলের জনগণ আরাকানে এবং আরাকানের জনগণ এদেশে এসে ব্যবসাবাণিজ্য করার সুবাদে বিয়ে করে সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ W.W. Hunter তাঁর 'Statistical Account of Bengal' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করে লিখেছেন ----

> The Rajbansis and Baruas of Chittagong are also Burmese descent ; but their origin is not purely Burmese .....they have adopted Hindu customs and the Bengali Languages. Both Rajbansis and Baruas live in the plains ..... . The District Census report returns

Dhaka University Institutional Repository

> the nunber of Burmese Rajbnansis at 10.852 and of Baruas at 381. They are offspring of Bengalee women by Burmese men and they have adopted Hindu Coustoms and Bengali Languages.[২৫]

উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায়, বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার) প্রথম আদম শুমারির কাজ সম্পন্ন করা হয়। এখানে তিনি আরাকানকে বার্মা, আরাকানের অধিবাসীদেরকে বার্মিজ বলে উল্লেখ করেছেন। Hunter-এর উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়, তখন চট্টগ্রামে (১০৮৫২+৩৮৩) ১১,২৩৩ জন বড়ুয়া বৌদ্ধ ছিল। তারা সবাই আরাকানী বর্ণসংকর। তবে 'Assam District Gazetteer'[২৬]-এ ৫৮,৭৪৬ জন পুরুষ এবং ৫৭,০৩৯ জন মহিলা রাজবংশীর নামোল্লেখ থাকলে কোনো বড়ুয়া উপাধিধারী সংখ্যার উল্লেখ এখানে নেই। রাজবংশী ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সাধারণ ভাষার বড়ুয়াদেরকেও মগ (Magh) বলে অভিহিত করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে মগ (Magh) বা মঘ শব্দটি মগধ শব্দজাত বলে ধারণা করা হলেও বস্তুতপক্ষে এ শব্দটি দ্বারা আরাকানীদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হতো। বড়ুয়া ও রাজবংশী এ শব্দ ২টি বাঙ্গলা শব্দ।[২৭] এ সময় রাজবংশী পদবীর ন্যায় বড়ুয়া পদবী গ্রহণ তেমনভাবে শুরু হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজবংশী ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বার্মিজ (আরাকানী) বংশোদ্ভুত। তারা বাঙালি নারী ও আরাকানী পুরুষের ঔরসজাত। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব Arthur P. Phayre বলেন ----

> It (Magha) is given to them (Arakanese) by the people of Bengal and also to class of people now found mostly in the district of Chittagong and who called themselves 'Rajbansi'. The Latter claim to be of the same race as one dynasty of the Kings of Arakan and hence the name they have themselves assumed. They are Buddhist in religion ; their Language now Bengali of Chittagong dialect ; and they have a distinctive physiognomy but it is not Mongolian.[২৮]

উল্লেখ্য যে, W.W. Hunter রাজবংশী ও বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীদেরকে আরাকানী বংশোদ্ভুত বলতে বেশ স্বাচ্ছন্দবোধ করছেন। অন্যদিকে Arthur P. Phayre রাজবংশী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে আরাকানের কোনোএক রাজার বংশধর বলে উল্লেখ করলেও তার সমর্থনে তিনি এখানে কোনো রাজবংশের নামোল্লেখ করেন নি। তাছাড়া 'Assam District Gazetteer'-এ বর্ণিত রাজবংশী সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেখা যায় না। এদিকে বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী আরাকানী সংশ্রবকে অস্বীকার করে নিজেদেরকে মগধের বৃজি

Dhaka University Institutional Repository

রাজবংশের বংশ বলে দাবী করতো, তাই তারা রাজবংশী।[২৯] বড়ুয়াদের পূর্ব পুরুষরা স্বধর্মাবলম্বী বৌদ্ধদের সঙ্গে নিরাপদে বসবাসের জন্য বৌদ্ধদেশ ভারত হতে আরাকানের সন্নিহিত চট্টগ্রামে আসে, ইহাই যুক্তিযুক্ত। যেমন বহু মুসলমান পাকিস্থানে চলে গেছে।[৩০]

ধর্মতিলক স্থবির বড়ুয়াদের মধ্যে আরাকানী নাম ও ভাষার বহুল প্রচলন এবং আচার-আচরণ একই দেখে তাদের আরাকানী বর্ণ সংকর বলা মহাভুল বলে অভিহিত করেছেন।[৩১] অতীতে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন-অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকানীরা চট্টগ্রাম শাসন করেছে। বড়ুয়া এবং আরাকানী উভয়েই পাশাপাশি অবস্থান করতো। দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া বলেন, এ সময় বড়ুয়া বৌদ্ধরা আরাকানী নাম, পোষাক ধর্মীয় কিছু কিছু সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও নিজেদের স্বকীয়তা কখনো বিসর্জন দেয়নি। সামাজিক অনুমোদনে বৈবাহিক সম্পর্ক হতো না।[৩২] অর্থাৎ তাঁরা উভয়েই বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে, আরাকানী রক্ত সাঙ্কয্য বিরাজমান তা অস্বীকার করেছেন। আসলে যুক্তিটির তেমন কোনো জোড়ালো সমর্থন নেই। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আরাকান জনগণেরই শাখা। বড়ুয়া ও আরাকানীদের ইতিহাস সম্পুর্ণ অবিচ্ছেদ্য।[৩৩] বড়ুয়াদের সাথে আরাকানীদের সম্পর্কের প্রমাণস্বরূপ আরাকানের ম্রাউক উর তেজ রাম বৌদ্ধবিহারে সংরক্ষিত প্রস্তর শিলালিপির ৪র্থ প্রস্তর ফলকে বড়রোয়া এবং ধর্মীয় দান শিলালিপিতে 'মেন দউলা ছৌমন চ বরং রোয়া' হিসেবে উল্লিখিত।[৩৪] ধারণা করা হয়, এখানে 'বররোয়া' বলতে বড়ুয়াকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত এদেশের মুসলিমদের যেমন হিন্দুও বৌদ্ধ বর্ণসংকর বললে ভুল হয় না। তেমনিভাবে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে বর্ণসংকর জাতি বললে এ জনগোষ্ঠীকে হেয় করা হয় এমন কল্পনা করা অযৌক্তিকও বটে। তাছাড়া বড়ুয়া জনগোষ্ঠী যে সংকরজাতি তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের দৈহিক গঠনে, অবয়বে, ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠানে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী শুরু থেকে বাঙালি জাতি সত্ত্বায় বিশ্বাসী ছিলো এবং আরাকানী, হিন্দু ও মুসলিম আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হতো। ওমেলি ও বড়ুয়া ও রাজবংশী সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন ---

> The Rajbansi or Barua Maghs are the offspring of Bengali, women by Burmese men or more generally of Arakanes mother by Bengali father. They live in plains, where they have settled down, to advocation simillar to those of the people among whom they dwell ; and they are largely employed as cooks in Calcutta. They have adopted Hindu customs and the Bengali Language.[৩৫]

উপরিউক্ত তথ্যে দেখা যায়, যে, W.W. Hunter রাজবংশী ও বড়ুয়া বৌদ্ধদেরকে বঙ্গলনার গর্ভে বার্মিজ (আরাকানী) পিতার ঔরশজাত অভিহিত করেছেন। Arthur P. Phayre'র বক্তব্যেও তার সমর্থন পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায়।[৩৬] আবার বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে ওমেলি বার্মিজ পিতা ও বাঙালি মাতা কিংবা বার্মিজ মাতা ও বাঙালি পিতার ঔরশজাত বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসবিদ D.G.E. Hall -এর নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই প্রতিধ্বনি সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করে। তিনি বলেন ;

> Arakanese disclaim the name and apply it only to the Products of mixed marriages on the Bengal frontier.[৩৭]

এদেশের আদি বৌদ্ধ আরাকানী[৩৮] ও বাংলাদেশের[৩৯] ছেলে-মেয়ের সাথে বিবাহবন্ধনের ফলে এবং রক্তের সম্পর্কের কারণে রাজবংশী ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর উদ্ভব। কালের ক্রমবির্তনে তারা একমাত্র ধর্ম ছাড়া হিন্দু আচার ও সংস্কৃতি সবই অধিগ্রহণ করেছিল।[৪০] এভাবে উদ্ভব কালের ক্রমধারায় তারা দেশী মগ বা বড়ুয়া মগ নামে অধিকতর পরিচিত লাভ করে। কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেন ; ১৫৬২ শতকে আরাকানরাজ পর্তুগীজদের সাহায্যে ত্রিপুরা জয় করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। সেখানে একজন মগ শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। এ সময় আরাকানপতি পর্তুগীজদেরকে তথায় সংস্থাপনপূর্বক তাদেরকে স্বীয় রাজ্যের সীমান্তরক্ষণে নিযুক্ত করলেন। এ সময় অনেকে রমণী সংযোগে এক নূতন জাতীয় জীবের সৃষ্টি করল। মিশ্র পর্তুগীজ সন্তানগণ নিম্নশ্রেণীর বাঙালি সংযোগে একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করল। তারাই দেশী মগ বা রাজবংশী।[৪১] বাঙলা ভাষাভাষী ও বাংলাদেশ চিরকালই বিভাষী বিদেশী বিজাতিদেশ। অধিবাসীরাও মোটামুটি বিভিন্ন তরঙ্গে ও কালে আসা নানাগোত্রের ও অঞ্চলের বহিরাগত। প্রথম তরঙ্গের লোক দ্বিতীয় তরঙ্গে আসা লোকের কাছে হয়েছে পরাভূত, পর্যুদস্ত তবে অরণ্যে-পবর্তে পালায়নি কিন্তু তাদের মানতে হয়েছে প্রভূত্ব। এমনি করে এসেছে, অষ্ট্রিক, নিষাদ, এসেছে আলপানীর, আর্য, এসেছে দ্রাবিড়, ডেভিড, কৃষিজীবী, এসেছে মঙ্গোল-কিরাত তারপর ঐতিহাসিক যুগের বিজেতা হিসেবে এসেছে মগধ থেকে নন্দ মৌর্য-সুঙ্গ, কন্ব-গুপ্ত, পাল-সেন ; এসেছে চন্দ্র বর্মণ, দেবখড়্গ প্রভৃতি বহিঃবঙ্গীয় শাসক গোষ্ঠী।[৪২] মগ ও পর্তুগীজরা বাংলার সমুদ্র উপকুলবর্তী জেলাগুলোতে দস্যুবৃত্তি[৪৩] করত। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ছিল তাদের দাস ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এই ব্যবসায়ে মেয়েরা পণ্যরূপে ব্যবহৃত হতো। কাজেই এ উপলক্ষে এতদঞ্চলে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল অবিরত।[৪৪] আহমদ শরীফ রাজবংশী, চাকমা, মারমা, আরাকানীদের স্বল্পসংকর মঙ্গোলীয় বলে অভিহিত করেছেন।[৪৫]

বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি অংশ। এখানে রাজবংশী এবং বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে যদি এই গোত্রীয় ধরে নেওয়া হয় তবে বলতে হয় রক্তসাঙ্কয্য বলেই এমনটি হয়েছে। ঐতিহাসিক দেবধর্মা তত্ত্ববিধি পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন ; রাজবংশী বা বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে বড়ুয়া মগ বলে। বড়ুয়া ও রাজবংশী দুই-ই বাঙালা শব্দ। ব্রহ্ম, পালি বা মগি ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

নহে।[৪৬] বড়ুয়া জনগোষ্ঠী রাজবংশী পদবীধারী ; তারা মগধের রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতো। তাই তারা ঊনিশ শতকের পূর্বে নিজেদের গোত্র পরিচয়ে রাজবংশী পদবী ব্যবহার করতো। তবে এখন কোনো বৌদ্ধরা রাজবংশী পদবী ব্যবহার করে না। হিন্দু ঘরে জন্মজাত নিম্নশ্রেণীর অনেকেই এখন রাজবংশী উপাধি ব্যবহার করে।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। তাদের ধারণা, এদেশে বসবাসরত মুসলিম যেমন আরব থেকে আগত, সকল হিন্দু যেমন আর্য তেমনি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ মগধ হতে এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছে এবং বড়ুয়া নামে সমধিক পরিচিত। মগধ থেকে আসার পূর্বে যে এদেশে বৌদ্ধ ছিল বড়ুয়া জনগোষ্ঠী একেবারে মানতে নারাজ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে 'বিশ্বঘোষ অভিধান' হতে কিছু অংশ নীচে প্রদান করা হলো ----

শিক্ষিত বড়ুয়া মগগণ বলে যে, তাহারাই প্রকৃত রাজবংশী যেহেতু তাহারা মগধের কোনো হিন্দু রাজবংশ হতে সম্ভূত হইয়াছে। মগধের রাজবংশ এক সময় মুসলমানের আক্রমণে আত্মরক্ষার সমর্থন না পাইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পালাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হইয়াছে। অপর একটি আখ্যায়িকা হতে জানা যায় যে, তাহারা চট্টগ্রামের প্রতিভাবান বৌদ্ধ রাজবংশের বংশধর। আরাকানী বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে ক্ষেমারগিরি নামে অভিহিত করে। পর্বতবাসী বৌদ্ধ মগদিকের নিকট ইহারা ভূমিয়া (ভূঞা) মগ নামে পরিচিত। বড়ুয়াদিগের মধ্যে সাধারণত তিনটি উপাধি দেখা যায়। সকলেই বড়ুয়া পদবী ধারণ করে। কেবলমাত্র কার্যদ্বারা যে বংশের পুর্বপুরুষ চৌধুরী বা মুৎসুদ্দী আখ্যা লাভ করেছিল তাহাদের মধ্যে এখন ঐ সকল উপাধি বর্তমান আছে।[৪৭] বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে বর্ণ সংকরজাতি বলে অভিহিত করা যায়। যেহেতু তাহাদের মধ্যে মগধ, হিন্দু, আরাকানী, পাহাড়ী (আদিবাসী), পুর্তগীজ রক্ত প্রবাহিত রয়েছে। তবে আরাকানী এবং মগধের প্রভাব বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যধিক।

সুদীর্ঘকাল আরাকানীবাসী বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধদের সাথে একসাথে বসবাস, ভাব-বিনিময়, আদান-প্রদান এবং ধর্মীয় সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে মগ নামে অভিহিত করা হতো। ১৯৫০-৬০ শতকে কিংবা তারও পরে বড়ুয়া পাড়া অবৌদ্ধদের নিকট মগপাড়া নামে চিহ্নিত হতো। বাস্তবিকপক্ষে নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে আরাকানী বৌদ্ধ ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তর সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়।

### ৩. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে আচার-আচরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রভাব চিরকাল বিদ্যমান। যা বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য।

### ৩.১. আরাকানী প্রভাব

মোগলবিজয়ের পূর্বে (১৬৬৫) পর্যন্ত আরাকানী বৌদ্ধদের শাসনাধীন ছিল চট্টগ্রাম। তারাই ছিল সেই সময় সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠী। আরাকানী বৌদ্ধদের সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা ও আত্মিক সম্পর্কোন্নয়ন তথা দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাসের ফলে এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে আরাকানী সংস্কৃতি-ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল।[৪৮]

### ৩.১.১. গোষ্ঠী

'গোষ্ঠী' বলতে গোত্র বা বংশকুলকে বোঝায়। মানুষ মাত্রই রক্তের সম্পর্ক উন্নয়নে এগিয়ে যাবার আগে গোষ্ঠীর তদারকি করে। এখনো আরাকানী ঢং-এর কিছু গোষ্ঠী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে দেখা যায়। যেমন : ফুঙ্গি গোষ্ঠী, মুলাইং গোষ্ঠী, ছিদাইং গোষ্ঠী, হাছংগ্রী গোষ্ঠী, লেবাইং গোষ্ঠী, কপিতাং গোষ্ঠী ইত্যাদি।

### ১.১.২. নাম

'নাম' বলতে আখ্যা, অভিধা ও সংজ্ঞাকে বোঝায় । যার দ্বারা কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে অনেকের মধ্যে চেনা যায়। একসময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরাকানী নাম বহুল প্রচলিত ছিল, যেমন : মংপ্রু বড়ুয়া, মমপ্রু বড়ুয়া, চাইলাপ্রু বড়ুয়া, হোয়াপ্রু বড়ুয়া, কেজপ্রু বড়ুয়া, হ্লেপপ্রু বড়ুয়া, ময়ুপ্রু বড়ুয়া, মহাপ্রু বড়ুয়া, পোয়াংগ্রীপ্রু বড়ুয়া, ছাতাপ্রু বড়ুয়া, চরপপ্রু বড়ুয়া। তাছাড়া সপ্তদশ শতক এবং অষ্টদশ শতকে বৌদ্ধভিক্ষুর মধ্যেও আরাকানী নামের প্রভাব দৃষ্টনীয়। নামগুলো হল চাইন্দ্যা মহাস্থবির, নাইন্দ্যা মহাস্থবির, অঙচান মহাস্থবির, কঙলা মহাস্থবির, অঙলা মহাস্থবির ও লোহান মহাস্থবির। কালের ক্রমপরিবর্তনে এ ধরনের নাম এখন বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে আগের মতো কেউ রাখে না।

### ৩.১.২ দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলী

বর্তমানও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী তাদের আচার-আচরণে, ক্রীয়া-কর্মে অনেক আরাকানী শব্দের প্রয়োগ করে থাকে। যেমন --- ক্যং/কেয়াং (বৌদ্ধ বিহার), ছোঁয়াইং (বুদ্ধ ও ভিক্ষু-শ্রামণদের আহার), মইসাং (শ্রামণ), ঘেইং (সীমাঘর), রাচি (সাধু মা বা মহিলা ব্রহ্মাচারিনী), সাবাইক (ভিক্ষু শ্রামণদের আহারের ভিক্ষাপাত্র), লোথক (ভিক্ষুধর্ম ত্যাগীজন), কারেঙ্গা (ভিক্ষুর সেবক), থাগা (উপাসক), ভং (বড় কাঁসার ঘন্টা), ফারিক (সূত্রপাঠ), ফরাদং (পূজার বেদী), ফানাবাজি (ফানুস), বথি (ফানুস উত্তোলনে ব্যবহৃত একধরনের কাপড়, ফাং (বৌদ্ধ-ভিক্ষু-

Dhaka University Institutional Repository

শ্রামণদের নিমন্ত্রক), ছাদাং (পূর্ণিমা), ফরা (বুদ্ধ), তরা (ধর্ম), সাংঘা (সংঘ), আন্নকা (পশ্চিম), ওয়াইক (বহু ভিক্ষুর সমন্বয়ে মাসব্যাপী পরিশুদ্ধ হওয়ার অনুষ্ঠান), জাদি (চৈত্য), আলং (চৌকি), লাং (পরকীয়া প্রেমিক), রাউলি (গৃহীভিক্ষু), চাঁই (ভিক্ষুশ্রামণদের পরিধেয় বস্ত্র), লাপফইর ছোঁয়াই (মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে মৃতদেহ সৎকারের দ্বিতীয় দিবসে ভিক্ষুকে পিণ্ডদান দেওয়া)।

### ৩.২. হিন্দু প্রভাব

বিভিন্ন সময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আরাকানী বৌদ্ধদের সাথে বসবাস করলেও ক্রমে তারা অনেকসময় হিন্দু আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কেননা বাংলাদেশে বড়ুয়া এবং হিন্দু সেই প্রাচীনকাল থেকে এদেশে সহাবস্থান করে আসছে। সুতরাং কিছু কিছু হিন্দু সংস্কৃতি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে অনুপ্রবেশ করেছিল কথাটি অযৌক্তিক নয়।

#### ৩.২.১. নাম

হিন্দুধর্মীয় অনুসারে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নামগুলো নিম্নরূপ ; বলরাম বড়ুয়া, সীতারাম বড়ুয়া, কানু বড়ুয়া, রামচন্দ্র বড়ুয়া, গণেশ চরণ বড়ুয়া, অর্জুন বড়ুয়া, জগন্নাথ বড়ুয়া, কালীপদ বড়ুয়া, হারাধন বড়ুয়া, দুর্গারাণী বড়ুয়া, শ্যামা বড়ুয়া, লক্ষ্মী বড়ুয়া, স্বরস্বতী বড়ুয়া। তাছাড়া অনেকসময় ভিক্ষুদের মধ্যেও এরকম নামের প্রভাব দেখা যায়। যেমন : রামদাশ মহাস্থবির, রাধাচরণ মহাস্থবির, অমরচান মহাস্থবির, রামধন মহাস্থবির ইত্যাদি। তবে ভিক্ষুদের মধ্যে এধাণের নাম এখন প্রচলিত নেই তবে গৃহী নামের ক্ষেত্রে প্রচলন আছে।

#### ৩.২.২. দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলি

দীর্ঘদিন পাশাপাশি হিন্দু ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাস করার ফলে কিছু কিছু ধর্মীয় শব্দ দ্বারা বড়ুয়া জনগোষ্ঠী প্রভাবিত হয়। শব্দগুলো নিম্নরূপ ; গোয়াই (বুদ্ধমূর্তি), মন্দির (বৌদ্ধ বিহার), ঠাকুর (বৌদ্ধভিক্ষু), পুরোহিত (ধর্মপূজা)

এদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী অতীতে আরাকানী, হিন্দুধর্মীয় নামগ্রহণে আগ্রহ থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সারমিত্র মহাস্থবির (সারমেধ) এর সান্নিধ্যে এসে তারা ধর্মীয় নামগ্রহণে এগিয়ে আসে। গৃহী নামগুলো : সিদ্ধার্থ বড়ুয়া, রাহুল বড়ুয়া, বুদ্ধকিংকর বড়ুয়া, প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, প্রদ্যোত বড়ুয়া, অশোক বড়ুয়া, অমিতাভ মুৎসুদ্দী, শাক্যপদ বড়ুয়া, বোধিজ্যোতি বড়ুয়া, অর্থদশী বড়ুয়া, গোপা রাণী বড়ুয়া, বিশাখা বড়ুয়া, গৌতমী বড়ুয়া, মহামায়া বড়ুয়া ইত্যাদি। তাছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর-শ্রামণের নামগুলো : প্রজ্ঞালোক, আনন্দামিত্র, সাধনানন্দ, শুদ্ধানন্দ, জ্ঞানোলোক, প্রিয়ানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মদশী, বিপুলবংশ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকাল ধরে আরাকানী ও বড়ুয়া একত্রে বাস করলেও তাদের ভাষা, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

পরবর্তীকালে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়।[৪৯] সামাজিক জীবনযাত্রায় ইসলামের কিছু কিছু প্রভাব দেখা গেলেও নামকরণের ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন্য ব্যবহারে কোনোরকম ইসলামিক শব্দের প্রয়োগ নেই। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কদাচিৎ এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে নামকরণে খ্রীস্টান প্রভাবও লক্ষণীয়। যেমন ঃ মাইকেল বড়ুয়া, রিগ্যান বড়ুয়া, রবিন বড়ুয়া, নিক্সন বড়ুয়া ইত্যাদি।

৪. বড়ুয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

হোসেন শাহ'র পুত্র নুসরত শাহ ১৫২৪ মতান্তরে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম দখল করে তখন উত্তর চট্টগ্রামে বসবাসরত আরাকানী মগেরা আরাকানে চলে যায়। এটাকে 'মগধাওনী' বলে।[৫০] ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ ও চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়। অত্যাচার আর পীড়নের ভয়ে পর্তুগীজরা মুগলদের আশ্রয়ে চলে আসে।[৫১] পরবর্তীকালে পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনকে বশীভূত করে শায়েস্তা খানের (১৬৬৬) সেনাবাহিনী আরাকান রাজাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নিলে এখানে মোগলআধিপত্য বিস্তৃত হয়।[৫২] ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগলবিজয়ের প্রাক্কালে হিঙ্গুলী, মিরেশ্বরী, কুমিরা, হাটহাজারী এবং চট্টগ্রাম শহরে বসবাসরত অসংখ্য আরাকানী মগ দক্ষিণাভিমুখে পালিয়ে যায়। ইতিহাসে এটা প্রথম মগ ধাওনী নামে পরিচিত।[৫৩] প্রাচীনকাল থেকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকানী রাজ্যভূক্ত ছিল।[৫৪] ইংরেজ (১৮২৪) আগমনের পর আরাকানীরা একেবারে এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। একে শেষ মগ ধাওনী বলে।[৫৫] উল্লেখ থাকে যে, ১৫২৪/১৫২৫ খৃষ্টাব্দে পালিয়ে যাওয়া মগকে 'প্রথম মগধাওনী' বলে। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী যাকে প্রথম মগ ধাওনী (১৬৬৬) বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন আসলে তা হবে দ্বিতীয় মগ ধাওনী।

মগ ধাওনীর পূর্বে কৃষিকাজের সুবিধার্থে, পানীয়জলের আশুসুবিধার্থে মগরা খাল খনন ও পুস্করিণী খনন করেছিল। যা পরবর্তীকালে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুরণিত হয়ে থাকে। যেমন--- মগদাই খাল (মগদারি) (আবুরখীল-আধার মানিক-রাউজান), মইগ্গা পুকুর (দক্ষিণ ঘাটচেক-রাঙ্গুনীয়া)। তাছাড়া মগ পাড়া (বিশেষ করে বড়ুয়া পাড়াকে বোঝায়)। চট্টগ্রাম থানার অর্ন্তগত ১৩ নং উরকিরচর ইউনিয়নের আবুরখীল নামক গ্রামের উত্তরদিকে মগদাই খাল (মগদারি) এখনো বর্তমান। ধারণা করা হয় ; অসংখ্য অসংখ্য মগ এ খালের উভয়তীরে বসবাস করতো। 'মগ' বিতাড়িত হলে তারা প্রাণনাশের আশঙ্কায় পালিয়ে যায়। তখন থেকে উক্ত খালের নাম হয়ে যায় মগদাই (মগদারি)। তাছাড়া একই ইউনিয়নের দক্ষিণ দিকে বড়িয়াখালি নামে এখনো একটা গ্রামের অস্তিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজমান। ১৫২৪/১৫২৫ থেকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে এ অঞ্চল থেকে আরাকানী মগেরা পালিয়ে গেলেও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী পালিয়ে যায়নি। এতৎদঅঞ্চলের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, বড়ুয়া খালি অপভ্রংশ হয়ে বড়িয়াখালি হয়েছে। সেই সময় এ অঞ্চলে বড়ুয়া ও আরাকানী মগ পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে বসবাস করতো কাজেই মগ বড়ুয়া এবং বড়ুয়া মগ হয়েছে এমন ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই আরাকানী মগের পালিয়ে যাবার সময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীও পালিয়ে গিয়েছিল এমন ধারণা থেকে বড়ুয়াখালি>বড়িয়াখালি হয়ে থাকা স্বাভাবিক। এখনো মগদাই (মগদারি) নদীর উভয় তীরে ও অসংখ্য বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস সেই অতীতকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একসময় ১০নং পূর্বগুজরা ইউনিয়নে (রাউজান) আধার মানিক মগধবহুল ছিল। এমন আভাস পাওয়া যায় এতিম কাসেম এর 'আওরা দ্যা বারোজ প্রশাস্তি' নামক প্রবন্ধে।[৫৬] এখানে 'মগ' বলতে তিনি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে চেয়েছেন। আরাকানী বৌদ্ধ ও বাঙ্গালী বড়ুয়া বৌদ্ধদের জীবনযাত্রা, বেশভূষা, ভাষা, গোষ্ঠীর ইতিহাস, গায়ের রং, চেহারা, নাসিকা, চুল, শারীরিক গঠন, দৈহিক আকৃতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। বড়ুয়া বৌদ্ধ ও আরাকানী বৌদ্ধদের 'মগ' বলা হয়। তারা একইধর্মের অনুসারী হলেও মূলত 'মগ' বড়ুয়ারা একার্থবোধক শব্দ নয়।[৫৭]

## ৫. বড়ুয়া শব্দের আদি উৎস ও তার প্রায়োগিক ব্যবহার

বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে কখন থেকে বড়ুয়া উপাধির প্রচলন হয়েছে তার সঠিক কাল নিরূপনে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত তথ্য সূত্রে বড়ুয়া সম্পর্কিত বিষয়ে জানা যায়। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসকৃত অভিধানে[৫৮] অর্থ করা হয়েছে বড়েয়া>বড়োআ>বড়ুয়া। আরাকনের রাজা বাহুবলির সময় থেকেই তাঁর পরিবারের বংশধরেরা 'বররোয়া' হিসেবে অভিহিত হতো এবং আখ্যাপ্রাপ্ত হতেন। সুতরাং বড়রোয়া>বড়ুয়া হওয়া স্বাভাবিক।[৫৯] আবার নতুন চন্দ্র বড়ুয়া বড় আর্য (বর অরিয়>বউড়গ্যা>বড়ুয়া রূপান্তরিত হয় বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন।[৬০] প্রায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নতুন চন্দ্র বড়ুয়া বক্তব্য পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানের ৩৪০ নং ধারায় তফশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের শিক্ষা ও চাকুরীক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বেড়ুয়া সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্টিগোচর হয়। বেড়ুয়া শব্দটি (বেড়ুয়া>বড়ুয়া) বড়ুয়া শব্দের অপ্রভ্রংশ রূপ।[৬১] বড়ুয়া জনগোষ্ঠী শাশুড়িকে হাযোয়া বা আর্যমা বলে ; যার অর্থ শ্রেষ্ঠ মা। সংস্কৃত বটুক শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, উচু। মাগধী ভাষা অকারন্তে শব্দ আকারন্তে উচ্চারিত হয়। তদ্ধেতু বটু'ক (বটুকা)>বড়ুয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আরাকানী বৌদ্ধরা এদেশের বৌদ্ধদের ম্রার্মাগ্রী বলে ; যার অর্থ বড় বা শ্রেষ্ঠ। এ অর্থে বড়ুয়াদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে। মহান, শ্রেষ্ঠ ও বড় বা সম্মানিত অর্থে বড়ুয়া শব্দটির প্রায়োগিক ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে ভারতে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে তফশীলি নিম্নশ্রেণীভুক্ত বৌদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে বড়ুয়া শব্দটি আক্ষরিক ও প্রায়োগিক ব্যবহার দেখা যায় সর্বপ্রথম আসামে। আসামে অহোম রাজাদের কার্য পরিচালনায় সৃষ্টি প্রশাসনিক পদের মধ্যে বড়ুয়া পদ অন্যতম। ধারণা করা হয়, সেনাপতির বিভিন্ন উপাধির মধ্যে বড়ুয়া পদটি অনন্য। 'বড়ুয়া' ছিল 'হাজারীর' উপরিস্থপদ। 'বড়' শব্দ থেকে বড়ুয়া পদবীর সৃষ্টি হয়েছিল।[৬২] An Comprehensive History of Assam' নামক গ্রন্থে 'বড়ুয়া' সম্পর্কে উল্লেখ আছে ; An officer of Ahom government being the head of a department or Khel or mel which had no phukan or the deputy of a department which was presided by over by a phukan.[৬৩] তাছাড়া 'Assam in the Ahom age' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, যোগ্যতা-মেধারভিত্তিতে আসামের রাজদরবারে বড়ুয়ারা নিজেদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।[৬৪] বড়ুয়ারা সেই সময় অফিসের বিভিন্ন প্রশাসনিক গোপনীয় শাখা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সাহস ও সততার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। নিম্নলিখিত উক্তিটি তারই সত্যতার প্রমাণ প্রদান করে ---

> Next in to the phukans were the Baruas of whom there were twenty or more including the Bhandari or treasure ; the Duliya Barua who had charge of the kings planguins ; the Chandangiya Barua who superintended executions ; the Thanikar Barua, or chief of artificer ; the Sonadar Barua, or mint master and chief Jeweller ; The Beji Barua physician to the royal family ; the Hati Barua, Ghora Barua and others.[৬৫]

তাছাড়া এ সময় 'বর বড়ুয়া' (Bara Barua) নামে একটি নতুন পদও সৃষ্টি করা হয়। শুধু তাই নয় ; তাদেরকে প্রধান উপাদেষ্টা (Chief Adviser) হিসেবেও নিয়োগ দান করেছিলেন।[৬৬] চৈতন্যপূর্ব ঐতিহাসিক পঞ্চদশ শতকের পদাবলী সাহিত্যের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদে বড়ুয়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পদটি নিম্নরূপ ;[৬৭]

একে তুমি কুলনারী  কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়া বধূ

'বড়ুয়া' শুধুমাত্র বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর একমাত্র উপাধি নয়। বড়ুয়া উপাধিধারী জনগোষ্ঠী মধ্যে পেশাধারী আরো কিছু পদবী দেখা যায়। মুসলিম শাসনামলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে যারা স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, তাদের উপাধি ছিল মুৎসুদ্দী। মুৎসুদ্দী পদবীধারী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী দেখা যায় পাহাড়তলী ও পশ্চিম আধার মানিক গ্রামে (রাউজান-চট্টগ্রাম)। তাছাড়া আনোয়ারা থানায় এটি মুছুদ্দি পাড়া (বড়ুয়া) আছে ; যার পরিবার সংখ্যা বারো। তাছাড়া গাছবাড়িয়া (চন্দনাইশ-চট্টগ্রাম), উখিয়া (কক্সবাজার) দেখা যায়, শিকদার

Dhaka University Institutional Repository

(সর্দার) ; মহাজন দেখা যায়, রামু (কক্সবাজার) অঞ্চলে। সিং, সিংহ ও হাজারী দেখা যায় কুমিল্লা অঞ্চলে। ভূমির রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ভূমিখণ্ড তালুক ও তরফ এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হল। যাদের তালুক ছিল তারা হল তালুলদার। তালুকদার উপাধিধারী বড়ুয়া দেখা যায় রাঙ্গুনীয়সহ অন্যান্য অঞ্চলে। যাদের তরফ ছিল, তারা হলেন তরফদার। তরফধারের উপাধি ছিল চৌধুরী। এখনো চৌধুরী উপাধিও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত আছে। এতে বোঝা যায়, বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল তবে তাদের উপাধি সব সময় বড়ুয়া ছিল না।

ত্রিপুরার মহারাজ ধনমানিক্য (১৪৯০-১৫২০) তাঁর রাজত্বকালে সেনাবাহিনীতে একটি সুসংহত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, সুচতুর সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন ; যার উপাধিও ছিল বড়ুয়া। এ সম্পর্কে শ্রী রাজমালায়[৬৮] উল্লেখ আছে ;

শ্রী ধনমানিক্য রাজা তদবধি সেনা
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা।

ধনমানিক্য বঙ্গজয়ের পূর্বে কিছু উপাধি প্রবর্তন করেছিলেন। তন্মধ্যে সরদার, হাজারী, নাজির, বড়ুয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে উল্লিখিত নামগুলো থেকে বড়ুয়াকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। বড়ুয়া শব্দটি সেনাপতি অর্থেই ব্যবহৃও হতো এবং অমরমানিক্য (১৫৯৭-১৬১১) প্রথমে এই বড়ুয়া পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে (১৬১১ খৃ.) তাঁর রাজত্ব লাভ হয়। এ বিষয়ে দেখা যায় ---

বিজয়মানিক্য রাজার জমিদার আমি
সে রাজার বড়ুয়া হৈয়া রাজা হৈলা তুমি।[৬৯]

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামে বুড়া বড়ুয়ার পুত্র সাত্তুয়া বড়ুয়া চাকমাদের রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাদের বংশধরেরাই পরবর্তীকালে চাকমা সমাজে বড়ুয়া গোজার সৃষ্টি করে।[৭০] অন্য একটি আখ্যায়িকায় দেখা যায়, বিংশ শতকের প্রথমে ত্রিপুরার বড়ুয়া পদবিধারী একবিচারক চট্টগ্রাম আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর বৌদ্ধদের মধ্যে বড়ুয়া উপাধি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।[৭১] উক্তিটি ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুকদের নিরুৎসাহিত্যকরণে উদ্বুদ্ধ করবে। কারণ ঊনবিংশ শতকেই প্রথমদিকে সারমেধ মহাস্থবির (১৮৬৪-১৮৭৯) বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে বুদ্ধের সদ্ধর্ম প্রচারে এগিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং বিচারকের বড়ুয়া পদবী দেখে এদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বড়ুয়া পদবী গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন কথাটি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় যা অবান্তর এবং অযৌক্তিকও বটে।

এখানে 'বড়ুয়া' শব্দটি জাতিবাচক নয়, উপাধিবাচক বলে অনুমিত। চণ্ডীদাস উঁচুবংশীয় বোঝাতে 'বড়ুয়া' শব্দের প্রায়োগিক ব্যবহার করেছেন। সেই সময়কালে এ বড়ুয়া শব্দের ব্যবহার সাহিত্যের আর তেমন দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

না। আবার ত্রিপুরার মহারাজা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মর্কতাদের পদবী দিতেন 'বড়ুয়া'। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন রাজা ও তাঁর পিতার পদবী ছিল বড়ুয়া। তারই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে চাকমা সমাজে বড়ুয়া গোজার সৃষ্টি হয়। 'বড়ুয়া' শব্দটি মহৎ বা উচবংশীয় অর্থে, সেনাপতি, রাজ পরিবারের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সর্বোপরি গোষ্ঠীর নামকরণেরও বড়ুয়া শব্দটি আক্ষরিক ব্যবহার দেখা যায়। মোটকথায় বলা যায়, বড়ুয়া শব্দটি উপাধি বিশেষ। শৌর্যে, বীর্যে, বীরত্বে ও কৃতিত্বে পরাক্রমশালী ব্যক্তির 'বড়ুয়া' উপাধি ছিল। পরবর্তী সময়ে কালের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এ বড়ুয়া পদবী বাংলাদেশের সমতলীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী[৭১] উপাধি হিসেবে ধারণ করে তারা তাদের বড়ুয়া হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৬. বড়ুয়া ও চাকমা জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ও চাকমা উভয়েই থেরবাদী বৌদ্ধ ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে এদেশে বসতি স্থাপন করে বসবাস করে। উভয় জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, চাল-চলন, চেহারা ও ভাবাগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আবহমান বাংলার আরাকানি, হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই উন্নত প্রতিভাধর বীর্যবানও তেজস্বী জনগোষ্ঠীর নৈকট্যতা ও সংস্পর্শের কারণে চাকমাদের (১৭১৫-১৮৩০) ধর্ম, আচার-আচরণে, নামকরণে বিবর্তন শুরু হয়। তাই তাদের নামকরণে স্মরণাতীতকাল থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নামের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

মাইশাং রাজা পরলোক গমন করলে তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র মানেকগিরি বা মারিক্যা বা মরেক্যাজ রাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজা মানেকগিরির অধিনায়কত্বে সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ এর অনুগ্রহে চাকমারা (১৪১৮-১৪১৯) খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। ইতিহাসবিদ মাহবুব-উল আলম এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ; তারা সুলতানের অনুমতি সাপেক্ষে মাতামুহূরী নদীকুলে ১২টি গ্রামে বসবাস শুরু করে এবং আলেকদ্যাং (আলীকদম) নামে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৩] এই আলেখদ্যাং (আলীকদম) বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান সার্কেলের অর্ন্তগত ছোট একটি গ্রাম। চাকমা রাজবংশের ইতিহাস সূত্রে জানা যায় আলেখদ্যাং এ বসতি স্থাপনের পূর্বে চাকমারা মানেকগিরি (১৪১৮/১৪১৯) সময়ে 'রোয়াঙ্যা' দেশ হতে পালিয়ে আসে এবং কদমতলীতে বসতি স্থাপন করে।[৭৪] চাকমা জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত 'শ্রী শ্রী রাজনামা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মৈশাং রাজার চতুর্থপুত্র রাজা তৈন সুরেশ্বরী বা থৈন সুরেশ্বরী (১৪১৯-১৪৭০) শাসনাকালে রণপাগলা নামে একজন অতি বিত্তশালী কৌশলী যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি ছিলেন। তখন রণপাগলা বংশধরেরা বড়ুয়া গোজার ছিলেন।[৭৫] এখানে 'গোজা' বলতে একটি গোষ্ঠীর নামকে বোঝায়। 'গোজা' শব্দটি সংস্কৃত গুচ্ছ শব্দের সমার্থক শব্দ। যা দ্বারা সমষ্টিবাচক শব্দের বহিঃপ্রকাশকে

Dhaka University Institutional Repository


বোঝায়। তখন রাজা কর্তৃক প্রদত্ত তালুকদার, কারবারী প্রভৃতি ছিল না। রাজা থৈনশ্বরীর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর একমাত্র পুত্র জনুকে (চনই) ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পালনের দায়িত্বভার তুলে নেন। এ জনু (চনই) রাজার দু'জন কন্যা ছিল। প্রথমা কন্যা রাজেশ্বীকে বিয়ে করে বুড়া বড়ুয়া আর দ্বিতীয় কন্যাকে বিয়ে করেন একজন মগরাজা। মগরাজার সখ্যতা এবং বুড়া বড়ুয়ার বীরত্বের চাকমারাজা জনু (চনই) অতিশয় প্রভাবশালী ও প্রতাপান্বিত হয়ে উঠে। জনু রাজার মৃত্যু হলে তার কোনো সন্তান না থাকায় বুড়া বড়ুয়া রাজ্যশাসনের দায়িত্ব বুঝে নেন। পরবর্তীকালে দৌহিত্র সূত্রে বুড়া বড়ুয়ার পুত্র সাত্তুয়া (চাথোয়াই) বড়ুয়া ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রজা হিতার্থে রাজ্যের শাসক হিসেবে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। এ সাত্তুয়া বড়ুয়া পরবর্তীকালে পাগলারাজা হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন।

'রাজনামা', 'চাকমা রাজবংশের ইতিহাস', 'চাকমা জাতির ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বড়ুয়া শব্দটি প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে 'বড়ুয়া' শব্দটি গোষ্ঠী বা জাতিবাচক হিসেবে ব্যবহৃত। অন্যদিকে 'History of Assam', 'Assam in the Ahoms age' ত্রিপুরার ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ 'রাজমালায়' বড়ুয়া শব্দটি পদবাচক হিসেবে দেখা যায়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী চাকমা জাতির মধ্যে ১৪১৮/১৪১৯-১৬০৮ পযর্ন্ত তাদের অবস্থানকে অত্যন্ত সুদৃঢ় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উভয়ের (বড়ুয়া ও চাকমা) রক্তের মধ্যে একটা সুনিবিড় সম্বন্ধ নিহিত রয়েছে। চাকমা রাজদরবারে অতি প্রাচীনকাল থেকে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। চাকমা ঐতিহ্যের স্মৃতিময় রাজধানী আলেখদ্যাং (আলীকদম) সুখবিলাস, রাজানগর প্রভৃতির পাশে এখনো অসংখ্য বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস সেই ঐতিহ্যের বন্ধনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৮৬০ সালের আগষ্ট (August) মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা জেলার মর্যাদা দেওয়া হলে সহজ জীবিকা অবলম্বন তথা নিরাপদে বসতি স্থাপন করে বসবাসের জন্য সিংহভাগ চাকমা পার্বত্যএলাকায় চলে যায়। আবার যারা বাস্তুভিটা, আত্মীয়-স্বজন, জমি-জমার মায়া অন্তর থেকে ত্যাগ করতে পারেনি তারা এতৎঅঞ্চলে থেকে বড়ুয়াদের সাথে বসবাস করতে লাগল। চাকমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'বড়ুয়াগোজা' এখনো বিদ্যমান। পূর্বে বড়ুয়া রাজালয়ে ভৃত্য'র কাজ করতো। পাগলারাজার সময়ে দেওয়ান তালুকদার পরামর্শ করত বিভিন্ন গোজা হতে প্রায় দেড়শত প্রজা নিয়ে এই গোজা সৃষ্টি করে। ক্রমে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়ে অধুনা সহস্র পরিবার হয়েছে। বড়ুয়াদের কার্যক্রম, আচার-আচরণ করতো বলে তাদের আখ্যা বড়ুয়া গোজা হয়েছে।[৭৬]

নাম হচ্ছে চিহ্ন বা প্রতীক। যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি বা বস্তু এবং গোষ্ঠীকে সহজে চেনা যায়। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের নামের ব্যাপারে স্বকীয়তা থাকলেও বড়ুয়া ও চাকমা জনগোষ্ঠীর নামের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারোদঘাটিত হয়। তাদের উভয়ের নাম একটা সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। চাকমাদের ব্যবহৃত কতকগুলো নাম যেমন --- রিপন চাকমা, শক্তিমান চাকমা, সঞ্জয় চাকমা, নিখিলমিত্র চাকমা, রোহিনী চন্দ্র কারবারী, পরীক্ষিত তালুকদার ইত্যাদি। এখানে উভয় জনগোষ্ঠীর আদ্যাংশের মিল অত্যন্ত সুগভীর। আবার চাকমারদের

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তালুকদার রয়েছে। চাকমাদের অন্যান্য পদবীগুলো বাদ দিলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নাম হয়ে যায়। সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানবসম্প্রদায়ে নাম মাত্রই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। চাকমারা রাজানগর ছেড়ে নতুন রাজধানী রাঙামাটিতে চলে গেলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে এবং একসময়ে সকল সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হয়। যা পরবর্তীকালে কোনোক্রমেই আর বৃদ্ধি পায়নি বরং দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে বারবার। বড়ুয়া ও চাকমা উভয়ই জনগোষ্ঠী স্মরণাতীতকাল থেকে একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলেও সময়ের পরিবর্তনে সেই সংস্কৃতি ক্রমশ আলাদা হয়ে যায়।

৭.

বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে এদেশের সিংহভাগ জনগণই কখনো কখনো 'মগ' নামে অভিহিত করে। বস্তুতপক্ষে তা উচিত নয়। কেননা 'মগ' এবং 'বড়ুয়া' জনগোষ্ঠী উভয়েই অতীতকাল থেকে থেরবাদী বৌদ্ধভাবধারায় বিশ্বাসী হলেও তাদের উভয়ের নৃতাত্ত্বিক ভাবে শারীরীক গঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে আলাদা। এদেশে বসবাসরত সকল মুসলিম জনগোষ্ঠী যেমন নিজেদেরকে আরব থেকে আগত, হিন্দুরা নিজেদের আর্য বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, তেমনি এদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে মগধাগত বলে অভিহিত করে। বাস্তবিক পক্ষে এ যুক্তিটা কতোটুক যৌক্তিক তা বিবেচনার বিষয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। বহুবিধ কল্পনা মিশ্রিত আলোচনা বা পরিকল্পনা আস্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস। বলতে দ্বিধা নেই মগধাগত হলেও পরবর্তীকালে রক্তসাঙ্কর্য্যের প্রভাব এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে এ জনগোষ্ঠী একেবারে এক হয়ে যায়নি। তাই অনেকে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে তাই বর্ণসংকর জাতি বলতেও কার্পণ্যবোধ করে না। নিম্নলিখিত উক্তিটিই তারই সত্যতা প্রতিপাদন করে। যেমন ----

ঐতিহাসিক কারণে বড়ুয়া ও সমপর্যায়ের সমতলে বসবাসকারী বৌদ্ধজনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বৃহত্তর জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার বছর ব্যাপী বিবর্তনে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটেছে, বাঙালি বৌদ্ধরা সে জনগোষ্ঠীর একটি অংশ। ধর্মগত ভিন্নতা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বাদ দিলে জীবনাচরণে ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে তারা বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর সঙ্গে একই বাঙালি জাতীয়তাসূত্রে গ্রথিত।[৭৭] মানুষ যখন ধর্মান্তরিত হয় তখন সহজাতকারণে আদি পুরুষের ধর্ম ; আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি তার মজ্জাগত হয়। ইতিহাস অন্বেষক, অনুসন্ধানীজন মাত্রই তা অস্বীকার করে না। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেই সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। তারা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে ক্রমে আরাকানী সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি এবং এদেশে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এ সময় তারা বংশ পরম্পরায় মিশ্রসংস্কৃতির

Dhaka University Institutional Repository

পরিপালন করে আসছে। তাই এখনো বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতিতে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভিককাল থেকে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কুমিল্লা আরাকান রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। সুতরাং সঙ্গতকারণেই মগধের বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন অত্যাচার শুরু হলে এতৎঅঞ্চলের বিশেষ করে কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় শুধু নয়, এ সময় অনেকে যদি আরাকানেই পাড়ি জমায় তবে অবাক হবার কিছু নেই। তাছাড়া অনেকেই সেই সময়ে প্রাণ রক্ষার্থে পাশ্ববর্তী দেশ নেপাল, ভূটান ও তিব্বতেও আশ্রয় নিয়ে থাকে। অনেকেই বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে 'বরউগা' (বড়টি) বলে সম্বোধন করে। আসলে এটা নিতান্তই অযৌক্তিক। একটি জাতির ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম এধরণের অপ্রভ্রংশের শব্দের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এটার মাধ্যমে ঐ জাতির বা সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা হয়।

## প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তথ্যনির্দেশ

১. মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস, পুরাণা আমল* (চট্টগ্রাম : নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ৩৯। উমেশ মুৎছুদ্দী, বড়ুয়া জাতি (চট্টগ্রাম : ১৯৫৯), পৃ. ৭।

২. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকার* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ৪৩৭-৪৩৮

৩. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৭ ; মুসলমান আক্রমনের ফলে বিহার ও বাংলায় বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান যখন বিধ্বস্ত হয় এবং এমন কি বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তখন অনেক বৌদ্ধ নেপাল, তিব্বত, ভূটান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী দেশে যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি অনেক আবার সোজা চট্টগ্রামে অথবা আসামে এবং আসাম থেকে পরে কুমিল্লা বা চট্টগ্রামে চলে আসেন। নীরু কুমার বড়ুয়া, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা : অবসর, ২০০৭), পৃ. ৯৭

৪. ধর্মাধার মহাস্থবির, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ০৯
বিপ্রদাশ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বৃজি জাতি বা বজ্জি জাতির রূপান্তর বলে অভিমত প্রকাশ করেন : বিপ্রদাশ বড়ুয়া সম্পাদিত, *শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস এবং চাকমা রাজবংশের ইতিহাস* (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১০

৫. *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৪ ও ১৪

৬. নুরুল হক, *বৃহত্তর চট্টল* (চট্টগ্রাম : সন ও তারিখ অনুল্লেখিত), পৃ. ১১৩

৭. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষর্দ, ১৯৮৪), পৃ. ৩৯৬

৮. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৬), পৃ. ৩৫
*বাংলা পিডিয়া* সপ্তম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১২০৩), পৃ. ২৫০

৯. Sukomal Chaudhuri, *Contemporary Buddhism in Bangladesh* (Calcutta : Atish Memoral Publishing Society, 1982), p. 46

Dhaka University Institutional Repository

১০. দেবাশীষ বড়ুয়া দেবু সম্পাদিত, সর্বজনীন, প্রবন্ধ : *বৌদ্ধধর্মের পূণজাগরণ ও বৌদ্ধসমাজ*, কঠিনচীবর দান সংখ্যা (চট্টগ্রাম : ২০০৫), পৃ. ২১

১১. এক সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক, সংগঠক ও অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া এ তথ্য জানান, ০২-০১-০৬।

১২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ১৪০২), পৃ. ১৭

১৩. উমেশ মুৎছুদ্দী, *বড়ুয়া জাতি* (চট্টগ্রাম : ১৯৫৯), পৃ. ৬

১৪. ডা. সিতাংশ বিকাশ বড়ুয়া, *চট্টগ্রাম বৌদ্ধদের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম : ১৯৮১), পৃ. ৪১

১৫. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম : ১৯৮০), পৃ. ০৮

আহম্মদ শরীফ, *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (ঢাকা : অক্ষর, ১৯৮৭), পৃ. ০৯-১৮

১৬. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯), পৃ. ০৪

১৭. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯

১৮. আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৬৪

১৯. অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়* (চট্টগ্রাম : অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ১৯৮৯), পৃ. জ

২০. উদ্ধৃত, আবদুল হক চৌধুরী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ২০০

২১. আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর নাম প্রথমে দিন্নাওয়াতী বা ধান্যবতী (তৃণবতী) এবং পরে বেসালি বা বৈশালী নামকরণ করা হয়। এটি ভারতের বৌদ্ধজনপদ বৈশালীর স্মৃতিবাহী।

২২. আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : আগামী প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ১৩

২৩. হাজার বছরের চট্টগ্রাম, *দৈনিক আজাদী ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৫), পৃ. ৫৯

২৪. G.E. Hervey, *History of Burma* (London : Frank Cass & Co. Ltd, 1967), p. 149-264 ; D.G.E. Hall, *Burma* (London : Hutchinsous University Library, 1950), p. 92-95 ; W.S. Desai, A Pageant of Burmese History (Calcutta : Orient Longmans, 1961), p. 98-103

২৫. W.W. Hunter, *Statistical Accouit of Bengal*, vol-VI (London : 1876), p. 143

২৬. B.C. Allen, *Assam District Gazetteer*, vol-III (Calcutta : 1903), p. 51

২৭. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৪), পৃ. ১৬৯

২৮. Arthur P. Phayre, *History of Burma* (London : Trubner & Ludgate Hill, 1883), p. 47

২৯. সাক্ষাৎকার : ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০.০১.২০০৬

৩০. উমেশ মৎছুদ্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৩১. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকার* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ৪৪১

৩২. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি*, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

৩৩. দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম, প্রবন্ধ : *বড়ুয়া জনগোষ্ঠী উৎপত্তি ও ঐতিহ্য*, ২৭/১২/১৯৮৭

৩৪. দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম, প্রবন্ধ : *বড়ুয়া জনগোষ্ঠী উৎপত্তি ও ঐতিহ্য*, ২৬/১২/১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. L.S.S. Omaly, Eastern Bengal District Gazetteer, Chittagong, Calcutta, 1908

Risely H.R. বলেন ; The Barua Maghs are uswally belived to be of a mixed origin with bloods of different groups and religions such as Hindu, Muslim, Arakanese, Burmese and Partuguse. Risely, H.R. Tribes and Castes of Bengal, vol-II (Calcutta : 1981), p. 29 ; O'Malley'র প্রজ্ঞা ও সারগর্ভ বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে S.N.H. বলেন ;

The Rajbansi or Barua Maghs are the offspring of Bengali Women by Burmene men or more generally of Arakanese mothers by Bengali fathers. .... .... . The external indication of their Mangolian descent has been obliterated by inter-marriage with non Aryan Bengalees of Chittagong and Noakhali for generation and have the flossy black complexion, wavy and aboundant beard and mustache.

৩৬. The People were mixed race the descendants of Arakanese, who whom their Kings held Chittagong during the seventh century, had married Bengali wives. Arthur P. Phayre, History of Burma, op.cit.,

৩৭. D.G.E. Hall, *Burma* op.cit., p. 47

৩৮. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান ও বার্মা (মায়ানমার) বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। আরাকান বর্তমানে মায়ানমার অন্তর্গত একটি প্রদেশ।

৩৯. বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে আরাকানীর এসে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।

৪০. এদেশের বৌদ্ধরা আরাকানী। তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বাংলাভাষা গ্রহণ করেছে। কারণ কিছুকাল পূর্বেই তাদের মধ্যে আরাকানী নাম পোষাক, খাদ্য ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কংগ্রেসী জাতীয়তার প্রভাবে এরা হিন্দু আচারাদি গ্রহণ করেছে। আহমদ শরীফ, *কালের দর্পণ স্বদেশ* (ঢাকা : ১৯৮৫), পৃ. ১১ ; খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই পারিপার্শ্বিক হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের কৌশলী ধর্মযাজকরা বড়ুয়া পাড়ায় দুর্গাপূজা, মনসা পূজা, শীতলা পূজা এরকম কিছু কিছু পূজা শুরু করল। যার ফলে কয়েক বৎসর বড়ুয়া বৌদ্ধরা না হিন্দু না বৌদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে শুভক্ষণে আরাকানের সংঘরাজ বিহার হতে আরাকানী জ্ঞানী বৌদ্ধভিক্ষু সংঘরাজ সারমিত্র (সারমেধ) মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮১), কার্তিক পূর্ণিমায়, চট্টগ্রাম এসেছিলেন। এ সময় তিনি বড়ুয়াসমাজে পুনঃবিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের আলো বিতরণ করে। সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক স্থবির (রেঙ্গুন : ১৬৩৬), পৃ. ৪৪৩ ; আবদুল মাবুদ খান, *সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম* (ঢাকা : সৌগত প্রকাশনা, ১৯৯১), পৃ. ৫-১৪

৪১. শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ, *রাজমালা* (আগরতলা : অক্ষর, ১৪০৫ দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ), পৃ. ১৬৭

৪২. আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭), পৃ. ৪

*Dhaka University Institutional Repository*

৪৩. মগদস্যুদের প্রবল উৎপাতের কথা ফরাসী ঐতিহাসিক পর্যটক, ফ্রাঁসোয়া বার্ণিরের স্বীকার করেছেন। ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের ১৬৫৮ কিংবা ১৬৫৯ সালের গোড়ার ভারতবর্ষে আসেন। মোগলামলে যে সব পর্যটক তাদের ভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার মধ্যে ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের ভ্রমণকাহিণী ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। তিনি ১৯৬৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন। প্রদ্যোত গুহ, বাদশাহী আমলে বিদেশী পর্যটক (কলকাতা : ১৯৭৩ চলতি দুনিয়া প্রকাশনী) পৃ. ১০৫

৪৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২), পৃ. ৪১
ভাস্কর চট্টোপধ্যায়, *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, প্রথম ভাগ (কলকাতা : প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩), পৃ. ৩৫

৪৫. আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮

৪৬. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৪), পৃ. ১৬৯

৪৭. উদ্ধৃত, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৪৮. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১ ; সাক্ষাৎকার : অনজয় ক্রু বড়ুয়া, রয়স : ৮৫, উত্তর নলাবিল, মহেশখালী, কক্সবাজার।

৪৯. আবদুল হক চৌধুরী, , পূর্বো চট্টগ্রামের সমাজ ও সং ক্ত, পৃ. ১৯-১৭

৫০. হাজার বছরের চট্টগ্রাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০ ; *আহমদ শরীফ, চট্টগ্রামের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৫১. আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৫২. হাজার বছরের চট্টগ্রাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৫৩. পূণচন্দ্র চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৫৪. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

৫৫. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৫৬. আধার মানিক মৌজা কদমরসুল
ফাজিল সে অধিকারী মগধবহুল, *এতেম কাসেম রচিত, আওরা দ্যা বারোজ প্রশস্তি* । বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা : ১৩৬৪ বাংলা), পৃ. ৩৯-৪০

৫৭. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৫৮. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা : সাহিত্যসংসদ, ১৯৭৯), পৃ. ১৪৭৯

৫৯. *দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম*, ২৫/১২/১৯৯৭ (চট্টগ্রাম : ১৯৯৭)

৬০. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

৬১. অতুল সুর, *বাঙালি জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ*, (কলিকাতা : বেস্ট বুক্স, ১৯৯২), পৃ. ৬৩-৬৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. Dr. S.L. Baruah, *A Comprehensive History of Assam* (New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1985), p. 671

৬৪. The Baruas used to be appointed in consideration of merit. The majority of the Baruas were connected with the department of Supply. A few however had local administrative duties. The barua had Control over the paiks ; উদ্ধৃত, আবদুল হক চৌধুরী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, পৃ. ২০৭

৬৫. Sir Edward Gait ; *History of Assam* (Calcutta : Thacker, spink & co.), p. 195

৬৬. Sir Edward Gait, Ibid, p. 110, 195

৬৭. উদ্ধৃত, *বাংলাদেশে বড়ুয়া জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া (চট্টগ্রাম : ১৯৯৬), পৃ. ০৮

৬৮. কালী প্রসন্ন সেন, *শ্রীরাজমালা*, ২য় লহর (ত্রিপুরা : ১৯২৭), পৃ. ১২

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৭০. বিরাজমোহন দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ. ১০০

৭১. বুদ্ধ জয়ন্তী স্মরণিকা প্রবন্ধ : *চট্টলে মগধ স্মৃতি* (পশ্চিম বঙ্গ : ১৯৭৯), পৃ. ২৫

৭২. বাংলাদেশের বসবাসরত বৌদ্ধরা থেরাবাদী বৌদ্ধভাবধারায় বিশ্বাসী, আদিবাসী বৌদ্ধ এবং সমতলীয় বৌদ্ধরা বসবাস করে। সমতলীয় বৌদ্ধরা বেশীরভাগই বড়ুয়া পদবী উপাধিধারী। কুমিল্লা অঞ্চলে বৌদ্ধদের পদবী আগে সিন্‌হা, সিংহ এবং হাজারী পদবীগ্রহণ করে থাকলেও এখন তারা বেশীরভাগই বড়ুয়া পদবী লিখতে অভ্যস্থ।

৭৩. মাহবুব-উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* [পুরাণা আমল] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১ ; বিরাজমোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪ ; বিপ্রদাস বড়ুয়া সম্পাদিত, *চাকমা রাজবংশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৭৪. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

৭৫. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৭৬. সতীশ চন্দ্র ঘোষ, *চাকমা জাতি* (কলিকাতা : ১৩১৬), পৃ. ৬১

৭৭. মানবাধিকার ; *বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী* (প্রবন্ধ)। এটি ১৯৯৯ সালের ১২ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনাতনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমী ও অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি : ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান

পৃথিবীর সকল জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে হলে আগে জানা দরকার তার লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতিতে ঐ জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, লৌকিকবিশ্বাস ছাড়াও চলমান জীবনের বিভিন্ন বিষয়, আচার-আচরণ, সাহিত্যিক নির্দশন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। লোকসংস্কৃতি জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের বিভাবন বিশেষ। যা বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম-এর লোকসংস্কৃতির সাথে এ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির তেমন কোনো বিপ্রকর্ষ নেই। আবার অনেকাংশে বিবর্তিত রূপ সাদৃশ্যমান। লোকসংস্কৃতি স্থূল,সরল, অমার্জিত, গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন, লোকমুখে তা প্রচারিত হয়, লোকশ্রুতিতে গৃহীত এবং লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয়। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, তথা জাতিতত্ত্বের প্রকৃত উপাখ্যান লোকসংস্কৃতিতে প্রবাহমান। একটি দেশ ও জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় তার লোকসংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব[১]।

এ লোকসংস্কৃতি কথাটির অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য বর্ণনাতীত ও সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় গভীর। লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন এবং গবেষণা শুরুর কাল নিরূপণ করা দূরূহ ব্যাপার। তবে ধারণা করা হয়, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে আদিমকাল থেকে এ লোকসংস্কৃতির প্রচলন ছিল। লোকসংস্কৃতিকে ইংরেজীতে 'Folklore' বলে। সুতরাং এ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার পূর্বে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

'Folk' এবং 'Lore' এ দু'শব্দ এর সমন্বয়ে 'Folklore' গঠিত হয়। `The Oxford Illustrated Dictionary' নামক গ্রন্থে 'Folk'-এর আভিধানিক অর্থ People in general, People of specified class এবং 'Lore' শব্দের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে Body of traditions ; Knowledge relating to some subject. এখানে 'Folk' শব্দ দিয়ে সাধারণভাবে মানুষ, লোক, জনগণ ইত্যাদি বোঝায়, 'Lore' অর্থ শিক্ষা ও জ্ঞান। সুতরাং জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকশিক্ষা বা লোকসংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞানই হলো 'Folklore'। যার প্রভাব মানুষের সচরাচর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে সর্বোপরি সংস্কৃতিতে পরিলক্ষিত হয়।

লোকসংস্কৃতির মূল পরিচয় মূলত 'লোক' শব্দটির মধ্যে নিহিত। 'লোক' শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ, যার প্রকৃত অর্থ গ্রামীণসমাজ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কমবিদ্যা সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং গ্রামীণ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। দিন দিন লোকসংস্কৃতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, পঠন-পাঠন সমৃদ্ধ হচ্ছে। এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে একটি তুলনামূলক চিত্র সকল প্রকার বিচিকিৎসা দূরীকরণ করতে পারে এমনটি আশা করা যায়। চিত্রটি নিম্নরূপ :----

| অতীত | বর্তমান |
|---|---|
| ১। লোকসংস্কৃতি গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি। | ১। ধনী-দরিদ্র সকলের সংস্কৃতি। |
| ২। লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি, স্বভাব, রীতি-নীতি, ব্যবহার বিধি পরিবর্তন হতো না। | ২। দ্রুত পরিবর্তনশীল। |
| ৩। নিদির্ষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। | ৩। কোনোরূপ সীমাবদ্ধতা নেই। |
| ৪। গ্রামের সদা হাস্য, সহজ-সরল সাধারণ লোকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। | ৪। শিক্ষিত শ্রেণীরাও পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে। |
| ৫। কালের স্রোতধারায় প্রবাহিত নয়। | ৫। নিত্য প্রবাহমান। |
| ৬। নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। | ৬। প্রায় সকলবিষয়ে লোকসংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। |

লোকসংস্কৃতির প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে লোকসংস্কৃতির উত্তরোত্তর অগ্রগতির অন্যতম সফলগাঁথা বলে অভিহিত করা যায়। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের অভিমত জানা অত্যাবশক। যা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক হবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। Alexander Haggerty Krappe-এর মতে, Folklore হচ্ছে ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞান।[৩] Francies Lee Utley মৌলিকসাহিত্য[৪] হিসেবে অভিহিত করেছেন। Hennig Cohen তাকে নিরক্ষতার সাহিত্য[৫] বলে উল্লেখ করেছেন । George G. Carey লোকসাহিত্যকে এক ধরনের মৌলিকসাহিত্য বা লোকঐতিহ্যের সাহিত্য[৬] বলে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । আশরাফ সিদ্দিকী লোকসাহিত্য বা লোকঐতিহ্য গ্রহণে[৭] এবং মোঃ হানীফ পাঠান লোকবিজ্ঞান[৮], আবদুল হাফিজ লোকঐতিহ্য এবং লোকতত্ত্বীয় জ্ঞান[৯], আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকশ্রুতি[১০], আতোয়ার রহমান লোককৃতি[১১] বলে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া এ বিষয়ে আরো প্রতিশব্দ ও অন্যান্য প্রবক্তাদের নামোল্লেখ করা হলো। যেমন-- রামরমেশ ত্রিপাটী- গ্রাম্য সাহিত্য, আর পি চন্দা- লোকসাহিত্য, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ- লোকবিজ্ঞান, সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায়- লোকযান, বাসুদেব

Dhaka University Institutional Repository

আগারওয়ালা- লোকবার্তা, ড. শংকর সেন গুপ্ত লোকবৃত্ত, গোরাচাঁদ কুণ্ডু- লোকাচার, মযহারুল ইসলাম- লোকলোর[১২]। এ বিষয়ে আরো অসংখ্য শব্দের ব্যবহার হয়। লোকসংস্কৃতির পরিধি অতি ব্যাপক বলেই এ সব প্রতিশব্দ ব্যবহারে তার ব্যাপকতা সুপ্রকাশনের চেষ্টা করা হয়।

লোকসংস্কৃতির কালিক রূপ রূপান্তর সহজাত। কালে কালে যুগে যুগে এগুলো পরিবর্তনশীল, কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকে না বলেই বিভিন্ন বিদগ্ধজন বিভিন্নভাবে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ প্রদান করেন। আয়নায় জীবনের প্রতিবিম্বের স্বরূপ লোকসংস্কৃতি। যেখানে প্রতিফলিত হবে সাধারণ লোকজীবনে লোকমনের প্রতিচ্ছবি। তবে এ বিষয়ে উক্ত আছে ; Folklore is very much an Organic phenomens in the sense that is an internal part of culture[১৩]. আরো দেখা যায়, Folklore is a oral tradition whenever and wherever you find it ; it greatness is that it is help to make the whole man and the whole Society, both in American and through out in the world[১৪] . আবার Jan Harold Brunvand এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে ; Artistic Communication in small group[১৫]. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায়, লোকসংস্কৃতি হচ্ছে একধরনের প্রবাহমান ধারা, যার কণা তরঙ্গে অবস্থান করে চারটি মৌলসত্ত্ব[১৬] ; যেখানে লোকসংস্কৃতির উপাদান এবং অর্ন্তনিহিত বিষয়গুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। চারটি মৌলসত্ত্ব নিম্নরূপ ; ১। সৃষ্টি , ২। ক্রিয়া, ৩। বিশ্বাস এবং ৪। গ্রহণ। লোকসংস্কৃতিতে উল্লেখিত মৌলসত্ত্বার নিত্যতা এবং অস্তিত্বতার বিদ্যমানতা সম্পর্কে বিষয়গুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ক. এ লোকসংস্কৃতি সমাজে বংশ পরম্পরায় সৃষ্টি হয় ;

খ. লোকাচারিক ক্রিয়া দ্বারা তার প্রচার-প্রসার হয় ;

গ. ধর্মীয়বিশ্বাস এবং লোকাচার সম্পর্কিত বিশ্বাসই এ লোকসংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ ;

ঘ. শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবাই এ সংস্কৃতি ধারণ ও গ্রহণ করে এবং তার লোকাচারিকতা সমাজ বাস্তবতায় প্রয়োগ করে।

লোকসংস্কৃতি সর্বমহলের কাছে অতি আদরণীয়-গ্রহণীয় একটি জনপ্রিয় বিষয়। সবাই এ সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা ও পঠন-পাঠন করে। এতে জীবনের লালিত, স্বপ্ন, হাসি, খুশী, মায়া এবং মমতার ধ্বনি যেমন পাওয়া যায় ; তেমনি পাওয়া যায় বেদনাত্মক সুরব্যঞ্জন। এটা মানুষের এক জীবনপ্রক্রিয়া। যেখানে জীবনের লোকজ ক্রিয়াকর্ম, ধর্মবিশ্বাস এবং সাহিত্যের আনুপূর্ব কালিকধারা বিদ্যমান। এটা সর্বকালের সর্বস্তরের জনগণের প্রোৎকর্ষ সৃষ্টি। লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে নিম্নলিখিত শর্তাবলী বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন[১৭] :

Dhaka University Institutional Repository

a. Its Content is oral (Usually verval) custom related or material
b. It is traditional information and transmission
c. It is existed in different versions
d. It is usually anonymous
e. It tend to become formularized

উপরিউক্ত বিষয়গুলোই সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণস্পন্দন। পৃথিবীর সকল লোকসংস্কৃতির মধ্যে এ গুলোর স্থিতি বিরাজমান। এটাও উল্লেখ থাকে যে, লোকসংস্কৃতির গতি নদীর বাঁকের ন্যায় যে কোনো সময় পরিবর্তনশীল। যতই এবং যেখানে যেকোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন হোক না উল্লিখিত পাঁচটি ক্রমধারা লোকসংস্কৃতির বৃত্তে আবৃত্ত থাকবে নিঃসন্দেহে। প্রকৃত অর্থে লোকসংস্কৃতি হলো কতকগুলো বিষয়ের সমষ্টি, যা বংশ পরম্পরায় ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলসমাজে সুদীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। যার মাধ্যমে সমাজের আপামর জনসাধারণের লোকসংস্কৃতি চিত্রায়িত হয়। এ বিষয়ে আশা দাস যথার্থই বলেছিলেন ; লোকসংস্কৃতির মধ্যে জাতির সংস্কৃতির পরিচয় থাকে[১৮]। এ অর্থে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। লোকসংস্কৃতিতে স্ব স্ব গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত থাকে। যাকে আমরা সেই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দর্পন বলে অভিহিত করে থাকি[১৯]। মানব জীবনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণকে ভিত্তি করেই লোকসংস্কৃতির ব্যাপকতা এবং শ্রীবৃদ্ধি। জন্ম থেকে মৃত্যু পযর্ন্ত পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়জীবনের মঙ্গলামঙ্গলকে কেন্দ্র করে ধর্মশাস্ত্রের মৌলবিধানের সঙ্গে আরো কিছু লৌকিক আচার-আচরণ সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে লোকসমাজের মধ্যে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি মূলত বংশানুক্রমে অথবা শ্রুতিপরম্পরায় সৃষ্টি হয়, যা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সত্য । জ্ঞানলাভের পর থেকে এক বিশেষ মানব গোষ্ঠীভুক্ত শিশু সেই গোষ্ঠীর যে সব রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে বর্ধিত হয়। তার চেতনা সেই সেই বাতাবরণে গড়ে উঠে ; পরিণামে সে-ই সংস্কৃতি তার মজ্জাগত বা স্বভাবজ হয়ে থাকে। এ ভাবেই লোকসংস্কৃতির ধারা যুগ যুগান্ত রের সীমানা পেরিয়ে ভাবীকালের পথে নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকারকে সঙ্গী করে নিরত বহমান। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি এ দেশের লোকসংস্কৃতির এক অফুরন্ত অনুপম সম্পদ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধকরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## ধর্ম-বিশ্বাস

### ১. পূজা

'পূজা' বহুল পরিচিত একটি অর্থবোধক শব্দের নাম, যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। এটি মূলত অর্চনা, আরাধনা, ভক্তিপ্রদর্শন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়। সকল দেব এর মধ্যে দেবেন্দ্র, অসুরেন্দ্র, নাগেন্দ্র এবং মানবের মধ্যে মহারাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, শাক্যরাজ, মল্লরাজ, লিচ্ছবীরাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যথাশক্তি পূজা করেছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২১৮ বৎসর পরে রাজচক্রবর্তী ধর্মাশোক ৯৬ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪,০০০ (চুরাশি হাজার) বিহারও স্তূপ নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন[২১]। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হতে অপসৃত করেছিলেন। মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করেছিলেন[২২]। বুদ্ধ নিজেকে কখনো দেবতার আসনে বসিয়ে পূজিত হতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মহামানবে পর্যবসিত হলেন। মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ এবং তাঁর মতবাদ ব্যক্তি জীবনে অনুরণন করার জন্য ভক্তের মন স্বত অবণত হয়ে পড়ে তার অবয়ব এবং অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্তির সামনে। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবি ঠাকুরের নিম্নোক্ত কবিতাটি স্মরণযোগ্য ;

সে অচর্না সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল রস বক্ষে তব
আজি আসি তারে দেখি লব[২৩]।

পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ-ই-এ পূজার সাথে সম্পৃক্ত। বুদ্ধ নিজেও এ পূজার বিরোধী ছিলেন[২৪]। আবার তিনি মঙ্গল সূত্র-এ নিম্নলিখিত[২৫] আচরিত কর্মের উল্লেখ করেছেন। যেমন : মূর্খদের সেবা না করা ; পণ্ডিত ব্যক্তিদের সেবা করা ; পূজণীয় ব্যক্তিদের পূজা করা। এগুলোকে তিনি উত্তম মাঙ্গলিক কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া একসময় বুদ্ধ সারিপুত্রের ভাগিনাকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন ; যদি কেউ শতবর্ষ অরণ্যবাসী হয়ে অগ্নির পূজা করেন অথবা কোনো শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষকে মুহূর্তকালমাত্র পূজা করে তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ[২৬]। মূলত এখানে পরোক্ষভাবে তাঁকেই পূজা করার ইঙ্গিত দেয়। পূজনীয়, স্মরণীয়, বরণীয় এবং অনুস্মরণীয় মানবদের মধ্যে বুদ্ধ মহাজ্ঞানী ও মহাগুণসম্পন্ন। তাই শান্তিপ্রিয় ও কল্যাণকামী মানুষ তাঁকে স্মরণ

Dhaka University Institutional Repository

করে, তাঁর যশোগান করে ; তাঁর উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য-পেয়্য ও অন্যান উত্তম সামগ্রীদ্বারা তাঁর প্রতি অঢেল শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করত পুজা করে। এতে পূজকের হৃদয়াসন এ সময় মহানুভবতার বিকাশ লাভ হয়। চিত্তের একাগ্রতা বশত পুজা না করলে সম্যকদৃষ্টির অধিকারী হওয়া হয় না বরং অকুশলই সঞ্চিত হয়ে থাকে বলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস[২৭]।

বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী তাদের প্রাত্যহিক পূজা-অর্চনায়, ধর্মবিশ্বাসে যে সমস্ত ধর্মীয় স্তবক বা গাথা পঠিত হয় তা ত্রিপিটকে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্নভিন্ন অংশে আছে। জনগোষ্ঠীকে ধর্মের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করানোর জন্য পরবর্তীতে যা সংকলনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়[২৮]। বিবিধ রকম পূজোকরণের মাধ্যমে এ পূজা গৃহে অথবা বৌদ্ধ বিহারে সম্পন্ন হয়। পূজায় ব্যবহৃত প্রায়োগিক বুদ্ধবচন ও লোকবিশ্বাস-এর একটি বদ্ধমূললব্ধিত ধারণা নীচে প্রদত্ত হলো ;

১.১. বুদ্ধ পূজা[২৯]

ইতিপি নিরোধা সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্ন চ, বিয ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ইমং, উদকং আহারং পূজোমি। বুদ্ধো, পচ্চেক, বুদ্ধো, অগ্গসাবক মহাসাবক, অরহন্তানং, সভাব সীলং অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি। ইমং দীপং দানেন বন্নেনাপি সবন্নং, গন্ধেন পি সুগন্ধং, ঠানেন পি সুসন্ঠান খিপ্পমেব দুব্বন্নং দুগন্ধংপি, দুস্সন্ঠানং ভবিস্সতি। এবমেব সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা, সব্বে সঙ্খারা দুক্খা, সব্বে সঙ্খারা অনত্তা। ইমেন বন্ধনেন মানেন পূজানুভাবেন আসবক্খবহং হোতু, সব্ব দুক্খা পমচ্চতু।

অনুবাদ : নিরোধ সমাপত্তি হতে উত্থিত হয়ে উপবিষ্ঠ ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে ফুল, ফল, আহার, দ্বারা পূজা করছি। এ পূজার পুণ্যপ্রভাবে আমি বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক অর্হৎ শীলবানদের অনুগামী হবো। এ সুবর্ণ, সুগন্ধ ও সুস্থান শীঘ্রই দুবর্ণ দুর্গন্ধ ও কদর্যস্থানে পরিণত হবে। এরূপে জগতের সকল সংস্কার অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মা। সুতরাং এ পূজা ও বন্দনার প্রভাবে সকল আসক্তি ক্ষয় ও সর্বদুঃখ ধ্বংস প্রাপ্ত হোক।

১.১.১. বুদ্ধ পূজায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুবিধ লোকবিশ্বাস বিরাজমান। বিশ্বাসগুলো নিম্নরূপ :

ক. আয়ু-বর্ণ, সুখ-ধন, যশ-খ্যাতি বৃদ্ধি পায় ;

খ. আত্মমুক্তির পথ অন্বেষণ করা যায় ;

গ. জগতের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে ;

ঘ. কামাসক্ত থেকে দূরে অবস্থানে সাহায্য করে ;

*Dhaka University Institutional Repository*

ঙ. অজ্ঞানতা বিদূরীকরণে সহায়তা করে।

১.২. আহার পূজা[৩০]

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং

অনুকম্পং উপাদায় পতিগণহাতু উত্তমং

অর্থাৎ প্রভু, আপনার জন্য সুসজ্জিত উত্তমভোজ্য প্রস্তুত করা হয়েছে ; অনুগ্রহ পূর্বক এ আহার গ্রহণ করুন।

১.২.১. লোকবিশ্বাস [৩১]

ক. নিবার্ণগত বুদ্ধকে আহার দিয়ে পূজা করলে নিবার্ণ লাভ হয় ;

খ. এটা একধরনের দান, যার মাধ্যমে দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত হয় ;

গ. ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ লাভ করা যায় ;

ঘ. পরলোকের পাথেয়(পুণ্য) সংগ্রহ করা যায় ;

ঙ. ত্যাগবিষয়ক শিক্ষা লাভ করা যায়।

১.৩. পুষ্প পূজা[৩২]

বন্নগন্ধ গুণোপেতং এতং কুসুম সন্ততিং

পূজযামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ সরোরুহে।

অর্থাৎ সুন্দর বর্ণগন্ধ ও গুণযুক্ত এ পুষ্পগুলো দ্বারা মুনিন্দ্র বুদ্ধের পাদপদে পূজা করছি। অথবা ;

পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন

পঞ্ঞেন মে তেন চ হোতু মোক্খং

পুপ্ফং মিলাযতি যথা ইদং মে

কাযো তথা যাতি বিনাস ভাবং।

অর্থাৎ এ পুষ্পদ্বারা বুদ্ধকে পূজা করছি, এ পুণ্য প্রভাবে আমার নির্বাণ লাভ হোক। এ পুষ্প যেমন ম্লান হয়ে যাচ্ছে তদ্রুপ আমার দেহও বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

১.৩.১. পুষ্প পূজায়ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস দেখা যায়। যেমন [৩৩]:

ক. জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মে ;

খ. পূষ্প পূজার মাধ্যমে জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় ;

গ. জীবনের ভয়ানক শেষ পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি হয় ;

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ফুলের ন্যায় নিজের জীবনকে বিকশিত করা যায় ;

ঙ. সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর সুভাষিত ফুলের ন্যায় সুভাষিত বাক্যদ্বারা লোকসমাজে সুপ্রসংশিত হওয়া যায় ;

চ. ফুলের ন্যায় সজ্জনের সুগন্ধ যশগৌরব দেবতাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

১.৪. প্রদীপ পূজা[৩৪]

ঘনসারপ্পদিত্তেন তমধংসিনা

তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজযামি তমোনুদং

অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশকারী ঘনসার তৈলযুক্ত জলন্তপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানন্ধকার বিনাশক ত্রিলোক প্রদীপ বুদ্ধকে পূজা করছি।

১.৪.১. এ সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলো নিম্নরূপ ; [৩৫]

ক. জ্ঞান লাভের আশায় জ্ঞানের প্রতীক বুদ্ধকে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করা হয় ;

খ. অবিদ্যাবিদূরক বুদ্ধকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে পূজা কর হয় ;

গ. অন্ধকারে প্রদীপ সবাইকে পথ-নির্দেশনার সাহায্য করে তেমনি বুদ্ধ সবাইকে সত্যপথের (নির্বাণ) সন্ধান দিয়ে থাকে ;

ঘ. আলোক বর্তিকাস্বরূপ বুদ্ধকে প্রদীপ দ্বারা পূজা করা হয় ;

ঙ. নির্বাণ কামনায় বুদ্ধসমীপে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করা হয়।

১.৫. ধূপ বা সুগন্ধি পূজা[৩৬]

গন্ধ সম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা

পূজযে পূজানেয্যন্তং পূজা ভাজনং মুত্তমং।

অর্থাৎ আমি গন্ধ সম্ভারযুক্ত সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা দেবমানবের পূজনীয় বুদ্ধকে পূজা করছি।

১.৫.১. এ সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলো নীচে প্রদান করা হলো : [৩৭]

ক. বুদ্ধের গুণরাশি, যশগৌরবকে স্মরণ করার জন্য ধূপ বা সুগন্ধি জ্বালিয়ে পূজা করা হয় ;

খ. পূত পবিত্রময় জীবনগঠন করার জন্য বুদ্ধকে সুগন্ধি জ্বালিয়ে পূজা করা হয় ;

গ. অন্তরের কালিমা নিরুদ্ধকরণে দেব মানবের পূজ্য বুদ্ধকে সুগন্ধি দ্বারা পূজা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬. পানীয় পূজা[৩৮]

অধিবাসেতু নো ভন্তে পানীয়ং উপনমিতং

অনুকম্পং উপাদায পটিগ্‌ণহাতু উত্তমং

অর্থাৎ প্রভু! আপনার (পূজার যোগ্য উত্তম) পানীয় প্রস্তুত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এ উত্তমদান গ্রহণ করুন।

১.৬.১. পানীয় পূজায় নিম্নলিখিত বিশ্বাসগুলো বড়ুয়া জনগোষ্ঠী পালন করে। যেমন : [৩৯]

ক. দীর্ঘজীবনের প্রতীক পানি দান দ্বারা দীর্ঘ সুখসমৃদ্ধ জীবন কামন করা হয় ;

খ. পানি বিশুদ্ধতার প্রতীক, বিশুদ্ধ পানিপানে মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। বুদ্ধকে পানীয় পূজার মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়।

গ. পানি তৃষ্ণা মেটায়, একইভাবে তৃষ্ণাকে দমন করে নিবার্ণ কামনাও করা সম্ভব।

২. বন্দনা

মানুষ মাত্রই সুখ প্রত্যাশী এবং দুঃখ থেকে মুক্তি চায়। তাই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ-শান্তির অভীষ্ট লক্ষে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী স্ব-স্ব সৃষ্টিকর্তাও দেবতাকে অবণত শিরে স্মরণ করে। মনোবাসনা পূরণার্থে মনোতুষ্টি লাভের আশায় একাগ্রচিত্তে ভক্তি করে, স্বীয় মস্তিস্ক অবণত করে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বুদ্ধকে বন্দনা[৪০] করার একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তি। তবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাপোষণ করলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। মানুষ সংসারবর্তে বিষয়-বাসনায় আসক্ত। তারা সুপ্ত অন্তরের অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত আলোকের গুণাগুণ উপলব্ধি করতে পারে না। তাছাড়া সংসারের হিতাহিত, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কারণ যথার্থভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। তদ্ধেতু শোকতাপে দগ্ধীভূত হয়ে বিদগ্ধ অন্তরে ইহলৌকিক-পারলৌকিক সুখ-শান্তির আশায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বুদ্ধকে বন্দনা করে।

বুদ্ধ কারোর প্রতি শান্তির বারি বর্ষণ করে না। তাঁর অনন্ত গুণরাশি ও মহান আদর্শিক জীবনকে অনুসরণের মধ্যে দিয়ে মনের মলিনতা আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে হৃদয়ের অসহনীয় প্রদাহ শান্ত হয় এবং অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়ে উঠে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় স্বমহিমায় ও স্বগৌরবে স্ব-স্ব মানসিক সত্তা নিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। বন্দনা করার পূর্বে[৪১] হাত পা ভাল করে ধূঁয়ে পূতপবিত্র হয়। এ সময় তারা কতকগুলো বুদ্ধবাণী উচ্চারিত[৪২] করে। বুদ্ধের অনুশাসন চিরজাগরুক করার নিমিত্তে এ জনগোষ্ঠীর দু'বেলা

Dhaka University Institutional Repository

বন্দনা করার প্রথা সিদ্ধ নিয়ম আছে। যেমন : ক. সকালে নাস্তা করার আগে ; খ. সন্ধার সময়। আবার অনেকে যারা সন্ধায় করতে পারে না তারা খাবারের আগে এ বন্দনা পর্ব সমাপ্ত করে।

তাছাড়া বয়োঃবৃদ্ধরা দুপুরে খাবার পূর্বে বুদ্ধকে বন্দনাপূর্বক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আবার প্রাত্যহিক কাজে যাবার সময়, ব্যবসা শুরু করার আগে, শিশু-কিশোরদের পরীক্ষা শুরু করার পূর্বে, বিভিন্ন যানে উঠতে এবং যাত্রার সময় বুদ্ধের অনন্ত গুণরাশি স্মরণ করে। পরিবারে কিংবা বিহারে এ বন্দনা একক এবং সমবেতভাবে করা হয়। তবে সমবেত প্রার্থনায় ঐক্য সুদৃঢ় হয় কুলাকুশল বিনিময় হয় ; সর্বোপরি জ্ঞাতিমিলনও হয়। তাই বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সমবেত বন্দনায় গুরুত্বারোপ করে।

২.১. বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ছাড়াও আদিবাসী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী তাদের প্রাত্যহিক পূজা-অচর্নার সময় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ভুলুণ্ঠিত হয়ে বন্দনার করার মাধ্যমে তাদের আশ্রয় ও শরণ করে। এ সময় চিত্তকে করে তোলে নৈতিক বিশুদ্ধতায় পরিশুদ্ধ।

### ২.১.১ বুদ্ধের অনন্ত গুণরাশির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুস্স

অর্থাৎ আমি সেই অর্হৎ সম্যক সম্বুবুদ্ধকে প্রণাম জানাই।

### ২.১.২. ত্রিশরণ[৪৩] গ্রহণ

বুদ্ধং[৪৪] সরণং গচ্ছামি

ধম্মং[৪৫] সরণং গচ্ছামি

সংঘং[৪৬] সরণং গচ্ছামি

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি

দুতিযম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি

ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি

ততিযম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি[৪৭]

অর্থাৎ আমি বুদ্ধের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করছি

আমি ধর্মের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করেছি

Dhaka University Institutional Repository

আমি সংঘের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয়বার --- তৃতীয়বার  বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করছি।

বৌদ্ধদের পরম আশ্রয় ত্রিশরণ। যাকে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ দ্বার বলা হয়। বৌদ্ধ উপাসক পদবাচ্যে বিমণ্ডিত হতে হলে প্রথমে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর দুঃখ বিনাশে, রোগ-শোক-অনুতাপ ; ভয়-অন্তরায় চিরতরে দূরীভূতকরণে গাড়ীতে উঠা-নামার সময় এ ত্রিশরণকে শরণ করে একাগ্র ভক্তিচিত্তে।

২.১.৩. বুদ্ধ বন্দনা

বুদ্ধ অর্থ অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। বুদ্ধের শরণ অর্থাৎ জ্ঞানীর শরণ। জ্ঞানীর আশ্রয়ে মানুষ কখনো বিপথগামী হতে পারে না। জ্ঞানী মাত্রই সৎপথ প্রদর্শক ও নির্দেশক। বুদ্ধের শরণাশ্রয়ে এসে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী তাঁরই মহান আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তির সন্ধান লাভ করে। অর্জন করে জ্ঞানগর্ভ মৌলিক শিক্ষা জ্ঞানী ও সুজন ব্যক্তি সকলের আশ্রয়স্থল হলেন বুদ্ধ। 'বুদ্ধ' বন্দনাটি নিম্নরূপ ;

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি, সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধ ভগবাতি।

বুদ্ধং জীবিতং পরিযন্তং[৪৮] সরণং গচ্ছামি

যে চ বুদ্ধ অতীতা চ যে চ বুদ্ধ অনাগতা

পচ্চুপ্পন্নো চ যে বুদ্ধ অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং।

বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মমং।

অর্থাৎ এই সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেবমানবের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।

যতদিন পযর্ন্ত আমার পরিনির্বাণ লাভ না হয়, ততদিন পযর্ন্ত আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি। যে সমস্ত বুদ্ধ অতীত হয়েছেন, যে বুদ্ধ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবেন এবং যে বুদ্ধ বর্তমানে উৎপন্ন হয়েছেন আমি তাদেরকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বুদ্ধ ছাড়া আর আমার অন্যকোনো শরণ নেই। এ সত্যক্রিয়া দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হোক। আমি

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের অতি উত্তম পদরেণু অবণত মস্তকে বন্দনা করছি। আমার অজ্ঞানতাবশত কোনো পাপ করে থাকলে বুদ্ধ আমায় ক্ষমা করুন।

২.১.৪. ধর্ম বন্দনা

'ধর্ম' অর্থ ধারণ করা, সুনীতি বা সদাচার বিধির শরণ। এখানে 'ধর্ম' বলতে বুদ্ধের দেশিত ধর্মবাণীকে বোঝায়। যা অনুশীলন বা পরিপালনে মানুষের ঐহিক পারত্রিককল্যাণ সাধিত হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বুদ্ধের ধর্মকে শরণের মাধ্যমে আদর্শ জীবনযাপনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। তাছাড়া সম্যককর্ম সম্পাদন এবং ধর্মত জীবনাযাপনে প্রোৎসাহিত হয়। ধর্ম বন্দনাটি নিম্নরূপ :

স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো সন্দিট্ঠিকো অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞুহী'তি।

ধম্মং জীবিতং পরিযন্তং[৪৯] সরণং গচ্ছামি
যে চ ধম্মা অতীতা চ যে চ ধম্মা অনাগতা,
পচ্চুপ্পনো চ যে ধম্ম অহং বন্দামি সব্বদা।
নত্থি মে সরণ অঞ্ঞং ধম্মো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ধমঞ্চ দ্বিবিধুত্তমং।
ধম্মো যো খলিতো দোসো ধম্মো খমতু তং মমং।

অর্থাৎ ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে খ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, নৈর্বাণিক, বিজ্ঞজন কর্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাত্তব্য।

[বিঃ দ্রঃ বাকীগুলো বুদ্ধ স্থলে ধর্ম হবে]

২.১.৫. সংঘ বন্দনা

'সংঘ' অর্থ সমষ্টি, রাশি, নিকায়, দল, সমিতি বা বহুর সমাবেশকে বোঝায়। কিন্তু এখানে বৌদ্ধশাসন রক্ষাকারী সদ্ধর্মের ধারক- বাহক ভিক্ষুসংঘকে বোঝায়। বুদ্ধই সর্বপ্রথম ভিক্ষুসংঘের প্রবর্তন করেন। সাংঘিক শৃংখলা ও সদ্ধর্মের অভিবৃদ্ধি সাধনই সংঘের আদর্শ ও অন্যতম মূললক্ষ্য। সংঘ'র বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক. সংঘ অর্থাৎ বুদ্ধের একান্ত অনুগত শ্রাবক ;

খ. সংঘ অর্থাৎ সাংঘিক বিনয়ের বিমূর্ত প্রতীক ;

গ. সংঘ অর্থাৎ শান্তিরও বিমূর্ত প্রতীক ;

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সংঘ অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক ;

ঙ. সংঘ অর্থাৎ শৃংখলাবদ্ধ জীবনের প্রতীক।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অনন্তগুণের আধার ভিক্ষুসংঘকে শরণ করে। জীবনধারণ তাদের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করে। তাদের মুখ থেকে বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করে সুখী-সমৃদ্ধ জীবনগঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সংঘ বন্দনাটি নিম্নরূপ : সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সমীচি পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদ্দিং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপুরিস পুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, আহুনেয্যে, পাহুনেয্যো, দ্কখিণেয্যো, অঞ্জলি করনীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি।

সংঘং জীবিতং পরিযন্তং[৫০] সরণং গচ্ছামি

যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,

পচ্চুপন্নো চ যে সঙ্ঘা অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং সঙ্ঘো মে সরণং বরং

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং সঙ্ঘঞ্চ ত্রিবিধ মুত্তমং।

সঙ্ঘমো খবলিতো দোসো সঙ্ঘো খমতু তং মমং।

অর্থাৎ ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, যথার্থ উপযুক্ত বা উত্তম পথ প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদযুগল হিসেবে অষ্ট পুরুষপুদগল। চারি আর্যমার্গ ও চারি আর্যফল প্রাপ্ত অষ্টপুরুষ আহুতিলাভের যোগ্য। দূরদেশ হতে আগত জ্ঞাতিমিত্র এর ন্যায় খাদ্যভোজ্য দ্বারা পূজারযোগ্য, দক্ষিণাগ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিপুটে নতশিরে বন্দনারযোগ্য এবং সমস্ত দেব-নরের সর্বশ্রেষ্ঠ পূণ্যক্ষেত্র।

[বি:দ্রঃ অবশিষ্টগুলো 'বুদ্ধ' এর স্থলে সংঘ হবে।]

গাথায় ত্রিরত্ন বন্দনা[৫১]

যো সন্নিসিন্নো বর বোধিমূলে মারং সসেনং মহতি বিজেত্বা,

সম্বোধি মাগঞ্ছি অনন্ত ঞানো লোকওমো তং পণমামি বুদ্ধং।

অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ বোধিতরুমূলে মহাশক্তি সম্পন্ন সসৈন্য মারকে পরাজিত করে সম্বোধি লাভ করেছেন ; আমি সেই অনন্ত জ্ঞানালোকত্তম বুদ্ধকে প্রণাম করছি।

অট্ঠঙ্গিকো অরিযপথো জনানং মোক্খপ্পবেসো উজুকোব মগ্গো,

Dhaka University Institutional Repository

ধম্মো অয়ং সন্তিকরো পণীতোং নিয্যানিকো তং পণমামি ধম্মং।

অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করার যে অষ্টবিধ সমন্বিত ঋজুমার্গ আছে আমি সেই শান্তিকর নির্বাণদায়ক ধর্মকে প্রণাম করছি।

সঙ্ঘো বিসুদ্ধো বরদক্খিনেয্যা সন্তিন্দিযো সব্বমলপ্পহীনো,

গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপ্পত্তো অনাসবো তং পণমামি সংঘং।

অর্থাৎ বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ দক্ষিণার উপযুক্ত, শান্তেন্দ্রিয়, সকল প্রকার পাপমলহীন অনেক গুণমুক্ত, সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আসবহীন সংঘকে আমি প্রণাম করছি।

২.১.৭. ভিক্ষু[৫২] বন্দনা

ওকাস বন্দামি ভন্তে, দ্বারন্তেন কতং সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে। (৩ বার)

অর্থাৎ অবকাশ করুন ভন্তে, আমি আপনাকে বন্দনা করছি, ত্রিবিধদ্বারে আমার কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

এদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ধর্মপরায়ণ। তারা প্রাত্যহিক কর্ম শুরু করার আগে বুদ্ধকে শরণ করে। এ শরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় কতগুলো বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসপ্রসূত আচারতি ধর্ম নয়, তথাপি তারা এ আচরণে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসগুলো নিম্নরূপ[৫৩]:

ক. বন্দনা দ্বারা মানুষের সুপ্ত প্রতিভার দ্বারোৎঘাটন হয় ;

খ. বন্দনা দ্বারা পূত-পবিত্রময় বিশুদ্ধ জীবনযাপন হয় ;

গ. বন্দনা দ্বারা শৃঙ্খলিক ও আদর্শিক জীবনযাপন হয় ;

ঘ. বন্দনার ফলে বিক্ষিপ্তচিত্তে স্থিরতা আসে, এবং কালে তা প্রবাহমান থাকে ;

ঙ. বন্দনার মাধ্যমে লোভ-দ্বেষ-মোহ চিরতরে বিদূরিত হয় ;

চ. আত্মশুদ্ধিতা ও সদ্ভাব এর উদয় হয় ;

ছ. সম্যক বা সত্যেধর্মে অবস্থান করা যায় ;

জ. আত্মসুখ উপলব্ধি করা যায় ;

ঝ. আয়ু-বর্ণ-সুখ-ধনও যশ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ;

ঞ. ষড়রিপুকে[৫৪] দমন করা যায় ;

ট. মনের প্রদাহ প্রশমিত হয় ;

ঠ. কাজে সফলতা বয়ে আনে ;

Dhaka University Institutional Repository

ড. পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় ;

ঢ. জন্মান্তরে সুখের অধিকারী হওয়া যায় ;

ণ. উন্নত-সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভ হয় ;

ত. কায়-বাক্য-মনের বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় ;

থ. সর্বোপরি নির্বাণ লাভে সহায়ক হয় ;

দ. শারীরিক সুস্থতা উপলব্ধি করা হয়।

## ২.২. বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন বন্দনা

বুদ্ধের শারিরীক ধাতু এবং অন্যান্য পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বাংলাদেশে একেবারে নেই বললেও চলে। তথাপি এদেশে বসবাসরত এ জনগোষ্ঠী তাদের প্রাত্যহিক ঐতিহ্যধারায় ধর্ম-কর্ম সম্পাদানের সময় স্ব-স্ব জীবনকে অত্যুজ্জ্বলে ঋদ্ধকরণের মাধ্যমে বুদ্ধের পূত পবিত্রময় স্মৃতি চিহ্নকে অবণত মস্তকে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করে। শ্রদ্ধা বা অর্ঘ জ্ঞাপনের সময় তারা মানবতার মূর্ত প্রতীক মহামতি বুদ্ধকে শরণ করে। এ রকম শরণের মাধ্যমেও শুদ্ধধর্ম-শুদ্ধকর্ম সম্পাদনে আত্মবিশ্বাস হওয়া যায় বলে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস। নিম্নলিখিত[৫৫]ভাবে তারা বুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নগুলোকে বন্দনা করে থাকে।

### ২.২.১. ত্রিচৈত্য বন্দনা

বন্দামি চেতিযং সব্বং সব্বট্ঠানেসু পতিট্ঠিকং
সারীরিক ধাতুং মহাবোধিং বুদ্ধরূপং সকলং সদা।

অর্থাৎ সকলস্থানে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের শারিরীক ধাতু, মহাবোধি ও সমস্ত বুদ্ধরূপ এই ত্রিচৈত্যর উদ্দেশ্যে আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

### ২.২.২. বোধি বন্দনা

যস্সমূলে নিসিন্নোব সব্বারি বিজযং অকা,
পত্তো সব্বঞ্ঞুতং সথা বন্দেতং বোধিপাদপং।
ইমেহেতে মহাবোধি লোকনাথেন পূজিতা,
অহম্পিতে নম্সসামি, বোধিরাজা নমত্থুতে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ্যাৎ যে বোধিবৃক্ষের মূলে বসে শান্ত সমুদয় ক্লেশঅরিকে বিনাশ করে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করছি। এই মহাবোধি বৃক্ষ লোকনাথ বুদ্ধকর্তৃক পূজিত, আমিও সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি।

২.২.৩. সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

পঠমং বোধিপল্লঙ্কং, দুতিযং অনিমিসম্পি চ,
ততিযং চঙ্কমনংসেটঠ, চতুত্থং রতনঘরং,
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং,
সত্তমং রাজাযতন, বন্দে তং বোধিপাদপং।

অর্থাৎ প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চংক্রমন স্থান, চতুর্থ রত্নাগার, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তন বৃক্ষ এই সপ্ত মহাস্থানকে আমি বন্দনা করছি।

২.২.৪. দন্ত ধাতু বন্দনা

একাদাঠা তিদসপুরে একা নাগপুরে আহু,
একা গান্ধার বিসযে একাসি পুন সীহলে।
চতুস্সোতা মহাদাঠা, নিব্বাণ রসদীপিকা,
পূজিতা নরদেবেহি তাপি বন্দামি ধাতুযো।

অর্থাৎ বুদ্ধের একটি দন্ত ত্রিদশালয়ে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, আরেকটি সিংহলে নির্বাণ রসোদ্দীপক এ চারটি মহাদন্ত নরদেব কর্তৃক পূজিত হয়। আমিও সেই দন্তধাতু চতুষ্টয়কে বন্দনা করছি।

২.২.৫. অষ্ট স্তূপ বন্দনা

একো থূপো রাজগহে, একো বেসালিয়া পুরে,
একো কপিলবত্থুস্মিং, একো চ অল্লকপ্পকে।
একোসি রামগাস্মিং, একো চ বেঠদীপকে,
একো পাবেয্যকে মল্লে, একো চ কুশসীনারকে।
এতে অট্ঠ মহাথূপা জম্বুদীপে পতিট্ঠিতা,
পূজিতা নরদেবেহি তেপি বন্দামি সব্বদা।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ রাজগৃহে, বৈশালীতে, কপিলাবস্তুতে, অল্লকপ্পে, রামগ্রামে, বৈঠদ্বীপে, পাবা রাজ্যে ও কুশীনগর এ আটটি মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, দেব-নররা এ স্তূপগুলো পূজা করে। আমিও অষ্ট মহাস্তূপ বন্দনা করছি।

### ২.২.৫.১. বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন সম্পর্কীয় বিশ্বাস[৫৬]

ক. বুদ্ধের এ স্মৃতিগুলোকে শরণের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ লাভ হয় ;

খ. এ গুলোকে বন্দনার মাধ্যমে ইহজাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ হয় ;

গ. স্বর্গীয় সুখ পাওয়া যায় ;

ঘ. নির্মলচিত্তে এ পবিত্রস্মৃতিকে বন্দনা করলে দৈনন্দিন সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়। পারস্পারিক সৌর্হাদ্য সম্প্রীতি তথা আন্তঃধর্মীয় সুখ সমৃদ্ধি কামনা করা হয় ;

ঙ. চিত্তের মালিন্যতা বিদূরিত হয় ;

চ. নৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পায় এবং সুখে থাকার বিশুদ্ধ পথ প্রদর্শিত হয় ;

ছ. মিথ্যাবুদ্ধি, ভ্রান্তধারণার বশবতী না হয়ে সম্যকপথে নিজেকে সর্মপণ করা হয় ;

জ. নির্বাণ লাভে সহায়ক হয়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ধারণা বুদ্ধ না থাকলেও তাঁর পূত পরিত্রময় স্মৃতি চিহ্ন গুলোর প্রতি গভীর আনুরক্তিবশত তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাদের বিশ্বাস, আহ্নিক ধর্ম-কর্মের মধ্যে এগুলোর স্মৃতিচারণ করলে আত্মিক উন্নয়ন হয়। তাদের মতে বুদ্ধ সেখানে বিরাজমান। এটা একটা নিছক ধর্মবিশ্বাস নিঃসন্দেহ। তবে সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যতই এ সম্প্রদায় আধুনিক গগণচুম্বী ভাবুক হোক না কেন কেউ এ গুলোকে অবজ্ঞা করে না, অশ্রদ্ধায় ঘৃণা করে না।

## ২.৩. অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা

মানুষ ও পরিবেশের ধারাবাহিকতাই সৃষ্টি হয় ইতিহাস। সভ্যতার এগিয়ে যাবার এবং পেছনে ফেলে আসার রূপরেখাই ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ অতীত 'অষ্টবিংশতি বুদ্ধ' বৌদ্ধদের ধর্মীয়জীবনে নানাভাবে প্রভাব ফেলে। তাঁরা ধর্মীয় সিদ্ধপুরুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এ জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক বন্দনার সময় তাদেরও শরণ করে।

### ২.৩.১. অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা

তণ্হঙ্করো মহাবীরো মেধঙ্করো মহাযসো,
সরণঙ্করো লোকহিতো দীপঙ্করো জুতিন্ধরো।

Dhaka University Institutional Repository

কোণ্ডঞ্ঞো জনপামোক্খো মঙ্গলো পুরিসাসভো,
সুমনো সুমনো ধীরো রেবতো রতিবদ্ধনো।
সোভিতো গুণসম্পন্নো অনোমদস্সী জনুত্তমো,
পদুমো লোকপজ্জোতো নারদো বর সারথি।
পদুমুত্তরো সত্তসারো সুমেধো অগ্গপুগ্গলো,
সুজাতো সব্বলোকগ্গো পিযদস্সী নরাসভো।
অত্থদস্সী কারুণিকো ধম্মদস্সী তমোনুদো,
সিদ্ধত্থো অসমো লোকে তিস্সো বরদসংবরো।
ফুস্সো বরদসম্বুদ্ধো বিপস্সী চ অনুপমো,
সিখী সব্বহিতো সত্থা বেস্সভূ সুখদায়কো।
কুকুসন্ধো সত্থবাহো কোনাগমনো রণঞ্জহো,
কস্সপো সিরিসম্পন্নো গোতমো সক্যপুঙ্গবো।
অট্ঠবীসতি'মে বুদ্ধা নিব্বাণমতদায়কা,
নমামি সিরসা নিচচং তে মে রকখন্তু সব্বদা।

অর্থাৎ মহাবীর তৃষ্ণাঙ্কর, মহাযশশ্বী মেধঙ্কর, লোকহিতৈষী শরণঙ্কর জ্যোতিশালী দীপঙ্কর, জনশ্রেষ্ঠ কৌণ্ডিন্য, পুরুষশ্রেষ্ঠ মঙ্গল, মানসম্পন্ন ধীর সুমন, রতিবর্দ্ধক রেবত, গুণসম্পন্ন শোভিত, জনোত্তম অনোমদর্শী, লোকরঞ্জক পদুম, শ্রেষ্ঠসারথী নারদ, সত্ত্বসার পদুমুত্তর, শ্রেষ্ঠ পুদ্গল সুমেধ, সর্বলোক শ্রেষ্ঠ সুজাত, নরাসভ প্রিয়দর্শী, কারুনিক অর্থদশী, অন্ধকার বিনোদনকারী ধর্মদর্শী, অদ্বিতীয় সিদ্ধার্থ, সুসংযমী তিষ্য, সম্বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ফুস্য, অনুপম বিপশ্বী, সর্বহিতকারী শিখী, সুখদায়ক বেশ্যভূ, স্বার্থবাহ ককুসন্ধ, পাপত্যাগী কোণাগমন, শ্রীসম্পন্ন কশ্যপ ও শাক্যপুঙ্গবে গৌতম এ অষ্টবিংশতি সম্যক সম্বুদ্ধ নির্বাণামৃত প্রদানকারী। আমি অবণতশিরে তাঁদেরকে বন্দনা করছি, তারা নিত্য আমাকে রক্ষা করুক।

২.৩.১.১. অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনায় প্রচলিত লোকধারণা। নিম্নরূপ[৫৭]:

ক. বুদ্ধের ন্যায় তারাও সবাইকে সত্য-ঋজু পথে আহবান করেছিল ;
খ. তাদেরকে একাগ্রচিত্তে শরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় ;
গ. ইহ-জাগতিক সুখ প্রত্যাশা করা যায় ;

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. জন্মান্তরেও উন্নত সমৃদ্ধশালী জীবনলাভ করা যায় ;

ঙ. লোভ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত হয় ;

চ. সর্বহিত সুখ কামনা করা হয় ;

ছ. নির্বাণ লাভে সচেষ্ট হওয়া যায়।

### ২.৪. মাতা-পিতা বন্দনা

সন্তান-সন্ততিদের নিকট মাতাপিতা অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য। মাতাকে বাদ দিয়ে পিতার অস্তিত্ব যেমন অকল্পনীয় তেমনি পিতাকে বাদ দিয়ে মাতার কথাও অভাবনীয়। তারা উভয়েই সন্তান-সন্ততিদেরকে স্নেহ মায়ামমতা আদর ভালবাসা বিদ্যাশিক্ষা এবং নানাবিধ শিল্পজ্ঞান দিয়ে উপযুক্ত করে তোলেন। মাতা-পিতার দান সন্তান-সন্ততিদের জীবনে অপরিসীম নয় বরং অতুলনীয়ও বটে। তাঁরাই একমাত্র আপনজন যারা নির্বিচারে, নিদ্ধিধায় সন্তান সন্ত তিদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে। মাতা-পিতা সেবা করাকে বুদ্ধ উত্তমমঙ্গল বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইসলাম ও হিন্দুধর্মেও মাতা-পিতার স্থান অবর্ণনীয়।

### ২.৪.১. মাতা বন্দনা

কত্বান কাযে রুধিরং খীরং যা সিনেহ পুরিতা
পাযেত্বা মং সংবড্ঢেসি বন্দেতং মম মাতরং

অর্থাৎ যে স্নেহশীল জননী স্বীয় স্তন্যপানে আমাকে পালন করছে ; সে মাতাকে বন্দনা করছি।

### পিতা বন্দনা

দযায পুরিপুন্নোব জনকো যো পিতা মম,
পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি বন্দে তং পিতরং মম।

অর্থাৎ দয়ায় পরিপূর্ণ যে পিতা আমাকে পোষণ করেছেন এবং আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিকশিত করেছেন, সে পিতাকে আমি বন্দনা করছি।

#### ২.৪.১.১. লোক ধারণা[৫৮]

ক. মা বাবা অদ্বিতীয়, তাদের সাথে কারো তুলনা করা যায় না। তাদের অসীম স্নেহ মমতায় সবার শারিরীক গঠন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে বা স্মরণার্থে তাদের বন্দনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খ. উভয়ের প্রাণ স্পর্শতাই এ জীবন ধন্য হয়ে উঠেছে, তাদের গুরু-সম্ভীর ছোঁয়া না থাকলে এ জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ত ; তাই আমৃত্য তাদের স্মরণ করা হয়।

গ. তাদের উভয়ের উপকার অপরিশোধযোগ্য, তারা মহোপকারী। তাই তাদেরকে বন্দনার মাধ্যমে স্মরণ করা হয়।

সংসারে মাতাপিতার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ছাড়া পৃথিবী অসার এবং নিঃস্ব। পৃথিবীর উপভোগ্য সমস্ত সৌন্দর্য মা-বাবার দ্বারাই সম্ভব। আপন প্রাণের চেয়ে তারা সন্তান সন্ততির প্রাণকে অধিক গুরুত্ব,দেয়। যা আমরা বুদ্ধ বাক্যতে দেখতে পাই[৫৯]। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মা-বাবাকে পরম-নিকট আত্মীয় মনে করে তাদেরকে প্রতিদিন দু'বেলা[৬০] বন্দনা করার মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে।

২.৫. শীল পালন

শীল পালন করা প্রত্যেক বৌদ্ধদের নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য বটে। যে কোনো পূজা-পার্বনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে কিংবা অষ্টমী, অমাবশ্যা, পূর্ণিমার দিনে বিহারে অথবা গৃহে এককভাবে নতুবা সমষ্ঠিগতভাবে ভিক্ষুর মাধ্যমে শীল পালন করে। শীল বহু অর্থব্যঞ্জক শব্দ। যেমন :

১. যা দ্বারা মনের পরিদাহ নির্বাপিত হয়ে শীতল হয় তার নাম শীল[৬১]।

২. বিচ্ছিন্ন শিরপ্রাণী যেমন মৃত, শীলবিহীন দুঃশীল ব্যক্তিও মৃতপ্রায়। এই অর্থে শীলের অপর নাম শির[৬২]।

৩. শীলের মধ্যে সমস্ত কুশলধর্ম প্রতিষ্টা বা আশ্রয় করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই অর্থে শীলের অপর নাম প্রতীক[৬৩]।

৪. শীলের সংস্পর্শে কায়িক-বাচনিক বিশৃংখলা দূর হয়ে ইন্দ্রিয় সুদন্তি-সুসংযত হয় ; এই অর্থে শীলের অপর নাম শান্তি[৬৪]।

শীল হল অনুশীলন। সকল প্রকার অকুশলধর্ম বর্জন করা, উচ্ছৃঙ্খলতার অপসারণ, চৌর্য-ব্যভিচার, অকথর্ণীয় বাক্য ও নেশাপান নিবারণ শীলের অন্যতম কাজ। শীল নিম্নরূপ : পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল এবং ২২৭ শীল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, পঞ্চশীল ; গৃহীদের প্রতিপালনীয়। সকাল-সন্ধার পালন করা হয়। অষ্টশীল : অষ্টমী, অমাবশ্যা, চর্তুদশী এবং পূর্ণিমার দিনে উপোসথকারীরা অষ্টশীল পালন করে। দশশীল এবং ২২৭ শীল : এগুলো ভিক্ষু শ্রামণেরদের প্রতিপালনীয় শীল। এই শীলে মাহাত্মত্যা প্রকাশ করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন ; যো চ সীলবন্তং গন্ধো বাতি দেবেসু উত্তমো[৬৫] অর্থাৎ যিনি শীলবান তার শীলসৌরভ দেবতাদের মধ্যেও ব্যাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহী এবং প্রব্রজিত উভয়ের জন্য শীলপালন একান্ত অপরিহার্য। শীল পালনে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী শীলপালনে দ্বিধাবোধ করে না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার শীল পালন করে। আদিবাসী বৌদ্ধসমাজেও এ শীল পালন প্রচলিত রয়েছে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; শীলপালন ব্যতীত ইহ-পারত্রিক উভয়কালে সুখ লাভের আর কোনো উপায় নেই।

৩.

বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী প্রাচীন থেরবাদী বৌদ্ধ ভাবধারায় বিশ্বাসী। এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বুদ্ধ ও তার ধর্মকে যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে কালযাপন করে। এ জনগোষ্ঠীর আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের নাম শরণের মধ্যে দিয়ে স্ব-স্ব প্রাত্যহিক কর্ম শুরু করে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রতিদিন গৃহের পূজা বন্দনা ছাড়াও এ জনগোষ্ঠী প্রতিমাসের অষ্টমী, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাতে বৌদ্ধ বিহারে এবং নিজগৃহে পূজা করত বুদ্ধকে বন্দনা করে। তাদের এ রকম পূজা এবং বন্দনায় একদিকে আয়ু, বর্ণ, সুখ, ধন, যশকীর্তি বৃদ্ধির আশা যেমন থাকে তেমনি আবার থাকে নির্বাণ লাভ করার অফুরন্ত কামনা বাসনা। এখানে তারা পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি চেয়ে বুদ্ধকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। ধারণা করা হয়, অন্যান্য ধর্মদ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা এরকম প্রার্থনায় রত হয়। তবে এটাও সত্য যে, পূজা ও বন্দনায় পারিবারিক এবং সামাজিক ঐক্য, মৈত্রী বৃদ্ধি পায়। এ বন্দনা দ্বারা সামাজিক-সম্প্রীতি সম্প্রসারণ হয় ; অহিংসা মন্ত্রে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়। সর্বোপরি নৈতিক, শৃঙ্খলিক এবং আদর্শিক জীবনগঠন হয় এমনটি তাদের বিশ্বাস রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তথ্যনিদেশ

১. ড.ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ১৩ ; লোকসংস্কৃতি নিতান্ত সাধারণ নিরক্ষর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার বৈচিত্রময়রূপই লোকসংস্কৃতিতে ধরা পড়ে তাদের জীবন-জীবিকা। ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, স্বজন থেকে সংস্কার-বিশ্বাস সবই এই লোকসংস্কৃতির উপাদান।

ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, *লোকসংস্কৃতি ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ*, ভারত বিচিত্রা, বর্ষ তেত্রিশ (বৈশাখ-জৈষ্ঠা, ১৪১৩, মে ২০০৬), পৃ. ৩৪

২. উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, '*লোককলা : তত্ত্ব ও মতবাদ*', সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ), সংখ্যা-৪১ (কার্তিক-১৪০৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১০৮-১০৯

৩. Alexander Haggerty Krappe, *The Science of Folklore* (U.S.A : Methuen & Com Ltd. 1962), P. XI

Dhaka University Institutional Repository

৪. Edited by Tristram P. Coffin III, *American Folklore* (America : voice of American Folklore, 1968), p. 03

৫. Ibid, P. 269

৬. George, G. Garey, *Maryland Folklore and Folklife* (Maryland : Tide Watere Publishers, 1979), P. 01

৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য* (ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৫), পৃ. ৭৫

৮. মোঃ হানীফ পাঠান, *বাংলাপ্রবাদ পরিচিতি*, ২য় খণ্ড-প্রথম পর্ব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ০২

৯. আবদুল হাফিজ, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ১২

১০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকশ্রুতি* (কলিকাতা : পুস্তক বিপনী, ১৯৮৫), পৃ. ০৬

১১. আতোয়ার রহমান, *লোককৃতি, কথাগুচ্ছ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৮

১২. ড. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৩৬-৫১

১৩. Dan-Ben-Amus, *Folklore Context Essays* (New Delhi : South Asian Publishers Pvt Ltd, 1982), P. 03

১৪. Ed. Tristram P. coffin III, op.cit., P. 14

১৫. Jan Harold Brunvand, *The Study of Americans* Folklore (New york : W.W. Norton & Company, 1980), P. 07

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৬২), পৃ. ২০৬

১৭. Jan Harold Brunvand, *The Study of Americans Folklore*, op.cit., P. 07

১৮. বিশুদ্ধাচার স্থবির, *সীবলী ব্রতকথা* (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ২০০০), পৃ. জ

১৯. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্যে চর্চার ইতিহাস* (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯), পৃ. ০১

২০. উদ্ধৃত, শামসুজ্জামান খান, অ্যালান ডাণ্ডেস : *ফোকলোর ও নৃতত্ত্ববিদ্যার এক অসামান্য প্রতিভার প্রতিকৃতি*, *কালি ও কলম*, ষষ্ঠ সংখ্যা (জুলাই ২০০৫), ঢাকা, পৃ. ১৩

২১. ধম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনির্বাণ সূত্ত* (চট্টগ্রাম : ১৯৪০), পৃ. ১৯৭

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বুদ্ধদেব* (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউণ্ডেসন, ১৯৯৫) পৃ. ৫৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২৪. ধম্মরত্ন মহাস্থবির অনুদিত, *মহাপরিনির্বাণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

২৫. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনুদিত, *খুদ্দকপাঠো* (চট্টগ্রাম : ১৯৫৫) পৃ. ১৮

২৬. *ধর্ম্মপদ*, সহস্রবর্গ/ ১০৭

২৭. বিভিন্ন গ্রাম সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

২৮. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৬) ধর্মপাল ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্নমালা* (কলিকাতা : ১৯৮৪), আনন্দমিত্র মহাথের, *উপাসনা*, (কলিকাতা : ১৯৮৯), ধর্মদীপ্তি স্থবির, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৯)

২৯. আহার, পানি, বিভিন্ন রকম ফলমূল, চুষ্য-লেহ্য জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি দ্বারা বুদ্ধকে যে পূজা করা হয় তা-ই বুদ্ধপূজা।

৩০. শুধু মানুষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর সকলপ্রাণীর জন্য আহার অত্যাবশ্যক। আহার ব্যতীত কেউ দীর্ঘকাল অতিক্রম করতে পারে না। আহার শারিরীক গঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে। একসময় এ বিষয়ে সোপাক নামক একজন সপ্তবর্ষীয় শ্রামণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ; জীব সমুদয় আহারেই জীবনধারণ করে। (ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮) তবে এ জনগোষ্ঠী দুপুর বারোটার পূর্বেই বুদ্ধকে উপলক্ষ করে আহার প্রদান করে।

৩১. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩২. হরেকরকম ফুল কুড়িয়ে এনে হাত পা ধৌত করে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের স্মরণের মাধ্যমে সেই ফুল থালায় সুন্দর করে সাজিয়ে বুদ্ধ সমীপে এ পুষ্পপূজা করা হয়।

৩৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩৪. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রতিটি গৃহে সন্ধ্যার পর পরই বুদ্ধমূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করা হয়। এ পূজা করার সময় কোনো পরিবার এককভাবে আবার কোনো কোনো পরিবারে সমবেতভাবে বন্দনা করে।

৩৫. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩৬. প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে পূজা করার সময় ধূপ বা সুগন্ধি জ্বালিয়ে পূজা করা হয়।

৩৭. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩৮. প্রাণী মাত্রই পানির উপর নির্ভরশীল। যা ব্যতিত চলমান জীবনযাত্রাকে গতিশীলতাময় করে তোলা খুবই দুরূহ ব্যাপার। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই পানিকে জীবনরক্ষাকারী হিসেবে অভিহিত করে থাকে। তবে এখানে পানি এবং পানীয়সামগ্রীকে পানীয়পূজা হিসেবে গণ্য করা হয়। সকাল এবং সন্ধ্যায় এ পানীয়পূজা করা হয়।

৩৯. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৪০. বুদ্ধের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্ঞাপন করা ছাড়াও তার যশকীর্তির, গুণকীর্তন, স্তুতি ও মহাত্মাতার বহিঃপ্রকাশ এ বন্দনা।

৪১. বৌদ্ধবিহার কিংবা স্ব-স্ব গৃহে বন্দনা পর্বটি সমাপ্ত করে।

৪২. এ সমস্ত বুদ্ধবাণী সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন : ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬) জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম বত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৩৩৬), ধর্মপাল ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্নমালা* (কলিকাতা : ১৯৮৪), অমৃতানন্দ মহাস্থবির, *ধর্মদীপিকা* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৪), ধর্মদীপ্তি স্থবির, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৯)

৪৩. ত্রিশরণ বৌদ্ধধর্মের প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। কোনো ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করতে ইচ্ছাপোষণ করলে প্রথমেই ত্রিশরণাপন্ন হতে হয়। বুদ্ধ সর্বপ্রথম যশ এবং ভ্রদ্রবর্গীয় যুবকবৃন্দকে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশকালে এই পদ্ধতির প্রচলন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তখন হতে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশকালে এই ত্রিশরণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। ত্রিশরণ হচ্ছে মূলত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ। বৌদ্ধ মাত্রেই ত্রিশরণ প্রতিপাল্য। ত্রিশরণ ব্যতীত কেহ পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

৪৪. এটা বংশ বা গোত্রগত কিংবা মাতৃপিতৃ কর্তৃক প্রদত্ত কোন নাম নয়। যিনি বোধিদ্রুমমূলে উপবিষ্ট হয়ে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেন তিনিই বুদ্ধ। সর্বদর্শী বলে বুদ্ধ। নিজে জ্ঞাত হয়ে অন্যকে জ্ঞাত করিয়েছেন এ অর্থে বুদ্ধ। চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করেছেন বলে বুদ্ধ।

৪৫. বুদ্ধ প্রবর্তিত কল্যাণময় দেশিত উপদেশ, বাণী কিংবা বিধিবিধানই ধর্ম নামে অভিহিত। এটা ন্যায় ও সত্যের অলংঘনীয় নীতি। সংসারজীবনে এ নীতি পালনের মাধ্যমে সম্যক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সৎ ভাবে জীবনযাপনে সবাই উদ্বুদ্ধ।

৪৬. বুদ্ধের আর্যশ্রাবককে সংঘ বলা হয়। সংঘ একটি প্রতিষ্ঠান। বুদ্ধ এখানে শুধু তাকে শরণ করতে বলেন নি ; সঙ্গে ধর্ম ও সংঘকেও শরণ করার বিধান দিয়েছিলেন। এতেই অনুমান করা যায় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ, অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। বুদ্ধ সংঘকেই বড় শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন।

৪৭. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ০২-০৩

৪৮. অনেকে আবার যাব পরিনিব্বাণং উচ্চারণ করে থাকে।

৪৯. পূর্বোক্ত

৫০. পূর্বোক্ত

৫১. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এ তিনটির এক একটিকে আবার রত্ন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৫২. যারা অনাগরিক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে আসবক্ষয় করার নিমিত্তে সকল প্রকার পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করে সাংঘিক কর্তব্য সম্পাদন করে তাদেরকে ভিক্ষু বলা হয়। এ জনগোষ্ঠীর যে কেউ বৌদ্ধবিহারে গেলেই প্রথমে বুদ্ধকে প্রণাম করত ভিক্ষুকে করজোড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বন্দনা জানিয়ে থাকে।

৫৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৫৪. ষড়রিপু : চক্ষু (eye), কর্ণ (ear), নাসিকা (nose), জিহ্বা (tongue), ত্বক (touch or body) ও মন (mind)। এ ষড়রিপুর আবার ছয়টি বিষয় : চক্ষু-রূপ ; কর্ণ-শব্দ ; নাসিকা-গন্ধ ; জিহ্বা-রস ; ত্বক-স্পর্শ এবং মন-কল্পনা।

৫৫. এগুলো ৪২ নং পাদটীকায় উল্লেখিত বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়

৫৬. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৫৭. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৫৮. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৫৯. মা তার নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রকে রক্ষা করে (খুদ্দক পাঠো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬)

৬০. সকাল বেলায় ঘুম থেকে হাত পা ধৌত করে নাস্তা খাবার আগে এবং সন্ধ্যায়।

৬১. মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তিমার্গ* (চট্টগ্রাম : ১৩৯৫ বাংলা), পৃ. ১১

*Dhaka University Institutional Repository*

৬২. পূর্বোক্ত

৬৩. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ৩৪

৬৪. মহিম চন্দ্র বড়ুয়া, পূর্বোক্ত।

৬৫. *ধর্মপদ*, পুষ্পবর্গ/ ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## উৎসব

মানবজাতি ঊষালগ্ন থেকে উৎসবের[১] সাথে পরিচিত ছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দুঃখের কালোমেঘ কেটে যখন সোনালী সূর্যের আভায় জীবনকে জাগিয়ে তোলে তখন মানুষের কাছে পৃথিবী বড় সুন্দর মনে হয়। প্রাত্যহিক দুঃখের পর সুখের নানন্দিক ছোঁয়া ব্যক্তি জীবনকে স্মরণীয় করে তোলে। এমন কিছু দিন আসে বছরের যেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে হাতে হাত ধরে অমিয় সুখ সাগরে অবগাহন করত পুত পবিত্র হয় ; সে-ই হচ্ছে উৎসবের দিন। সুতরাং উৎসব হচ্ছে আনন্দঘন অনুষ্ঠান ; যেখানে একাকীত্বের গ্লানি মুছে যৌথভাবে আনন্দ উপভোগ করা হয়। এ উৎসবের মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরকে কামনা করা হয়, কামনা করা হয় মানবতাবোধের। মানুষ উৎসব কখন করে ; এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ---

> মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষ ভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি সেদিন না-যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখ দুঃখের হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে-সেদিন তো আমরা জড়ের মতো, উদ্ভিদের মতো, সাধারণ জন্তুর মতো ; সেদিন আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না-সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের। সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট ; সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না, সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহবান করি না-সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের কষ্টের ধ্বনি শোনা যায় কিন্তু সংগীত শোনা যায় না। প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন ; একাকী কিন্তু উক্ত উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ ; সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হয়ে হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ[২]।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায় উৎসব ব্যতিরেকে চলে না। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী থেরবাদী বৌদ্ধভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসবে ধর্মীয় আবেদন থাকায় বৌদ্ধভিক্ষু এবং গৃহীদের মধ্যে এ উৎসবের গুরুত্ব অত্যধিক। এ জনগোষ্ঠীর এ ধর্মীয়উৎসব জাতীয় উৎসবেও প্রভাব ফেলে। এ উৎসব এবং উৎসবসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রতিটি গৃহে

Dhaka University Institutional Repository

উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নব নব উদ্দীপনায় প্রাণসঞ্চার লাভ করে শিশু-কিশোর থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত। এ জনগোষ্ঠীর উৎসবকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।

১. পূর্ণিমা উৎসব

ভাবগাম্ভীর্য ও ধর্মীয় স্বানুভূতির মাধ্যমে বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এ পূর্ণিমা উৎসবকে জাঁক-জমকপূর্ণভাবে পালন করে। এ সময় তারা অন্তর্নিবিষ্ট সুপ্তজ্ঞানে উপলব্ধি করে এ পূর্ণিমা উৎসবের মাহাত্ম্যতা। পূর্ণিমা উৎসবে প্রত্যক অঞ্চলের কুলবধূ-কুলনারী, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী এমন কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য সমীপে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণেরজন্য বিহারে গমন করে। পূর্ণিমা উৎসব সম্পর্কিত আলোচনা নীচে প্রদান করা হলো :

১.১. বুদ্ধ পূর্ণিমা[৩]

বুদ্ধ পূর্ণিমা সমগ্র পৃথিবীর বৌদ্ধদের নিকট অতি আনন্দের এবং তাৎপর্যময়। বৌদ্ধরা এ দিবসটিকে মহোৎসাহে পালন করে। তাই এটি পরিণত হয় বৌদ্ধদের মহোৎসবে। এ মহত্তম দিবসটি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়[৪]। এ তিথির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধজীবনের তিনটি অনন্য সাধারণ সংঘটিত ঘটনা। এ দিনে বুদ্ধ হিমালয়কন্যা নেপালের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে অবস্থিত কপিলাবাস্তুর[৫] লুম্বিনী[৬] নামক উদ্যানে তদানীন্তন (খ্রী. পূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) শাক্যরাজ্যের রাজা শুদ্ধোধনের ঔরসে রাণী মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একই দিনে এবং একই তিথিতে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর পর গয়ার বোধিদ্রুমমূলে পরম সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন[৭]। একই তিথিতে তিনি ৮০ (আশি) বৎসর বয়সে কুশীনারায়[৮] পরিনির্বাণ[৯] লাভ করেছিলেন[১০]। বুদ্ধের মহাজীবনের এ তিনটি মহৎঘটনা একই তিথিতে এবং একই পূর্ণিমাই সংঘটিত হয়েছিল বলেই বুদ্ধ পূর্ণিমা বিশ্বে বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে অভিহিত।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রতিটি গৃহে এ দিবসে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। শিশু-কিশোরদের মনে জাগ্রত হয় আমোদ-প্রমোদ। যারা পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে দূরদেশে চাকুরী করে তারাও এ দিবসে সবাইকে নিয়ে এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য বাড়ী আসে । এ উপলক্ষে নানারকম রং-বেরং এর কাগজ দিয়ে বৌদ্ধ বিহারকে সাজানো হয়। নবীন-প্রবীনের সম্মিলনে মুখরিত হয় বিহার প্রাঙ্গণ। এ সময় সবার পরিধানে থাকে নতুন কাপড়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মন্ত্রোচ্চারণে চর্তুদিকে শান্তির ললিতবাণী ধ্বনিত হয়। সকাল হলে চলে প্রতিটি গৃহে বুদ্ধপূজা সাজানোর পালা-পর্ব। এ সময় তারা গৃহের পূজাকর্ম সম্পাদন করে খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-চুষ্য ও আহারাদিসহ পূজোপকরণের থালা মাথায় নিয়ে হরেক রকম ফুল, সুগন্ধিদ্রব্য ও বাতি নিয়ে সবাই বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিহারে সমবেত হয়। এ সময় তারা বুদ্ধকে পূজা উৎসর্গকরত সমস্বরে সবাই পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়[১১]। পৃথিবীর শান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনা করে। প্রার্থনা শেষে ধর্মপ্রাণ নর-নারীরা বিহারের পাশে থাকা বোধিবৃক্ষের নীচে পানি দিয়ে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বন্দনা করে। প্রার্থনা সমাপনান্তে ছোটরা বড়দেরকে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে বড়রা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ প্রদান করে। সমবয়সীরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা বিনিময় করে। বিকালে আরম্ভ হয় ধর্মীয়সভা। প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়াও দায়ক-দায়িকারা[১২] ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে প্রায় প্রতিটি বিহারেই কমবেশী আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। সন্ধায় করা হয় প্রদীপ পূজা। ক্রমে আরম্ভ হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বুদ্ধকীর্তন। আবার কোনো কোনো এলাকায় এ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সরকারী ছুটির দিন। এ দিনটিকে আরো চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এ দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেলে বুদ্ধ জীবনকে অবলম্বন করে নাটক এবং গীতআলেখ্য সম্প্রচার করে। দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয় বুদ্ধ পূর্ণিমার বিশেষ নিবন্ধ। এ উপলক্ষে বিভিন্ন বৌদ্ধ সংগঠন এককভাবে কিংবা যৌথভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং শান্তি শোভযাত্রা করে। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এ দিবসটিকে আনন্দঘন পরিবেশে পালন করে। যার মাধ্যমে একদিকে এ জনগোষ্ঠীর সামাজিক মেলবন্ধন রচিত হয় অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জীবনধারা প্রস্ফুটিত হয়।

### ১.২. আষাঢ়ী পূর্ণিমা[১৩]

এ পূর্ণিমাও এ জনগোষ্ঠীর নিকট অতি পুণ্যময় ও গৌরবের। এ মহান তিথিতেও তিনটি পুত পবিত্রকর্ম বুদ্ধজীবনে সংঘটিত হয়েছিল। এ দিবসে তিনি মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ[১৪] গৃহাভিনিস্ক্রমণ[১৫] এবং বারানসীর মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন[১৬]। এখানে উল্লেখ থাকে যে, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা লগ্নেই এ আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়।

বুদ্ধের জীবনোতিহাসের মহৎতম ঘটনার বহিঃপ্রকাশ এ আষাঢ়ী পূর্ণিমা। উল্লিখিত ত্রিস্মৃতি বিজড়িত মহত্ত্ব সুমহান স্মৃতিগুলো অন্তরে চির জাগরুক করে রাখার জন্য অন্যান্য বৌদ্ধ দেশের ন্যায় বাংলাদেশের এ জনগোষ্ঠীরা প্রতি বছর এ পূর্ণিমা স্বগৌরবে অনুদ্ধচিত্তে পরম ভক্তিতে পালন করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নিকট পবিত্র ধর্মীয় উৎসব এটি। এ উপলক্ষে বিহারে বিপুল জনসমাগম ঘটে। সকাল বেলায় পঞ্চশীল গ্রহণ, বুদ্ধপূজা, পুষ্পপূজা, ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান, উপোসথ গ্রহণ, বিকালে ধর্মীয় আলোচনা সভা ; সন্ধ্যায় প্রদীপপূজা, পঞ্চশীল গ্রহণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনা ইত্যাদি কর্মসূচির গ্রহণের মাধ্যমে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়ে। এ আষাঢ়ী পুর্ণিমার দিন থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শুরু হয়। এদিন থেকেই তারা বিহারে শীল, সমাধি ভাবনায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে রাখে। এ সময় তারা সবাইকে ধর্মীয় চিন্তা- চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা সুস্থসমাজ সংসার বিনির্মানে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের আহবান জানায় ; যার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রবারণা পূর্ণিমায়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসী বৌদ্ধরা যেন এ পূর্ণিমাকে অতি জাঁকজমকতার সাথে উদ্‌যাপন করতে পারে এ জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর বৌদ্ধদের জন্য এদিন ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করে।

### ১.৩. ভাদ্র পূর্ণিমা[১৭]

বৌদ্ধদের নিকট এটা মধু পূর্ণিমা নামে অত্যধিক পরিচিত। বুদ্ধের নিজের জীবনেও এ পূর্ণিমার গুরুত্ব অপরিসীম। এ পূর্ণিমাকে অবলম্বন করে একটি উপাখ্যান লক্ষ্য করা যায়। উপাখ্যানটি নিম্নরূপ ; কৌশাম্বীর ঘোষিতরামে দু'জন শীলবান, প্রজ্ঞাবান প্রতিভাধর ভিক্ষুর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বিনয়বিধান নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তাঁরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সংঘও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধ মতবিরোধ মীমাংসা করে দিলেও তাঁরা পূনরায় আত্মকলহে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় বুদ্ধ এককবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পারিলেয্য বনে চলে যায়[১৮]। বুদ্ধ এ বনের ভদ্রশালবৃক্ষমূলে রক্ষিত বনসন্ডে বর্ষাবাস অধিষ্ঠান শুরু করেন। সেখানে এক হস্তীরাজ বুদ্ধের সেবায় নিরত ছিলেন। এ পূর্ণিমায় আরেকটি বিশেষত হলো একটি বানর আপনদল ত্যাগ করে বুদ্ধের সেবায় নিযুক্ত হওয়া।

সাধারণত পূর্ণিমার দিন মৌমাছিরা চাকের সব মধু খেয়ে শেষ করে। বানর ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে মধুসহ মৌচাক সংগ্রহ করে বুদ্ধ সমীপে দান করেছিলেন। বুদ্ধ সর্বজীবের প্রতি করুণা[১৯] প্রদর্শন করতেন। এজন্য অন্যান্য জীবের ন্যায় বানরও তার প্রতি মমত্ববোধ সম্পন্ন ছিল। তাই তার মধু দান। বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য দেখাতেই বানর বুদ্ধকে মধু দান করেছিল। তীর্যকপ্রাণী বানর বুদ্ধের মধু পান দেখে আনন্দে এদিক ওদিক লাফালাফি করতে করতে একসময় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বানরের সেবা ও ত্যাগের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে ভাদ্র পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। বানরের মধুদান এ পূর্ণিমার সাথে ওতোপোতভাবে জড়িত, তাই এ পূর্ণিমাকে মধু পূর্ণিমা বলা হয়। বানরের মধু দানকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং দান চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য এ দিবসে বুদ্ধ ও ভিক্ষু সমীপে এ জনগোষ্ঠী মধুদান করে[২০]। এ পূর্ণিমা তির্থিতে বুদ্ধ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র দোষগুলো সংশোধন করত ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির জন্য শিষ্যদেরকে আহবান করেছিলেন[২১]। মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

নশ্বরজীবনে বিবাদ-বিসম্বাদ অনৈক্য সুফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে না ; বরং এগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর, যা সত্যপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বুদ্ধ বলেছিলেন ; মূর্খেরা জানে না যে, তারা চিরকাল সংসারে থাকবে না যারা জানেন তাদের সব কলহের উপশম হয় [২২]।

অন্যান্য পূর্ণিমার মতো বুদ্ধপূজা, প্রদীপপূজা, সুগন্ধিদ্রব্য পূজা, ভিক্ষুসংঘকে আহার্যদান, পঞ্চশীল, অষ্টশীলগ্রহণ, ধর্মসভা, বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনার ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ পূর্ণিমা পালিত হয়। ত্যাগের মাহাত্ম্যকথন, একত্বভাব, সংহতি, সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্যর জন্য এ পূর্ণিমার রয়েছে বৌদ্ধদের কাছে আলাদা তাৎপর্য। প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার এ দিবসটিকে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করে।

১.৪. প্রবারণা পূর্ণিমা[২৩]

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক ধর্মীয়উৎসবের মধ্যে প্রবারণা অন্যতম। মুসলমানদের একমাস সিয়াম সাধনার পর যেমন আসে বহুলাঙ্খিত ঈদ, তেমনি তিনমাস ব্যাপী বর্ষাবাস পালনের[২৪] শেষের দিন প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। তাই এ পূর্ণিমা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে ভোর হতে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এ দিনটিকে পালন করা হয়।

প্রবারণা শব্দটি সংস্কৃতজাত, যার পালিরূপ পবারণা। এটি একটি অর্থব্যঞ্জক শব্দের নামও বটে। যেমন : আপত্তিদেশনা, আশার তৃপ্তি, ব্রত সমাপন, দোষত্রুটি স্বীকার, ধ্যান-সমাধি সমাপ্তি, শিক্ষা সমাপ্তি, অভিলাষ পূরণ, মিলনোৎসব, আত্ম-সংযম, আত্মসমালোচনা, আত্মোলব্ধি, আত্মশুদ্ধি, বরণ ও বারণ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে কুশলকর্মকে বরণ এবং অকুশলকর্মকে বর্জনই প্রবারণা। বৌদ্ধ বিনয় পরিভাষায় এ সম্পর্কে দেখা যায় ; দৃষ্ট শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি বিষয়ে প্রবারণার[২৫] প্রয়োগ দেখা যায়। Childers প্রবারণার অর্থ করেছেন ; Invitation, Prohibition, Name of certain festival[২৬]. এক বৌদ্ধ বিহারে একাধিক ভিক্ষু বর্ষাবাস পালন করে। তাদের কিছু না কিছু দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন ; একসাথে বসবাস করতে গেলে পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ হওয়াই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়। বর্ষাবাস পরিসমাপ্তির পর তোমরা একত্রিত হয়ে প্রবারণা করবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। একস্থানে বাস করার সময় পরস্পর পরস্পরকে অনুশাসন করলেই মঙ্গল হয়। বুদ্ধের শাসন পরিশুদ্ধ হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং সমগ্র ভিক্ষু সংঘের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়[২৭]। প্রবারণার প্রায়োগিক ব্যবহারিক দিক দু'টি। যেমন :

ক. হ্যাঁ বোধক এবং খ. না বোধক

১. হ্যাঁ বোধক : এর মাধ্যমে কুশলকর্মকে বরণ করা হয় ; যা দ্বারা নৈতিক চরিত্রের উন্মেষ সাধন হয়।

২. না বোধক : এর মাধ্যমে সমস্ত গর্হিতকাজ থেকে নিবৃত্ত থাকা যায়। অর্থাৎ অকুশলকর্ম বর্জন করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, সকলপ্রকার দোষত্রুটি অপরাধ অবনত শিরে অপকটে স্বীকার করে অন্যায় অসুন্দরকে বারণের দৃঢ় প্রত্যয়ে ন্যায় সুন্দরকে প্রকৃষ্টরূপে বরণের এক মঙ্গলময় প্রক্রিয়া এ পূর্ণিমা তিথিতে সম্পন্ন হয় বলেই এর নাম প্রবারণা। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর চিরাচরিত ধর্মীয় উৎসব এটি। এ দিনে ভিক্ষুসংঘের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পরবর্তী বর্ষাবাসান্তে বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুসংঘকে বললেন ; হে ভিক্ষুগণ! তোমরা দিকে দিকে বিচরণ করো, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবতা ও মানুষ্যের অর্থহিত সুখের জন্য। তোমরা এমন দেশনা করো যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ[২৮]। বুদ্ধের মহত্বতার বহিঃপ্রকাশ বিরাজমান এখানেই।

অন্যান্য পূর্ণিমার ন্যায় এ দিন বৌদ্ধ বিহারকে সাজানো হয়। অনেকে আবার বাড়ি-ঘরও সাজিয়ে থাকে। প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে জাতীয় পতাকা এবং ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকালে করা হয় বুদ্ধপূজা, ভিক্ষুসংঘ সমীপে পিণ্ডদান, পঞ্চশীল অষ্টশীল গ্রহণ করা হয় ও বিকালে করা হয় ধর্মীয় সভা। সন্ধায় প্রদীপপূজা, পঞ্চশীল গ্রহণ এবং বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনার মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। তবে এ দিবসের অন্যতম আকর্ষণ ফানুস উড়ানো। এ ফানুস[২৯] উড়ানো ধর্মবর্ণনিবিশেষে সর্বস্তরের মানুষ উপভোগ করে। প্রায় প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে প্রতিযোগিতা দিয়ে ফানুস উড়ানো হয়। এ সময় ঢাক-ঢোল, কাঁসা, মন্দিরা ইত্যাদি বাজিয়ে শিশু-কিশোর আনন্দ করে। আর বয়োবৃদ্ধরা ফানুস উত্তোলনের সময় সমস্বরে সাধু-সাধু-সাধু বলে। এ দিবসে প্রতিটিবিহারে বুদ্ধের চুলধাতুকে স্মরণ করার নিমিত্তে আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস ব্যাপী বিহার সংলগ্ন কোন গাছের শীর্ষে ধজাপতাকা ও আকাশ প্রদীপ উত্তোলন করা হয়।

বর্তমানে প্রবারণাকে প্রীতিসম্মিলন বলা হয়। কেননা এদিনে গৃহীদের মধ্যে কিশোর-যুবক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলির মাধ্যমে[৩০] প্রবারণার শুভেচ্ছা জানায়। এ দিনে সবাই নববস্ত্র পরিধান করে বৌদ্ধবিহারে যায়। বর্ষা শেষে শরতের স্নিগ্ধ আমেজ স্বতস্ফূর্ত ধারায় হাসি আনন্দ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর ভাবগাম্ভীর্যের ভেতর দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রবারণার পরদিন থেকে আরম্ভ হয় প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে আরেক উৎসব কঠিনচীবর দান।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫. মাঘী পূর্ণিমা

এ পূর্ণিমায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধের আয়ু সংস্কারসাধন বা মহাপরিনির্বাণ ঘোষণা। বুদ্ধ এ দিবসে ঘোষণা করলেন আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে আমি পরিনির্বাপিত হবো[৩১]। তিনি আরো বলেছিলেন ; সংস্কার মাত্রই অনিত্য। যা উৎপন্ন হচ্ছে তৎসমুদয় ব্যয়শীল। উৎপন্ন হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কার সমূহের উপশম অসংস্কৃত নির্বাণই পরম সুখ[৩২]। একসময় পাঁচশ ভিক্ষু বনে গিয়ে ধ্যান সাধনায়রত হয়েছিলেন। কিন্তু সফলতা অর্জন করতে না পেরে তাঁরা ফিরে আসে বুদ্ধের কাছে। অতঃপর বুদ্ধ তাঁদেরকে উপলক্ষ করে বলেছিলেন ; সকল সংস্কার সৃষ্ট পদার্থ, অনিত্য, দুঃখজনক এবং অনাত্ম। এ সত্য জ্ঞানের আলোকে যখন যিনি দেখতে পান তখন তিনি সর্বদুঃখে নির্বেদপ্রাপ্ত হন, এ-ই বিশুদ্ধিমাগ[৩৩]। নশ্বর জীবনের অনিত্যতা এবং ক্ষণস্থায়ীত্বতা, উপলব্ধি করেই তিনি আয়ুসংস্কার করেছিলেন। এ ঘোষণা একদিকে পরম আনন্দের আবার অন্যদিকে শোচ্য বিষয়।

এ জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোর, নর-নারীরা এদিনে বিহারে গিয়ে বুদ্ধপূজা প্রদান, পঞ্চশীল গ্রহণ, ভিক্ষুদেরকে আহার্য দান, বিকালে ধর্মসভা প্রদীপ ও সুগন্ধিদ্রব্য দিয়ে বুদ্ধকে পূজা, সন্ধ্যায় বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনার মাধ্যমে এ মাঘী পূর্ণিমা উৎসব পালন করে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ এর ঘোষণাকে মানসপটে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারে মাঘী পূর্ণিমার মেলার আয়োজন করে[৩৪]। বাংলাদেশ সরকার সকল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য এদিন ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করে।

২. বিহারভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বৌদ্ধসংস্কৃতির অন্যতম বাহন স্বরূপ এ বিহারভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান । বৌদ্ধসংস্কৃতির উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ সাধনে এ রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যধিক। থেরবাদী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এ অনুষ্ঠানগুলোকে ধর্মীয় প্রাণসঞ্চারক অনুষ্ঠান হিসেবে মনে করে। এটি মূলত ভিক্ষুদের জন্য হলেও এ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভিক্ষুসংঘ ও গৃহীসংঘ উভয়ই স্ব স্ব অবস্থানের মধ্য দিয়ে কায়িক-বাচনিক-মানসিক সংযতকরত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, লোভ-দ্বেষ, মোহ'র সংবরণ, উন্নত সমাজ বিনির্মাণ তথা তাত্ত্বিক চিন্তায় মগ্ন থাকে। বছরের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এ অনুষ্ঠান হয় না।

২.১. উপোসথ

বৌদ্ধ মাত্রই উপোসথ পালনীয়। উপোসথ কর্মদ্বারা গৃহীরা আহারে ও বিহারে সংযত হয়। দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন করে সততার মাধ্যমে। ভিক্ষুসংঘ এ দিনে বিনয়কর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করে। উপোসথ এর সমার্থক শব্দ উপবাস আর ব্রতপালনকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে 'A Dictionary of Pali Language' নামক গ্রন্থেও বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশব্দ দেখা যায়, যেমন : Fasting, abstience from sensual enjoyment; the monastic ceremony of reading the Patimokkha, the eight silas; ordiance, institution[৩৫]. এখানে উপোসথ অবশ্যই সম্পূর্ণ অর্থে অনাহার নয়। সংযমী[৩৬] হয়ে অবিনয়ী, গর্হিত, নিন্দাযোগ্য কর্ম সম্পাদান থেকে দূরে অবস্থান করত সংসারধর্ম পালন করাকে বোঝায়। উপোসথ শরীরকে সুস্থ রাখা ছাড়া মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উপোসথ পালনে মন ভিন্ন ভিন্ন অকুশল বিষয়ে রমিত হলে উপোসথ অর্থহীন হয়ে পড়ে। উপোসথ পালনের মাধ্যমে শুধু শরীর নয়, মনকে সংযত করা যায় ; তবে সে-ই উপোসথ হয় স্বার্থক[৩৭]। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, রাজা বিম্বিসারের অনুরোধেই বুদ্ধ উপোসথ এর প্রবর্তন করেন[৩৮]। এ উপোসথ দিবসের কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কে দেখা যায় ;

> On Upasatha day laymen dress in their best clothes and such them are religiously disposed abstain from trade and worldly amusement and take upon themselves the uposatha vows, that is to say, go to a Priest and make their witnes of their intentions to keep the eight silas during the day[৩৯].

এ দিবসের আরো একটি অন্যতম দিক হচ্ছে সতত সুন্দরজীবন লাভের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া[৪০]।

ধর্মীয়জীবন যাপন করতে গেলে উপোসথ অত্যাবশ্যক। তাছাড়া উপোসথের মানবিক দিকও আছে। জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস উপোসথকারীরা কারো অমঙ্গল অনিষ্ট কামনা করে না। কোনো প্রাণীকে পীড়া দিতে পারে না ; পীড়া দানের কারণও হতে পারে না। নিজে অনাচার-অত্যাচার করে না ; তার কারণও হয় না। কারো লাভ সৎকার ও প্রশংসাদিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয় না বরং তা ধন্যবাদ ও সাধুবাদের সাথে অনুমোদন করে। কোনো প্রকার মিথ্যা বিষয়ে পরিকল্পনা করে না।

উপোসথ অর্থ নিকটে অবস্থান করা[৪১]। এ নশ্বর জীবন মন দ্বারা পরিচালিত। জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব বুঝতে পেরে এ জনগোষ্ঠীর লোকজন নশ্বর জীবনকে ইহ-পারত্রিক উচ্চস্তরে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াসে প্রতি মাসের চারদিন[৪২] শ্রদ্ধার সাথে উপোসথ পালন করে। যেদিন উপোসথ গ্রহণ করা হয় ; সে দিবসের প্রতি মুহূর্তটা যেন ধর্ম চিন্তা-চেতনা ও সংযমতা অবলম্বনে ব্যয়িত হয় ; তৎপ্রতি দৃষ্টি, উৎসাহ ও স্মৃতি রাখা ; মান, অভিমানাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে বিনয়ী ও সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়[৪৩]। এ দিনে সবাই নিজেকে আত্মসংবরণ, আত্মসংযম করে এমনভাবে তোলে ধরে যেখানে গৃহে অবস্থান করেও ন্যায় পরায়ণতা, শ্রদ্ধাশীলতার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন

Dhaka University Institutional Repository

করে সকল সাংসারিককর্ম সম্পাদন করে লোভ-দ্বেষ-মোহমুক্তময় জীবন পরিপালন করা হয় এবং অধিষ্ঠান করে বিশুদ্ধজীবন পদ্ধতি।

উপোসথ দিবস গৃহী এবং সাংঘিক ব্যক্তিত্ব উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ দিন বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকজন উপোসথ পালন দ্বারা সারাদিন ত্রিরত্নের শরণ দ্বারা স্বীয় চিত্তকে পরিশোধন করে অন্তরের পাপমলরাশিকে বিদূরিত করে। তাছাড়া এদিন শীল, সমাধি চর্চায় তারা আত্মমনোনিবেশ করে। তাছাড়া ঐ দিবসে তারা ভিক্ষুর নিকট থেকে ধর্মীয়তত্ত্ব-তাত্ত্বিক কথা শ্রবণ করে ব্যক্তিজীবনে তা প্রতিপালন করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য----

> It is also observed as a ceremony for the performance of which people gather together in the place where religious discussions are held on certain day of the month for general well being of the comumunity[৪৪].

বৌদ্ধ সাহিত্যে এক বছরকে তিন ঋতুতে[৪৫] বিভাজন করে দেখানো হয়েছে। যেমন : হেমন্ত, বর্ষা এবং গ্রীষ্ম। এখানে প্রতিটি ঋতুই চারমাসে সমাপ্য। সুতরাং প্রতিমাসে চারটি উপোসথ হলে এক বছরে এ উপোসথের সংখ্যা দাঁড়ায় (৪X১২)=৪৮টি। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা বর্ষাবাসের[৪৬] সময় বেশীর ভাগ নর-নারী উপোসথ পালন করে। আবার অনেকে পরবর্তী মাসও[৪৭] উপোসথ[৪৮] পালন করে। একসময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করার সময় ধার্মিক নামক উপাসক পাঁচশত সঙ্গী উপাসক নিয়ে বুদ্ধের নিকট গিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করে তাঁরা একদিকে আসন গ্রহণ করলেন। এক প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধ তাঁদেরকে খুশী মানসে মার্সাধের চতুদর্শী, পঞ্চদর্শী এবং অষ্টমী দিনে উপোসথ পালন করা এবং পরিপূর্ণ অষ্টাঙ্গিক পটিহারিক পক্ষ রক্ষা করা অতঃপর ভোরে উপোসথ পালন শেষে অন্ন-পানাদির দ্বারা ভিক্ষুসংঘের প্রীতি উৎপন্ন করে যথাশক্তি দান প্রদানের কথা বলেছেন[৫০]। বুদ্ধের এর উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থায়ও সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় মানুষের নৈতিকশিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া এ মহান শিক্ষার সাথে পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় চেতনাবোধের সংশ্লিষ্টতাও দেখা যায়।

উপোসথ দিনে এ জনগোষ্ঠীর উপোসথ লাভেচ্ছুরা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে। স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনান্তে পরিস্কার কাপড় পরিধান পূর্বক নিজ গৃহে পূজা সম্পন্ন করে। তারপর একটি পাত্রে হরেক রকম পুস্পাদি, মোমবাতি, সুগন্ধি দ্রব্যাদি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য আহার্য ও অন্যান্য দানীয়সামগ্রী নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় বৌদ্ধবিহারে গিয়ে সমবেত হয়। সবার আগমন নিশ্চিত হলে বিহারে অবস্থানরত সবাই বিহারধ্যাক্ষ কর্তৃক অষ্টশীলে[৫১] প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা বার্ধক্যজনিত কারণে বিহারে গিয়ে উপোসথ পালন করতে পারে না, তারা বাড়ীতে বুদ্ধের আসনের নীচে বসে বুদ্ধবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে এ অষ্টশীল পালন করে। তারা যথাসম্ভব সকল প্রকার গৃহকর্ম থেকে দূরে অবস্থান করার চেষ্টা করে। তবে কোনো অবস্থায়তেই ঐ দিন কোনোরকম অকুশলকর্ম সম্পাদন করেন।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর উপোসথ সমাজজীবনেও এক গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। তারা এ উপোসথ পালনে আত্মশুদ্ধিতে শুদ্ধ ও সংযমী হয়ে আত্মবলীয়ানে মহীয়ান হয়। তাছাড়া এ উপোসথের মাধ্যমে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হয়। উপোসথের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো[৫২] তারা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে। যেমন :

ক. সংযমী হবার শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ ষড়রিপুকে দমন করে ;

খ. উপোসথ মানুষের মধ্যে সমবেদনা ও সহানুভূতির মনোভাব জাগিয়ে তোলে ;

গ. ধৈর্য ধারণ করার শক্তি যোগায়। যা মানুষকে সহিষ্ণুতা একাগ্রতাকে এবং ধৈর্য স্থাপনে সাহায্য করে ;

ঘ. চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। যা আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধিতাকে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া মানুষের সুকোমল চরিত্র গঠনে সহায়তা করে ;

ঙ. অসামাজিক, গহির্ত কাজ দূরীকরণে সাহায্য করে ;

চ. আদর্শ-সুশীল সমাজগঠন হয় ফলে সমাজে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে ;

ছ. সমাজ-সংসারে সাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে ;

ছ. ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করে ফলে একে অপরের প্রতি ভালবাসা করুনায় মনোভাব সম্প্রসারিত হয়।

তাছাড়া এ বিষয়ে এ জনগোষ্ঠীরা কতকগুলো বিশ্বাস পরিপালন করে। যেমন :[৫৩]

ক. প্রীতি উপোভোগ করা যায় ;

খ. সকল প্রকার ভয় উৎকণ্ঠ্যা বিদূরিত হয় ;

গ. মৌনতাভাব সৃষ্টি হয় ;

ঘ. লোভ-দ্বেষ-মোহ বৃদ্ধি পায় না বরং হ্রাস পায় ;

ঙ. মানসিক রোগ নিরাময় হয় ;

Dhaka University Institutional Repository

চ. শারীরিক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ;

ছ. চিত্তকে বিশুদ্ধ রাখা যায় ;

জ. নির্বাণ লাভ কামনা করা হয়।

উপোসথ যখন আরম্ভ হয় তখন বর্ষাকাল। এ সময় মানুষের তেমন কোনো কাজকর্ম থাকে না। এমতাবস্থায় গ্রামাঞ্চলের সিংহভাগ মানুষ বিহারে গিয়ে উপোসথ পালন করে। নিজে আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং নিজের শরণে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন পাড়ার লোকজন একই বিহারে উপোসথ গ্রহণ করার ফলে পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয়চেতনায় অপরাপর সবাইকে উদ্বুদ্ধকরণে সাহায্য করে।

## ২.২. বর্ষাবাস

আদিবাসী বৌদ্ধ এবং বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্ষাবাস শব্দটি ধ্যান-সমাধির কালসময় হিসেবে অভিহিত করা হয়। শব্দটি অতি অবশ্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে লক্ষণীয় যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা একস্থানে বর্ষাবাস (June –July --- Augst-September) যাপন করে থাকেন। বর্ষাকালে একস্থানে বসবাস করায় এর নাম বর্ষাবাস। আষাঢ়ী পূর্ণিমা সমাসন্ন হলে বিহারকমিটি বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে প্রথমে বুদ্ধ এবং বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুদেরকে সবিনয় বন্দনা করত কুশলাকুশলদি জিজ্ঞসা করে বর্ষাবাস যাপনের জন্য বিনীত আহবান করা হয়। বর্ষাবাস উদ্‌যাপনকারী কোন ভিক্ষু ঐ স্থান[৫৪] ছেড়ে কোথাও রাত্রি যাপন করতে পারবে না। তবে জরুরী প্রয়োজনে কোথাও যেতে হলে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর অনুমতি এবং দায়কের সম্মতি নিয়ে একসপ্তাহের জন্য বিহারের বাহিরে অবস্থান করা যায়[৫৫]।

বর্ষার তোড়ে ভিক্ষুদের বৃত্তি চালনা অসম্ভব হয়ে উঠত। তাই বৌদ্ধবিধানে প্রাচীনকাল থেকে বর্ষাবাস যাপন একটা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে[৫৬]। এ সময় তারা বিনয়কর্ম সম্পাদান ছাড়াও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় অভিরমিত থাকেন। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান নিম্নরূপ : ভিক্ষু তিষ্য বুদ্ধের কাছে ধ্যান সাধনার উপদেশ নিয়ে নির্জন বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে বর্ষাবাস আগতপ্রায় দেখে তিনি পর্বত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বর্ষাবাসের জন্য। ভিক্ষুজীবনের প্রথম থেকেই তিষ্য শীলে প্রতিষ্ঠিত ; সাধনায় একাগ্রছিলেন। তাই খুব দ্রুত তিনি অর্হত্বলাভ করলেন। তারপর বর্ষান্তে গুহা আর বন ছেড়ে তিনি শ্রাবস্ত ীতে ফিরে জেতবনে বুদ্ধ দর্শনে গেলেন। সেখানে অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁকে সাধনার বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন করলে তিনি তার সাফল্যের কথা, অহর্ত্ব লাভের কথা বললেন। কিন্তু ভিক্ষুরা এত অল্পসময়ে তাঁর অহর্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

লাভের কথায় বিশ্বাস করতে না পেরে বুদ্ধকে সব জানালেন। বুদ্ধ তাঁদের অবিশ্বাস দূর করার জন্য বললেন; যিনি গৃহী ও ভিক্ষু উভয়ের সাথে সংসর্গ[৫৭] হতে পৃথকভাবে থাকেন, যিনি আলয়বিহীন[৫৮] ও অল্প সন্তুষ্ট তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি[৫৯]। বুদ্ধের এহেন প্রতিটি উক্তিই ভিক্ষুদের নিকট প্রাণসঞ্চারক হিসেবে কাজ করে। উপর্যুক্ত বাক্যটি বর্ষাবাসকারী ভিক্ষুদেরকে ধ্যান-সমাধিতে মনোনিবেশ লাভে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে।

বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুরা বিশুদ্ধজীবনের ভীষণশত্রু ক্রোধ ও মানকে পরিত্যাগ করে। এগুলো পরিত্যাগের সাথে তাঁদের দশবিধ সংযোজন[৬০] এর মূল হেতু চিরতরে নির্মূল হয়। তখন ভিক্ষুরা মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় আনন্দ মনে বর্ষাবাস যাপন করে। এ সময় তারা শীল বিশুদ্ধিতায় পরিপূর্ণ হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সক্ষম হয়। বর্ষাবাস চলাকালীন সময়ে গৃহীসমাজে কতকগুলো বিশ্বাস পালন করা হয়। বিশ্বাসগুলো নিম্নরূপ----

১. এ সময় প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা ;

২. ডিম খাওয়া বন্ধ রাখা ;

৩. বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় না ;

৪. এ দিনে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস নিষিদ্ধ ;

৩. দান উৎসব

যা সম্প্রদানে দেওয়া হয় তা-ই দান। তবে যে দানে বস্তুসম্পত্তি, চিত্ত সম্পত্তি এবং প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকে সেই দানই মহাফল প্রদ। তবে ক্লেশযুক্ত হৃদয়ে দান দিলে সেই দান অন্তররাজিতে তেমন কোনো সৎ অনুভূতি উপলব্ধিতে প্রভাব ফেলে না। সৎপাত্রে দান দেওয়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্র'র উপর দাতার দান দেওয়ার ইচ্ছাও নির্ভর করে। তাই সৎপাত্রে দান দেওয়াই অতি উত্তম। এর মাধ্যমে দাতার মনের সকল প্রকার সংশয় উদ্বেগ বিদূরিত হয়।

দানের কোন কালাকাল নেই। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এমন কিছু দান থাকে যা বছরের বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত হয়। দানের ফল এবং গুরুত্ব এত বেশী যে ক্রমে তা দানোৎসবে পরিণত হয়ে মিলনমেলা তথা জ্ঞাতিসম্মেলনে রূপ নেয়। এ দানোৎসব সম্পর্কে একটি ধারণা নীচে প্রদান করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

৩.১. সংঘদান[৬১]

'সংঘ' ও 'দান' সমন্বয় সাধনে 'সংঘদান'। এখানে দু'টি অর্থবোধক শব্দের দ্বারা এ সংঘদান। 'সংঘ' অর্থ সুপ্রতিপন্ন ন্যায় প্রতিপন্ন সমীচিন প্রতিপন্ন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বোঝায়। আর 'দান' অর্থ দেয়া। তবে সে দান দেওয়া হবে বিশুদ্ধিচিত্ত দ্বারা সম্প্রদানে আসক্তহীনভাবে। সংঘদান বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সংঘদান করার কোন কালাকাল নেই। দান চেতনা উৎপন্ন হলেই এ মহতী ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। তবে পুদ্গলিক[৬২] দান অপেক্ষা সংঘদান মহাফল প্রদান করে বলে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস[৬৩]।

কোনো উপলক্ষে যদি দায়ক-দায়িকারা[৬৪] যৌথভাবে সংঘদান করতে ইচ্ছা পোষণ করে তা অবশ্যই ঐ বিহারে অনুষ্ঠিত হয়। কোনো ভিক্ষু-শ্রামণ সংঘদান করতে চাইলে তাও বিহারে হওয়া বাঞ্চনীয়। গৃহীরা যখন এ সংঘদানের আয়োজন করে তা অবশ্যই তাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন উপলক্ষে এ জনগোষ্ঠীরা সংঘদান করে। যেমন[৬৫]--

ক. সাধভক্ষণ উপলক্ষে ;

খ. সুষ্ঠ ও সুস্থভাবে সন্তান ভূমিষ্ট উপলক্ষে ;

গ. জন্মদিন পালন উপলক্ষে ;

ঘ. বিবাহ উপলক্ষে ;

ঙ. মৃত্যু[৬৬] উপলক্ষে ;

চ. প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়।

সংঘদানের ক্ষেত্রে চেতনাকে প্রাধন্যে দেয়া হয়। কারণ চেতনাই সমস্তকর্মের মূল উৎস। চেতনা ব্যতীত কোন মহানকার্য সম্পন্ন হয় না। বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মৃত্যব্যক্তির সদ্গতি কামনার্থে সংঘদান দেওয়া অত্যাবশক বলে মনে করে। এ সংঘদান সম্পন্নকারীরা মনে করেন এ সংঘদানের ফলে অর্জিত পূণ্যরাশির প্রভাবে তিনি জন্মান্তরে (মৃত ব্যক্তি) অর্থ বিত্তশালী, ধার্মিক, সুস্থ এবং সুন্দর দেহের অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

সংঘদানে ভাত, তরিতরকারি, মাছ-মাংস হরেকরকম ফলাদি দ্বারা ভিক্ষুসংঘ এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন আপ্যায়িত হয়। সংঘদান উপলক্ষে ভিক্ষুসংঘকে দান করা হয় তাঁদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। যেমন- ছাতা, বিছানার ছাদর, পাটি, হারিকেন, বালতি, মশারি, খাতা, কলম, বিভিন্ন ধর্মীয় বই, সুই-সুতা, জগ-গ্লাস,

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন রকম পুষ্টিকর খাবার, ঔষধ ইত্যাদি। তাছাড়া সংঘদানকারীর অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে অন্যান্য দানীয়বস্তু। সংঘদান শুরু করার আগে সকল খাদ্য-ভোজ্য এবং দানীয় সামগ্রী সংঘদানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় এনে সুন্দরভাবে ঢেকে রাখা হয়। সময়াসন্ন হলে ভিক্ষুরা সংঘদান স্থলে এসে পৌঁছে। তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করত উপস্থিত সুধিজনরা সামনে গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসে। অতঃপর ভিক্ষুসংঘ বয়োঃজ্যেষ্ঠ অনুসারে একজনের পর একজন করে মৌনতারসাথে সারিবদ্ধভাবে উপবেশন করে। তাঁদের আসন গ্রহণ করার পর আত্মীয়-স্বজন এবং নিমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই তাঁদেরকে স্ব স্ব আসনে বসে বন্দনা করে। সবার বসার স্থান নিশ্চিত হলে সংঘের আদেশপ্রাপ্ত একজন ভিক্ষু সংঘদান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সংঘদান পরিচালনা করে।

তারপর ভিক্ষুর আহবানে উপস্থিত সবাই একাগ্রচিত্তে ত্রিশরণসহ[৬৭] পঞ্চশীলে[৬৮] অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্বরে তিনবার নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স বলেন। অতঃপর ভিক্ষুর মুখে মুখে সংঘদানে অংশগ্রহণকারী সকল পূণ্যার্থীরা বলেন ; ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেমা, পূজেমা" অর্থ্যাৎ প্রয়োজনীয় উপকরণসহ এ ভিক্ষা ভিক্ষসংঘকে দান করছি। এ বাক্যটি তিনবার বলে সংঘদান সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাক্যটি শেষ হবার পরই পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গলার্থে ভিক্ষুসংঘ প্রমুখ সমস্বরে করণীয়মেত্ত সুত্ত[৬৯], রতন সুত্ত[৭০], মঙ্গল সুত্ত[৭১], মোর পরিত্তং[৭২], আটানাটিয় সুত্ত[৭৩] ইত্যাদি সুত্ত আবৃত্তি করে। সংঘদানে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম কর্ম সম্পাদানের মধ্যে একটি হলো পূণ্যদানুমোদন। যার মাধ্যমে কালগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত পূণ্য উৎসর্গ করা হয়। সংঘদানে সদ্ধর্মের উত্তরাধিকারী ভিক্ষুসংঘ এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন-অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গ্রামের ধর্মীয়-সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের সদস্য ও গ্রামের যুবকদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা সংঘদানের ফলকে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। যা অতিশয় মহত্বের এবং অক্ষয় বলে ধারণা করে। বুদ্ধ একসময় আনন্দকে বলেছিলেন, আনন্দ! আমি সংঘদানের ফল অনন্ত অপ্রমেয় বলে বর্ণনা করেছি কোনো কারণেই আমি সংঘ হতে পুদগলিক দানের ফল অধিক বলবো না[৭৪]। সংঘদান সম্পর্কিত অনেক লোকধারণা এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান। যেমন --

ক. সংঘদানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিরা সদ্‌গতি লাভে সক্ষম ;

খ. সংঘদানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিরা আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়াসনে চিরদিন মানসপটে জাগরুক থাকে ;

Dhaka University Institutional Repository

গ. বুদ্ধশাসনের মহোপকার-মহোন্নতি সাধিত হয় ;

ঘ. কুশলকর্ম সম্পাদন করা হয় ;

ঙ. পারলৌকিক মঙ্গলসাধনের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করা হয় ;

চ. পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং গৃহে অপদেবতার উপদ্রব থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, সংঘদান এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যধিক পরিচিতি। সময় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই কম বেশী সংঘদান করে। প্রতিটি সংঘদানকে আবার সামাজিক সম্মিলন হিসেবে দেখা হয়।

### ৩.২. অষ্টপরিস্কার দান[৭৫]

প্রব্রজিত ভিক্ষু এবং শ্রমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ উপকরণ দান করাকে অষ্ট পরিস্কার দান বলে। তবে এ দানেরও কোন কালাকাল নেই। বছরের যে কোনো সময় এ দান অনুষ্ঠান করা যায়। যে সমস্ত আটটি উপকরণ এ দানে ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ :[৭৬] ক. সংঘাটি খ. উত্তরাসঙ্গ গ. অর্ন্তবাস ঘ. ভিক্ষাপাত্র ঙ. ক্ষুর চ. সূঁচ-সুতা ছ. কটি বন্ধনী এবং জ. জল ছাকনী। এ দান গৃহে বা বিহারে হয়। এ সময় পাড়া প্রতিবেশী সবাই নিমন্ত্রিত হয়। এ উপলক্ষে বাড়ি বা বিহারের আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এ অষ্টপরিস্কার ভিক্ষু সংঘ প্রমুখের সামনে সজ্জিত করে ত্রিরত্ন বন্দনা[৭৭] সংঘ বন্দনা[৭৮] ও পঞ্চশীল গ্রহণ করে নিম্নোক্ত সূত্র তিনবার বলে ভিক্ষু সংঘকে দান করতে হয় ;

ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খু সংঘস্স দানং দেমা পূজেমা, অর্থাৎ আমি ভিক্ষু সংঘের প্রয়োজনীয় আটটি উপকরণসহ এ ভিক্ষা ভিক্ষুসংঘ সমীপে দান করছি।

এ সময় প্রভূত সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং রোগ-শোক-ব্যাধি নিরসন কল্পে ত্রিপিটক থেকে বুদ্ধের বিভিন্ন বাণী[৭৯] সমস্বরে অষ্টপরিস্কার লাভী ভিক্ষু পাঠ করে। তারপর একটি প্রার্থনা করতে হয় ; প্রার্থনাটি নিম্নরূপ[৮০]:

ইদং মে অট্ঠপরিক্খার দানানুভাবেন অনাগতে এহি ভিক্খু ভবায় পচ্চাযো হোতু,। (৩ বার) অর্থাৎ এ পূণ্য আমার ভবিষ্যত ঋদ্ধিময় ভিক্ষুত্ব লাভের হেতু হোক।

এ অষ্টপরিস্কার দান করলে আবার জন্মান্তরে সবাই ভিক্ষুত্ব লাভ করবেন তা কেউ বলতে পারে না। তথাপি তারা সৎচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ মহতী দানানুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এ বিষয়ে তাদের রয়েছে নানারকম লোকধারণা। যেমন[৮১]--

Dhaka University Institutional Repository

ক. ত্রিচীবর (সংঘটি, উত্তরাসঙ্গ, অর্ন্তবাস) দানে ইহলোক এবং পরলোক কাপড়ের অভাব হয় না;

খ. ভিক্ষুপাত্র দানে ধনবান-ধনবতী হওয়া যায় এবং জন্মে জন্মে ভোগশালী হওয়া যায় ;

গ. ক্ষুর দানে প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া যায় ;

ঘ. সুঁচ-সুতা দানে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান এবং প্রতুৎপন্নমতি হওয়া যায় ;

ঙ. কটি বন্ধনী দানে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় ;

চ. জল ছাকনী দান সুন্দর বিশুদ্ধিজীবন যাপন করা যায় ;

ছ. নির্বাণ স্রোতে অবগাহন করা যায়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, প্রাত্যাহিক জীবন-যাত্রায় মহৎ জীবনগঠনে অষ্টপরিস্কার দানের প্রভাব অপ্রমেয়। তাই অনন্ত একবার হলেও জীবনে অষ্টপরিস্কার দান করা উচিত।

### ৩.৪. কঠিনচীবর দান

পৃথিবীর অন্যান্য থেরবাদী বৌদ্ধ রাষ্ট্র'র ন্যায় বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীদের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান এ কঠিনচীবর দান। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ, সর্বোচ দানোৎসব এটি। সকলপ্রকার দানের মধ্যে এ চীবর দানের ফল অপরিমেয়, অতুল্য, অসামান্য সর্বোপরি সর্বোৎকষ্ট বলে তাদের বিশ্বাস। তাই তারা এ দানানুষ্ঠানকে দান শ্রেষ্ট, দানরাজা এবং দানোত্তম বিভিন্ন বিশেষণে বিশ্লেষিত করে।

'কঠিন' ও 'চীবর' এ দু শব্দের সমন্বয়সাধনে 'কঠিনচীবর'। এখানে 'কঠিন' অর্থ শক্ত দৃঢ়-অনমনীয়কে বোঝায়। আর 'চীবর' অর্থ একধরনের লালচে আসক্তিহীন গেরুয়া বসন, যা সচরাচর সবাই পরিধান করে না। বলা যায়, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে পরিধেয়বসন অনড় এবং দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করেন তাই কঠিনচীবর। মূলত 'কঠিন' শব্দটি চীবরের আদিতে চীবরের অর্থকে আরো গভীরভাবে অর্থবোধক করে তোলে। কারণ এ দান ভিক্ষু সংঘের বিনয় কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বুদ্ধ প্রবর্তিত বিনয়কর্ম সম্পৃক্ততার কারণেই চীবর কঠিন হয়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীদের বহুবিধ দানের মধ্যে কঠিনচীবর দান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষাকালে তিনমাস বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বর্ষাবাস পালন করেন। এ সময় ভিক্ষুরা ত্রিদ্বারে[৮২] অধিকতর সংযত হয়ে শীল, সমাধি ও ধ্যানের দ্বারা নিজেরা বিনয়কর্ম সম্পাদন করেন। তিনমাস অধ্যায়ন, অধ্যাপনা ও কর্মস্থানভাবনা দ্বারা বিশুদ্ধরূপে পরিচালিত হয়ে আশ্বিনী পূর্ণিমার পরমউৎকর্ষের সাথে প্রবারণা সম্পাদন করেন এবং বর্ষাবাসকালীন একটি

Dhaka University Institutional Repository

বিহারে তাঁরা ক্রমান্বয়ে রাত যাপন করে থাকেন। অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যতীত এ সময় বিহারের বাহিরে অবস্থান করেন না। যদিও বিশেষ কারণে বিহারের বাইরে অবস্থান আবশ্যক হলে অনুমতি[৮৩] নেন। বর্ষাবাস ভঙ্গ করা খুবই অন্যায়। যদি কেউ[৮৪] বর্ষাবাস ভঙ্গ করে তবে সে কঠিনচীবর লাভ করতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিহারে বর্ষাবাস এবং প্রবারণা[৮৫] অনুষ্ঠিত হয়নি সে বিহারে কঠিনচীবর দান করা যায় না। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এ এক মাসের মধ্যে কঠিনচীবর দান অতি অবশ্যই সমাপ্য। পরবর্তীতে কোনো অবস্থাতেই কঠিনচীবর দানানুষ্ঠান করা যায় না[৮৬]। তাছাড়া একবিহারে দু'বার কঠিনচীবর দান করা যায় না। যে বিহারে যে ভিক্ষু বর্ষাবাস পালন করেন সে-ই বিহারেই তিনি কঠিনচীবর লাভ করবেন অন্য বিহারে নয়। একস্থানে বর্ষাবাস এবং অন্যত্র চীবরগ্রহণ করাকে বুদ্ধ অনুচিৎ উল্লেখ করেছেন[৮৭]। উল্লেখ থাকে যে, বুদ্ধ প্রবর্তিত সংঘ[৮৮] সমীপে কঠিনচীবর দান দিতে হয় কিন্তু কোনো ব্যক্তিবিশেষকে[৮৯] নয়।

চীবর এমন একধরনের কাপড় যেখানে কোনপ্রকার লোভ, দ্বেষ, মোহ থাকে না ; থাকে না কোনপ্রকার চাকচক্যতা। বুদ্ধ চীবরের রং প্রসঙ্গে ৬টি প্রাকৃতিক রং এর কথা বলেছিলেন[৯০]। যেমন --

ক. বৃক্ষের বা গাছের শিকড়ের রং ;

খ. বৃক্ষের বা গাছের গুড়ির রং ;

গ. বৃক্ষের বা গাছের ছালে বা ত্বকের রং ;

ঘ. বৃক্ষের বা গাছের হরিদ্রাভ পাতার রং ;

ঙ. বৃক্ষের বা গাছের প্রস্ফুটিত লালচে ফুলের রং ;

চ. বৃক্ষের বা গাছের পাকা ফলের রং।

ভিক্ষুরা যে সমস্ত চীবর ব্যবহার করে সেগুলোকে কুশি-অর্দ্ধকুশি, মণ্ডল-অর্দ্ধমণ্ডল, বিবর্ত-অনুবির্বত, গীবেয্য-জঙ্ঘেয্য, বাহন্ত এভাবে চীবরের ক্ষেত্রকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিভাগকে ছোটবড় দু'ভাগে বিভাজন করে চীবরকে সর্বমোট দশভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাজিত স্থানে আলাদা কাপড়দ্বারা ভূমির আইলের[৯১] মতো পাড় দিতে হয়। বুদ্ধ নীল ও পীতদিবর্ণ[৯২] কেশ কম্বল[৯৩], বাল কম্বল[৯৪], অর্কনাল[৯৫] এবং পোথক কাপড়[৯৬] দ্বারা প্রস্তুত চীবর নিষেধ করেছিলেন।

নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে বা প্রণালীতে[৯৭] চীবরদান দান করা হয় না। বিভিন্ন প্রণালীতে চীবরদান সম্পাদিত হয়। প্রণালীগুলো নিম্নরূপ ;

Dhaka University Institutional Repository

ক. যেদিন কঠিনচীবর দান করা হয় সেদিনের অরুনোদয় হতে তৎপর দিবসের অরুনোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুতাকাটা হতে আরম্ভ করে, কাপড় বুনা সেলাই করা ইত্যাদি চীবর প্রস্তুতের যাবতীয় কার্য সম্পাদনান্তর কাঁঠাল গাছের রং দ্বারা উপযুক্তরূপে রঞ্জিত করে দানকার্য সম্পাদান করতে হয়। এ প্রণালীতে চীবরদান করলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পূণ্য বেশী সঞ্চিত হয়।

খ. প্রমাণমত শ্বেতবস্ত্র চীবর সেলাই ও রং করে দান দেওয়া যায়। এতে প্রথমোক্ত চীবর প্রস্তুতের পরিশ্রম হতে স্বল্প পরিশ্রম বিধায় কায়িকপুণ্য কম হয়।

গ. পূর্বের সেলাই করা চীবর দিয়েও কঠিনচীবর দান দেওয়া যায়। তবে চীবর তৈরীজনিত কায়িকশ্রম হয় না তদ্বেতু কায়িকাদি ত্রিদ্বারে[৯৮] পূণ্য লাভ করা যায় না।

ঘ. সেলাই না করেও শ্বেতবস্ত্র কঠিনচীবরের উদ্দেশ্যে দান করা যায়। পর দিবসের অরুনোদয়ের পূর্বেই শ্বেতবস্ত্রটিকে কঠিনে পরিণত করে নিতে হয় এখানেও ত্রিবিধ দ্বারে পুণ্য সঞ্চয় আশা করা যায় না।

উল্লিখিত প্রণালীগুলোর যেকোনো একটি প্রণালীর মাধ্যমে বৌদ্ধমাত্রেই কঠিনচীবর দান করে। বাংলাদেশে কখন থেকে কঠিনচীবর দান শুরু হয়েছে তা সঠিক সন তারিখ নির্ণয় করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবে এখানে সবিশেষ উল্লেখ থাকে যে, বিনয়াচার্য বংশদ্বীপ মহাস্থবির (১৮৮০-১৯৯০) ১৯১৫ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কঠিন চীবর দানোৎসব করেন। তিনি শ্রীলংকা থেকে দেশে ফিরে এসে ১৯১৫ সালে ষষ্ঠ বর্ষাবাস[৯৯] গ্রহণ করেন বাকখালী বোধিসত্ত্ব বিহারে[১০০]। সুতরাং ধারণা করা যায়, তাঁর প্রচেষ্টায় এ দেশে প্রথম কঠিনচীবর দানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটা সর্ববৃহৎ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বর্তমানে এটি সামাজিক সম্মিলনে রূপ নিয়েছে। প্রাকপ্রস্তুতির মধ্য দিয়েই এ কঠিনচীবর দান শুরু হয়। এ দিনে বিহারে পুরোদিবসের অনুষ্ঠানমালা থাকে। যেমন ; সকালে ধর্মীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শীল পালন করা, ভিক্ষুদের আহার্য দান করা। দুপুরে এ উপলক্ষে সংঘদান করা হয়। কোনো কোনো সময় এ সংঘদান প্রয়াত কোনোভিক্ষুকে উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বিভিন্ন থানা বা গ্রামের পণ্ডিত ভিক্ষুরা এ সময় বিহারকমিটি দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে দুপুরে[১০১] সংঘদান এবং বিকালে কঠিনচীবর দান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সংঘদানের আগে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় সমবেতভাবে পূজা-অর্চণা এবং বিশ্বশান্তির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর পুষ্টিকর খাদ্যভোজ্য এবং ফলমূলাদি দ্বারা তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এ কঠিনচীবর দান উপলক্ষে আয়োজিত সংঘদানে অনেক দূর-দূরান্তের সুধীজন অংশগ্রহণ করে। ভিক্ষুসংঘের পিণ্ডদান গ্রহণ পর্ব শেষ হলে বিহার কমিটি তাদের অতি উত্তমরূপে অতিথি বাৎসলতার সাথে ভোজনে করিয়ে থাকে।

বিকাল দু'টায় শুরু হয় মূল কঠিনচীবর দানোৎসব। বিভিন্ন গ্রাম থেকে কুলবধূরা মাথায় ধর্মপূজা[১০২] নিয়ে বিহারের নির্ধারিত ধর্মসভা স্থলে এসে পৌঁছায়। কীর্তনীয়া ও তার বাদকদল এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে সভাস্থলে নিয়ে আসে। এ দানোৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রতিটি গৃহে আত্মীয়-স্বজনের সমাবেশ হয়। যথাসময় সবাই বিহারে উপস্থিত হয়। সকলের আগমন প্রায় নিশ্চিত হলে বিহার কমিটি মনোনীত একজন সুভাষী কঠিনচীবর দানে মনোযোগী হবার জন্য ঘোষণা দেয়। অতঃপর তিনি সমবেত ভিক্ষু কুলগৌরব প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে অবনত চিত্তে তাদের স্ব স্ব আসনগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানায়[১০৩]। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে কঠিনচীবর দানোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভা নীরবতার সাথে উপস্থিত হন। এ সময় উপস্থিত সবাই নিজ নিজ আসনে দাঁড়িয়ে সাধুবাদ জানিয়ে তাদেরকে বরণ করে নেয়। এ সময় উপস্থিত সকল ধর্মানুরাগী শান্ত এবং ঋজু হয়ে ধৈর্য্য এবং একাগ্রতার সাথে অবস্থান করে। তারপর উদ্বোধনী ধর্মীয়সংগীত[১০৪] এবং ত্রিপিটক[১০৫] পাঠের মাধ্যমে মহতী দানোৎসবের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই বিহার কমিটির সম্পাদক এবং বিহারাধ্যক্ষ[১০৬] তাদের স্ব-স্ব ভাষণ প্রদান করেন। তারপর শুরুতেই সমবেত ধর্মপ্রাণ নর-নারীরা ত্রিশরণ[১০৭] ও পঞ্চশীলে[১০৮] প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্তের বিশুদ্ধিতা লাভ করে।

সকল দান অপেক্ষা ধর্মদান উত্তম। আর এ ধর্মদান করার প্রকৃষ্ট সময় কঠিনচীবর দান। প্রজ্ঞাবান, ধর্মধর পণ্ডিত, অধ্যাপক, সমাজসেবক এ মহতী ধর্মালোচনায় ও অংশগ্রহণ করে। ধর্মানুগত এবং ধর্মপরায়ণ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিষ্ঠতার সাথে ধর্মশ্রবণ করে নিজেদের জ্ঞানের স্বরূপকে সুপ্রকটিত করে। তারপর শুরু হয় চীবরপরিক্রমা। এ চীবরপরিক্রমা শেষ হলে চীবর প্রদানকারী নর-নারীরা নিজ নিজ চীবর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় ধর্মসভার পূজনীর সংঘপ্রধান নিম্নলিখিত বুদ্ধবাক্যটি বলেন ; নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদস্স[১০৯]। উল্লেখিত বাক্যটি শেষ হলে আবারও নিম্নোক্ত[১১০] বাক্যটি ছন্দবদ্ধাকারে ভাষণ করে থাকেন ;

ইমং কঠিনং চীবরং ভিকখুসংঘস্স দেমা, কঠিনং অথরিতু। অর্থাৎ আমরা ভিক্ষুসংঘকে এ কাপড় কঠিন করার জন্য দান করছি।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে দায়ক দায়িকারা কঠিনচীবর দান করে আর ভিক্ষুসংঘ প্রমুখ এ চীবর লাভ করে। তৎপর সভাপতি তার সমাপনী ভাষণ দিয়ে কঠিনচীবর দানোৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তারপর কঠিনচীবর দান দেওয়ার পর উপস্থিত সবাই চলে গেলে ভিক্ষুসংঘ চীবরকে বুদ্ধের রুমে নিয়ে গিয়ে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চীবর দেয়া হবে, সে-ই ভিক্ষুর নামোল্লেখ করে শুদ্ধরূপে কর্মবাক্য[১১১] পাঠ করে থাকেন। কঠিনচীবর লাভ করা সর্ম্পকে বুদ্ধ বলেন ; কঠিনচীবর লাভকারী ভিক্ষু পঞ্চবিধ পাপ বিদূরিত করে এবং পঞ্চবিধ পুণ্যফল ভোগ করে[১১২]।

তৎকালীন সময়ে কখন এ চীবর দানের প্রচলন তা সঠিক ভাবে বলা দুঃসাধ্য। তবে ধারণা করা হয় ; জীবক[১১৩] এবং বিশাখা[১১৪] বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে এ চীবরদানের অধিকার এবং সুযোগ লাভ করেছিলেন[১১৫]। বুদ্ধ পাংশুকূলীয়[১১৬] চীবর এবং গৃহীপতি দ্বারা প্রদত্ত চীবরের ব্যবহারকে সম্মতি দিয়েছিলেন[১১৭]।

দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারত-বাংলা উপমহাদেশে বিভিন্ন কারণে ধর্মদর্শন কৃষ্টি সংস্কৃতি বৌদ্ধসভ্যতা লুপ্ত প্রায়। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে ম্রিয়মান বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ দীপশিখা আবার উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্মের আলোকচ্ছটা ক্রমান্বয়ে বিকশিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ কঠিনচীবর দানোৎসব পূনশ্চ চালু হয়। তবে এর আগে এ কঠিনচীবর দানোৎসব হতো কিনা তার কোন অনুসমর্থন পাওয়া যায় না।

একই দিনে সুতা কাটা থেকে কাপড় তৈরী করে রং করে অতঃপর সেলাই করে কঠিনচীবর দান করার প্রথা এ জনগোষ্ঠীতে নেই। বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার রাজবন বিহারে আদিবাসী বৌদ্ধদের দ্বারা এভাবে কাপড় তৈরী করে চীবরদান করার প্রথা আজো প্রচলিত। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা কাপড় বুননে তেমন সুদক্ষ নয়। এখন অনেক বৌদ্ধ বিহারে আদিবাসী বৌদ্ধদের দ্বারা একই দিনে কাপড় তৈরী করে ভিক্ষু সমীপে দান করা হয়। তবে তৈরী চীবর দান করলে কঠিনচীবরের কঠিনত্বের হানি হবার সমূহ সম্ভাবনা নেই। বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী ভিক্ষুসংঘকে কঠিনচীবর দান করা প্রসঙ্গে এ জনগোষ্ঠীর আছে নানারকম লোকধারণা[১১৮]। যেমন ----

ক. দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ;

খ. সুখে দিনাতিপাত করা যায় ;

গ. জন্মান্তরে উচুকূলে জন্ম লাভ করা যায় ;

ঘ. কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ যোগায় করে ;

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. চিত্ত বিশুদ্ধি হয় ;

চ. নারী-পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে ;

ছ. কাপড়ের অভাব থাকে না ;

জ. নির্বাণ স্রোতে অবগাহন করা যায় ;

ঝ. ইহকালিক এবং পরকালিক সুখ ভোগ করা যায়।

কঠিনচীবর দানের কঠিন শব্দটি একটি লৌকিক অর্থে দেখানো গেলেও তার একটি বিশেষ দিক আছে। তা হলো অন্যান্য দান বছরের যে কোন সময় করা গেলেও একটি সুনির্দিষ্ট সময় ব্যতিরেকে কোনো অবস্থাতেই কঠিনচীবর দানোৎসব পালন করা যায় না। সুতরাং কঠিনচীবর দান কথাটির প্রায়োগিক ব্যবহারের আদিতে কঠিন শব্দটির প্রয়োগের বিশেষত্ব আছে। এ কারণেই এর গুরুত্ব বিস্তৃত এবং ব্যাপক।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয়-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসবের মধ্যে এ দানের আবেদন সবচেয়ে বেশী। এ সময় বৌদ্ধ জনপদে অভূতপূর্ব আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহমান থাকে। যে বিহারে কঠিনচীবর দানোৎসব অনুষ্ঠিত হবে সে বিহারকে ঘিরে চলে কঠিনচীবরের প্রাকপ্রস্তুতি পর্ব। আত্মীয়-স্বজনদের আগমনে নিস্তব্দ বৌদ্ধপল্লী মুখরিত হয়ে ওঠে। এ সময় কোনো কোনো বিহারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বুদ্ধকীর্তনের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে এ উৎসবটি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে গণসংযোগ ও গণসচেতনা সৃষ্টি করার অন্যতম বাহনে রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সংহতি, সম্প্রীতির মিলনোৎসবের নাম কঠিনচীবর দান।

### ৩.৪.১. কল্পতরু

কল্পনায় নির্মিত তরুই 'কল্পতরু'। কঠিনচীবর দানোৎসব উপলক্ষে এ কল্পতরু নির্মাণ করা হয়। এ সময় অনেকে ছোট ছোট গাছকে রং বেরং কাপড় দ্বারা সজ্জিত করে কল্পবৃক্ষ তৈরী করে। অনেকেই শৈল্পিকভাবে বাঁশ ও বেত দিয়ে শাখা-প্রশাখা বানিয়ে তাতে রং বেরং কাগজ লাগিয়ে সুরম্য করে তোলে কল্পতরুকে। তাতে ইচ্ছানুযায়ী ভিক্ষু সংঘের ব্যবহার্য দ্রব্য, বিভিন্ন টাকার নোট টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস ; এ শাখা-প্রশাখা হলো মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ক্রমরূপান্তরের বা পরিবর্তনের স্বরূপ। কল্পতরু নির্মাণ উপকরণ মূখ্য নয় এবং শিল্প শৈলীও প্রধান বিবেচ্য নয়। মূলবিষয় হলো বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ লাভের জন্য ত্রিধারায় দশ পারমীর[১১৯] যে ক্রমাগত সাধন করতে হয়, বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত কল্পতরুকে আলম্বন[১২০] এর মাধ্যমে সেই মুক্তি চৈতন্যের জাগরণ ঘটানো[১২১]। কল্পতরু হচ্ছে একটি ধর্মীয় প্রতীক ; একটি কল্পিত

Dhaka University Institutional Repository

গাছ। যার মাধ্যমে সৎ চেতনার উন্মেষ ঘটানো হয় এবং জীবনচক্র প্রবাহকে কর্মচক্রের হেতু দ্বারা উপলব্ধি করা হয়। কল্পতরুকে সম্যক দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করত নির্বাণ পথে ক্রমে অগ্রসর করাই হলো কল্পতরু বৃক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য।

'কল্প' ও 'তরু' এ দুই অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়সাধনে কল্পতরু। এখানে 'কল্প' মানে সময়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ[১২২]। যোজন[১২৩] বিস্তার যোজন দীর্ঘ শ্বেত সরিষারাশি হতে শত বৎসরান্তে এক একটি সরিষা নিক্ষেপ করলে যত বৎসরে সরিষারাশি নিঃশেষ হবে তত বৎসর এক মহাকল্পের চর্তুথাংশ মাত্র[১২৪]। 'তরু' মানে গাছ বা বৃক্ষকে বোঝায়, কিন্তু এখানে 'তরু' বলতে কল্পনায় অঙ্কিত সুসজ্জিত বৃক্ষকে বোঝায়। যে বৃক্ষ থেকে কল্পনানুযায়ী দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে কল্পতরু বলে। এ প্রাপ্তি উপলক্ষে দাতারা কল্পবৃক্ষে বিভিন্ন প্রকার দানীয়বস্তু দান করে এবং দানীয় সামগ্রীগুলো লাভ করে বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। এ কল্পতরুকে আরো বিভিন্ন উপনামে দেখা যায়। যেমন ----

ক. 'Seekers Glossary : Buddhism' নামক গ্রন্থে[১২৫] এ সম্পর্কে দেখা যায় ; Kalpa is an in conceivable long period time.

খ. 'Dictionary of Pali Language' নামক গ্রন্থে[১২৬] এ বিষয়ে উল্লেখ আছে ; A Celestial tree yielding all wishes, it grows in heaven.

গ. 'Pali English Dictionary'[১২৭] নামক দেখা যায়, A wishing tree, magic tree, fullfilling all wishes।

কল্প দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়কে বোঝায়। কল্প বৌদ্ধধর্মের সাথে খুবই ওতোপ্রেতভাবে জড়িত। কেননা বুদ্ধ আর্বিভাবের সঙ্গে কল্পের নামকরণ দৃষ্টনীয়। সে নামগুলোর হলো ক. বর কল্প, খ. সাবমণ্ডল কল্প, গ. ভদ্রকল্প ইত্যাদি। পালি সাহিত্যের আলোকে এখন ভদ্রকল্প চলছে। এ কল্পেই চারজন বুদ্ধের[১২৮] আর্বিভাব হয়েছে। আর্যমিত্র বুদ্ধ'র আর্বিভাব এ কল্পে হবে[১২৯]। অন্যান্য বুদ্ধ[১৩০] এ কল্পে আর্বিভূত হন।

এ কল্পতরুকে নিয়ে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকধারণাও প্রচলিত আছে; যেমন-

ক. ইহলোক এবং পরলোকে কোনপ্রকার অভাব অনুভব করতে হয় না ;

খ. টাকা পয়সার অভাব উপলব্ধি হয় না ;

গ. দুর্গতি ভোগ করতে হয় না ;

ঘ. নির্বাণ লাভে উৎসাহ প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর কাছে কল্পতরু কল্পনার রচিত মনোরম সুদশ্যময় কাঠামো সম্পন্ন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষস্বরূপ। তাদের কাছে কল্পতরু চিত্ত প্রধান একটি পূজা। চিত্তের একনিবিষ্ঠতার সাথে ধর্মাচরণ সম্পর্কযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় কল্পতরু পূজার প্রচলন। অসংখ্য জন্ম জন্মান্তরের কুশলকর্ম সম্পাদনে সুকীর্তি অর্জনের জন্য কল্পতরুকে চিত্তে সর্বাগ্রে তারা স্থান দেয়। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস, কল্পতরু চক্রবালের নিয়ত আবর্তনশীল বিষয় বা বস্তুর গতিধারায় উচ্চ দিকে অগ্রসর হবার চিত্তের এক সুদৃঢ় এবং নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ; যা দ্বারা জন্মান্তরে সুখী সমৃদ্ধময় জীবন কামনা করে।

### ৪. অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অন্যান্য ধর্মীয়উৎসব বলতে সীবলী পূজা, পরিত্তা পাঠ ও বিদর্শন ধ্যানকে বোঝায়। এসমস্ত উৎসবাদি এ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে। এ জনগোষ্ঠীর সবার স্বতঃস্ফর্ত সাহায্য-সহযোগিতায় এ ধর্মীয় উৎসবগুলো সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়।

### ৪.১. সীবলী পূজা

সীবলী পূজা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল পরিচিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। প্রতিটি গৃহেই বুদ্ধের পাশে আসনে সীবলী'র ছবি দেখা যায়। যারা ব্যবসায়িক তারাও দোকানের একপাশে একটা সুসজ্জিত আসন করে সীবলী মহাথের বাঁধাইকৃত ছবি রাখে। অলংকারিক কিংবা লোক দেখানো হিসেবে নয় তারা প্রতিদিন এ সীবলীকে বুদ্ধ পূজার পাশাপাশি পূজা সময় পুজা করার সময় এবং বন্দনার সময় বন্দনা করে।

লিচ্ছবীর রাজপুত্র মহালিকুমারের ঔরসে এবং কোলীয় রাজকন্যা সুপ্রবাসার গর্ভে এ পুণ্যবান মহাপুরুষের জন্ম। তিনি সাতবছর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বেই তিনি কেশচ্ছেদনের সময় নিদারুণ গর্ভকালীন অসহনীয় কষ্টের কথা স্মরণ করে অর্হৎফল লাভ করেছিলেন[১৩২]। মহালাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি[১৩৩]। বুদ্ধের শিষ্যরা ছিলেন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ। বর্তমানে সীবলীর ছবি চিত্রায়নের মাধ্যমেও সীবলী পূজা করা হয়। অনেকে এ সীবলীপূজা করে আত্মোন্নতিতে আবার অনেকে করে মনোবাসনা পূরণার্থে। চিত্রায়নের মাধ্যমে কখন থেকে এ সীবলী পূজা এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলন হয়ে আসছে তা অবিদিত। এক সাক্ষাৎকারে জানা যায় ; প্রথম চিত্রায়নের মাধ্যমে সীবলী পূজার প্রচলন করে রাঙ্গুনীয়া নিবাসী প্রয়াত যামিনী কুমার বড়ুয়া (মৃত্যু : ১৯৯৫)। ৪৫/৫০ বছর পূর্বে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহান সীবলী পূজার প্রচলন করে[১৩৪]। সুতরাং ধারণা করা হয় ১৯৫০ কিংবা ১৯৫৫ পূর্বে সীবলীর ছবি চিত্রায়নের মাধ্যমে পূজার প্রচলন ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধবিহারে, ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে এবং একক পৃষ্টপোষকতায় এ সীবলী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সীবলী পূজা দিবসের পূর্বাহ্নে অথবা অপরাহ্নে হয়। পূর্বাহ্নে হওয়াই অধিকতর সমীচিন। অপরাহ্নে করলে পূজোপকরণ পঞ্চভৈষজ, অষ্টপানীয়, ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি হওয়াই উচিত[১৩৫]। সীবলী পূজার সঙ্গে পৃথকভাবে বুদ্ধপূজাও আবশ্যক। পূজার জন্য বেদী সাজিয়ে বুদ্ধ এবং সীবলীর ছবি উপলক্ষ করে বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা পূজা করা বাঞ্চনীয়। পূজার কাজ শেষ হলে সীবলী ব্রতকথা পাঠ করা বা শ্রবণ করা, তৎপর পঞ্চশীল গ্রহণান্তে সীবলী পরিত্রাণ শ্রবণ অত্যাবশ্যক বলে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস[১৩৬]। অতঃপর নিম্নলিখিতভাবে সীবলীকে পূজা করা হয়। যেমন[১৩৭]----

ইতিপি সো অরহং লাভীনং অগ্গং সীবলী নাম মহাথেরং ইমেহি বিবিধ পূজা সম্ভারোহি পূজোমি ইমিনা পূজা সক্কারানুভাবেন যাব নিব্বাণ পত্তিযা তাব জাতি জাতিযং সুখ সম্পত্তি সমঙ্গিভূতেন সংসরিত্বা নিববানং পাপুণিতং পথনং করোম। অর্থাৎ আমি অর্হৎ অগ্রলাভী সেই সীবলী মহাস্থরিরকে নানাবিধ পূজা উপকরণের দ্বারা পূজা করছি। এ পূজা সৎকারের প্রভাবে যতদিন নির্বাণ উপলব্ধি না করি ততদিন আমি যেন জন্মে-জন্মে, সুখ-সম্পত্তি লাভ করে পরিশেষে নির্বাণ উপলব্ধি করতে পারি- এ প্রার্থনা করছি।

এ সীবলী পূজায় এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস নিম্নরূপ[১৩৮]--

ক. এ পূজায় অভাব বিদূরিত হয় ;

খ. ধনসম্পত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ;

গ. বিবিধ প্রকার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ;

ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান হয় না ;

ঙ. অর্হৎ ফল লাভ করা সম্ভব।

বৌদ্ধ বিহারে, ধর্মীয় সংগঠন কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তির পৃষ্টপোষকতার এ সীবলীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সবাই এ সীবলী পূজায় গিয়ে সীবলীকে অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ পূজা একসময় রূপ নেয় স্বজন সমাবেশে। মূলত বিভিন্নরকম মিথ্যাদৃষ্টি দূর করার নির্মিত্তে সীবলী পূজার প্রচলন হয় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তাছাড়া সীবলী পূজার মাধ্যমে বুদ্ধের মহিমাও প্রকাশ হয়।

### ৪.২. পরিত্তা

বৌদ্ধ মাত্রেই পরিত্তা নামের সাথে বিযেশভাবে পরিচিত। এটি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচরণীয় কর্মের অন্যতম অংশ। তারা পরিত্তাকে জানে-চিনে ফারিক হিসেবে। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবার

Dhaka University Institutional Repository

নিকট ফারিক যেভাবে পরিচিত পরিত্তা সেভাবে নয়। এখানে পরিত্তা শব্দটি সংস্কৃত পরি+ত্রা থেকে উদ্ভূত ; যার অর্থ রক্ষাপন বা ত্রাণপন[১৩৯]। আর এখানে ফারিক শব্দটি বার্মিজ এবং গুণবাচক অর্থবোধক বিশেষণ ; যার অর্থ করলে দাঁড়ায় বুদ্ধ সম্বন্ধীয়। 'ফরা' শব্দ থেকে 'ফারিক' শব্দটির উৎপত্তি। 'ফরা' প্রসঙ্গে দেখা যায়, একসময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী একজন আরেক জনকে ডাকলে 'ফরা' বলে তিনি তার আহবানে সাড়া দিত। আর ব্যাথ্যা পেলে, অঘটন ঘটলে, বিপদ আপদে রাত্রে ঘুমাতে যাবার সময়, নিশী রাতে অশুভ পাখি রব শুনলে ফরা-তরা সংঘ বলে আত্মপ্রীতি লাভ করতো[১৪০]।

সাধারণত 'সূত্র' বলতে আমরা সম্পর্ক বা সম্বন্ধ বুঝে থাকি। গাণিতিক ভাষায় 'সূত্র' বলতে অংক শেখার বা জানার এক বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশলকে বোঝায়। তাছাড়া শাস্ত্রের ভাষায় সূত্র হচ্ছে একধরনের উৎস যেখানে প্রশ্নের সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ জনগোষ্ঠীর কাছে সূত্র বলতে বুদ্ধের ধর্মদেশনা বা ধর্মোপদেশের বিবৃতিমূলক বিষয়গুলোকে বোঝায়[১৪১]। পরিত্রাণ পাঠেই বুদ্ধের মাহাত্ম্যতা প্রকাশ করা হয়। ছন্দ-সুর-মাত্রার মধ্যদিয়ে এ পরিত্রাণ আবৃত্তি করার সময় দেবমনুষ্যরা একত্রে সমাগম হয়, তাই এ সূত্রগুলোর অন্যনাম সমাগম। পরিত্রাণ সম্পর্কিত কয়েকটি অভিমত নিম্নরূপ ----

ক. এ সূত্র পাঠের দ্বারা সমস্ত আপদ বিপদ সমস্ত প্রকার রোগ ও ভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করে বলে এগুলোর আর এক নাম রক্ষামন্ত্র [১৪৩]।

খ. যে কল্যাণময় মন্ত্রের প্রভাবে মানুষ চারিদিকের বিঘ্ন, বিপত্তি, ভয় ইত্যাদি হতে ত্রাণ বা রক্ষা পেয়ে থাকে, তাই পরিত্রাণ[১৪৪]।

ঘ. বিভিন্ন রকম রোগ, শোক, অপশক্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ কতকগুলো বুদ্ধবাণী একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে তাই পরিত্রাণ[১৪৫]।

মূলত পরিত্তা হলো কতকগুলো বুদ্ধবাণী। যাকে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মন্ত্রৌষধি হিসারে ব্যবহার করে। তাদের বিশ্বাস ; এ মন্ত্রৌষধির একটি অদ্ভুত শান্তি রয়েছে, যা শ্রদ্ধচিত্তে শ্রবণ করলে মানুষের ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

### ৪.২.১. পরিত্তা পাঠের উদ্দেশ্য

১৮৫৬ সালে আরাকান থেকে সারমেধ মহাস্থবির এদেশে এসে বিভিন্নসংস্কার সাধন করে নতুন নতুন কিছু ধর্মাচরণ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। ধর্মমুখী করে তোলার প্রয়াসে তিনি এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'পরিত্তা' এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন শুরু করে। সদ্ধর্ম রত্নাকর[১৪৬] গ্রন্থে এ পরিত্তা আবৃত্তির প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে[১৪৭] এ পরিত্তা সুত্ত সচরাচর আবৃত্তি হয়ে থাকে। যেমন ----

ক. বিবাহের সময় ;

খ. কঠিন রোগ মুক্তির জন্য ;

গ. প্রসব বেদনার সময় ;

ঘ. নতুন গৃহে প্রবেশ কালে ;

ঙ. অষ্ট পরিস্কার দানের সময় ;

ঙ. পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংঘদান করার সময় ;

চ. নতুন ব্যবসা শুরু প্রাক্কালে।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করেও এ ভিক্ষু সংঘের দ্বারা পরিত্তা আবৃত্তি হয়। সাধারণ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; মৃত্যুর সময় এ পরিত্তা পাঠ করলে মৃত্যু পথযাত্রী যদি তা একান্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করে তবে তার সদ্‌গতি লাভ হয়। অনেকে ধর্মীয় চেতনা থেকে আত্মপ্রীতি ও মনের প্রফুল্লতার জন্যও এ পরিত্তা পাঠের আয়োজন করে। এ পরিত্তা পাঠের গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকোমল চৌধুরী বলেন ; নানাবিধ দুঃখ ভয়, অশান্তি ও উপদ্রব নিবারণ এবং সর্ববিধ মঙ্গল বিধানের জন্য এ সূত্রগুলো পঠিত হয়[১৪৮]।

এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ভয়-ভীতি সবই আছে এবং আছে বলেই তো তারা মুক্তি পাওয়ার জন্য এ পরিত্তাগুলোকে বিশেষভাবে আবৃত্তি, শ্রবণ, অধিষ্ঠান ও সত্যক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় নিত্যন্তই ধর্মীয়বিশ্বাসের প্রভাবে। পরিত্তা সূত্ত আবৃত্তির ফলে দুঃখ, উপদ্রবপূর্ণ, অশান্ত, অসহায় চিত্তে সাময়িক শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা উপলব্ধি করে। এ পর্যায়ের সূত্রগুলোর প্রতি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অপরিমেয় সম্মান স্বাভাবিকভাবে বেশী। পরিত্তা পাঠের সার্থকতা প্রসঙ্গে দেখা যায় -- এ পরিত্রাণ পাঠের ফলে পরিত্রাণকৃত ব্যক্তিকে সর্প দংশন করতে পারে না। চোর বা ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কূপিত মত্তহস্তীও তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়। প্রজ্জ্বলিত মহান অগ্নিরাশ্মিও তার নিকট এসে নিভে যায়। পানকৃত বিষ, পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হয়। হত্যাকারী তার অনুগত সেবক হিসেবে পরিগণিত হয়[১৪৯]।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.২. পরিত্তা অনুষ্ঠানে পঠিত সূত্র

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসি বৌদ্ধরাও থেরবাদী বিশ্বাসী হওয়ায় তারাও এ পরিত্ত সূত্র পাঠকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। পরিত্রাণ পাঠে যে সমস্ত সুত্ত বা সূত্র আবৃত্তি করা হয় তা নিম্নরূপ --

মহামঙ্গল সুত্ত[১৫০] : মূলত মাঙ্গলিক নির্দেশনাই এ সূত্র এর অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য। মঙ্গল সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধ ৩৮ প্রকার মঙ্গলযুক্ত সমস্ত পাপক্ষয়কারী মঙ্গল পরিত্রাণ দেবমানবের হিতার্থে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ জনগোষ্ঠী নয় শুধু বৌদ্ধমাত্রই এ সূত্রটির সাথে অতি পরিচিত। বিভিন্নরকম বিপদ-আপদ, ব্যবসায় উন্নতি, আশানুরূপ ফল লাভে, সন্তান ভূমিষ্ট হবার আগে এ সুত্তটি পাঠ করা হয়। প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এটি পাঠ করা হয়।

করণীয় মেত্তসুত্ত[১৫১] : শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ এ সুত্তটি দেশনা করেছিলেন। এ সুত্তটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো মৈত্রী। অশুভ শক্তি থেকে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক থেকে রক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ পরিত্রাণ সুত্তটি পঠিত হয়। এ জনগোষ্ঠীর নিকট সুত্তটি মৈত্রী সুত্ত নামে সমধিক পরিচিত। এ জনগোষ্ঠীর মৃত বাড়ীতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত এক বা একাধিক ভিক্ষু এ সুত্তটি পাঠ করে।

রতন সূত্ত[১৫২] : বুদ্ধের আদেশে আনন্দ বৈশালীতে এ সুত্তটি পাঠ করেছিলেন। বহুবিধ রোগ, অমনুষ্যের উপদ্রব, মহামারি তথা দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি বা ত্রাণ পাবার জন্য এ সুত্ত পঠিত হয় এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

বোজ্ঝাঙ্গ সূত্ত[১৫৩] : বিশেষত দূরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এ সুত্তটি পাঠ করা হয়। মহাকাশ্যপ স্থবির [১৫৪] এবং মহামৌদগল্যায়ণ স্থবির[১৫৫] যখন কঠিনপীড়ায় আক্রান্ত হন তখন বুদ্ধ স্বয়ং নিজে এ সুত্ত পাঠের দ্বারা তাদেরকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধ যখন অসুস্থ হয় তখন চুন্দস্থবির কর্তৃক এ সুত্ত পাঠে আরোগ্য লাভ করে।

সুপূব্বাহ্ন সুত্ত[১৫৬] : সকল প্রকার দুর্নিমিত্ত, অমঙ্গল, অপ্রীতিকর পক্ষীরব ; পাপগ্রহ ও দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তির জন্য এ সুত্তটি পাঠ করা হয়। তাছাড়া এ সুত্ত পাঠে সকল দুঃখিত প্রাণী দুঃখহীন, ভয়ার্তপ্রাণী নির্ভয় এবং শোকার্ত প্রাণী শোকহীন হয়। এটি সদাচার বিষয় সম্পর্কিত কতকগুলো উপদেশ। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে এটি দেশনা করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মোর পরিত্তং[১৫৭] : এ পরিত্তা সুত্তটির মূল বিষয় হলো আত্মরক্ষা। এটা বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর এটি দেশনা করেছিলেন। এ পরিত্তা সূত্ত আবৃত্তির ফলে আবৃত্তিকারী নিরাপদে অবস্থান করে।

অঙ্গুলিমাল পরিত্তং[১৫৮] : সুস্থ ও নিরাপদ সন্তান ভূমিষ্ট হবার ক্ষেত্রে এ সুত্তটি পঠিত হয়। একসময় অঙ্গুলিমাল শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচারণ করতে গিয়ে একগৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে এক সন্তান সম্ভবা রমনীকে দেখতে পান। এ রকম প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির অথির চিত্ত তার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি বিহারে এসে বুদ্ধকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে বুদ্ধ তাঁকে এ সুত্তটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আটানাটিয় সুত্ত[১৫৯] : অশুভ শক্তি, অলৌকিক বা আধিদৈবিক ভয়-ভীতি তথা উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ সুত্ত পাঠ করা হয়। চারদিকপাল রাজার[১৬০] মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধের অনুসারীরা যেন নিরাপদে ধ্যান-সমাধি পালনের মাধ্যমে বসবাস করতে পারে সে জন্য বুদ্ধ এ আটানাটিয় রক্ষা দেশনা করেছিলেন। তবে এ সুত্ত আবৃত্তি করার আগে অতি অবশ্যই মৈত্রীসুত্ত, ধ্বজাগ্রসূত্ত এবং রতনসুত্ত আবৃত্তি করা অত্যাবশকীয় বলে কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন[১৬১]।

খন্ধ পরিত্তং[১৬২] : বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গের কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এ পরিত্তা সুত্ত আবৃত্তি করা হয়। সর্প দংশনে জনৈক ভিক্ষুর মৃত্যু হলে সর্প দংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্য বুদ্ধ এ পরিত্তা সুত্তটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সীবলী পরিত্তং[১৬৩] : এ পরিত্তা সুত্তটি আবৃতির ফলে যক্ষ, চোর, শত্রুতা বিভিন্ন প্রকার উপদ্রব এবং দুঃখ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিশেষত ধন সম্পত্তি বর্ধিত হয়।

এছাড়া এ সময় ধ্বজাগ্র সুত্ত, জয়পরিত্তং, বত্তক পরিত্তং, জয়মঙ্গল গাথা, জিনপঞ্জর গাথা, তিরোকুড্ড ইত্যাদি সুত্ত এবং নতুন ব্যবসা শুরু করার সময় সীবলী পরিত্তং পঠিত হয়।

### ৪.২.৩. পরিত্তা আচার-অনুষ্ঠান প্রথা

পরিত্তা পাঠ বা আবৃতির কোনো কালাকাল নেই। তবে বেশীর ভাগ বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সন্ধ্যার পরই পরিত্তা সুত্ত পাঠ করার পক্ষে। এ পরিত্তা পাঠানুষ্ঠানে কিছু পুত, পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধিতার লক্ষণীয়। এ উপলক্ষে ভিক্ষুরা অনেক আগেই নিমন্ত্রিত হয়। আবৃতির দিন আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও পাড়ার সবাইকে পরিত্তা পাঠ শ্রবণ করার জন্য আমন্ত্রন করা হয়। পুরো বাড়িকে এ উদ্দেশ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। বাঁশ কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

মাটির ঘর হলে সুন্দর করে লেপন করে। পরিত্তা শ্রবণের আগে একটি ধর্মপূঁজা[১৬৪] স্থাপন করা হয়। থালা গামলার মধ্যে পাঁচ পোয়া চাল অথবা তিন পোয়া চাল[১৬৫], একটি ডাব বা নারিকেল, এককাদি কলা[১৬৬], সুই-সুতা[১৬৭], পেন্সিল, খাতা কলম[১৬৮], এক গ্লাস পানি[১৬৯] এবং এবং একটি মঙ্গলঘট[১৭০] রাখা হয়। তারপর মোমবাতি সুগন্ধিদ্রব্য[১৭১] প্রজ্জ্বলন করে। পরিত্তা পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ মোমবাতি এবং সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালিয়ে রাখে। এ পরিত্তা পাঠ করার আগে গৃহের চারদিকে ৩/৫ বার করে প্যাঁচ দিয়ে সুতার পিণ্ডটি ভিক্ষুর হস্তে অর্পন করে। পরিত্তা আবৃত্তি শেষ হলে আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই এ সুতা পাঁচ প্যাঁচ কিংবা সাত প্যাঁচ দিয়ে গলায় অথবা ডান হাতে পরিধান করে। বিশ্বাস, এ সুতা ধারণ করলে আপদ-বিপদ কেটে যায় এবং কোনো রকম ভয়-ভীতি থাকে না। পরিত্তা আবৃত্তিকারী ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘরা গৃহীসংঘ থেকে আলাদা হয়ে চৌকি, চেয়ার অথবা কাঠের মধ্যে বসে এ পরিত্তা সুত্ত আবৃতি করে।

পরিত্তা পাঠের অনুষ্ঠান একটি ধর্মীয় আচারণিক পর্ব। যেখানে সমাজের নারী-পুরুষ সবাই একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে উপস্থিত সবাই আগে ত্রিশরণ[১৭২] এবং পঞ্চশীলে[১৭৩] প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর সমস্বরে ছন্দাকারে পরিত্তা প্রার্থনা করে--

বিপত্তি পটিবাহায সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিযা
সব্ব দুঃখ বিনাসায, সব্ব ভয বিনাসায
সব্ব রোগ বিনাসায, সব্ব অন্তরায় বিনাসায
ভবে দীঘায়ু দাযকং চিত্তং উজুং করিত্বান
পরিত্তং ব্রূথ মঙ্গলং।[১৭৪]

অনুবাদ : সর্ববিধ বিঘ্ন বিপত্তি দূরীভূত হবার জন্য সকলপ্রকার সম্পত্তি লাভের জন্য, সর্ববিধ দুঃখ ও ভয় বিনাশের জন্য, সকল প্রকার রোগ অন্তরায় বিনষ্ট হবার জন্য, শান্ত সবল চিত্তে দীর্ঘায়ুদায়ক মঙ্গলময় পরিত্রাণ পাঠ করুন।

এভাবে উপাসক উপাসিকা কিংবা দায়ক-দায়িকাদের পরিত্তা শ্রবণের আগ্রহ দেখে একজন ভিক্ষু এ পরিত্তা শোনার জন্য দেবতাদের আমন্ত্রণ করেন এভাবে --

সমন্ত সক্ক বালেসু অত্রাগচ্ছন্ত দেবতা
সদ্ধমং মুনিরাজস্স সুন্তং সগ্গ মোকখদং
ধম্ম সবণকালো অযং ভদন্তা[১৭৫] (তিন বার)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ চর্তুদিকে চক্রবালবাসী দেবতারা এখানে আসুন। সম্মিলিতভাবে এখানে এসে বুদ্ধের স্বর্গ মোক্ষপ্রদ সত্যধর্ম শ্রবণ করুন। হে ভন্তে দেবগণ! ধর্ম শ্রবণের এখনো উপযুক্ত সময়।

এ আহবান সমাপ্তি হলে উপস্থিত সকলে জোড়ে জোড়ে সাধু-সাধু-সাধু বলে সাধুবাদ প্রদান করে। আবার পুণ্যময় কার্যে ব্যাপৃত যে সকল দেবগণ আছেন তাদেরকে আহবান করে ভিক্ষু বা ভিক্ষু-সংঘ নিম্নোক্ত গাথাটি উচ্চারণ করে--

যে সন্তচিত্তা তিসরণসরণা এথ লোকন্তরে বা
ভুম্মা চ দেবা গুণ-গণ-গহণ ব্যাবটা সব্বকালং
এতে আযন্ত দেবা বরকণ কময়ে মেরুরাজে বসন্তো
সন্তো সন্তোসহেতুং মনিবরবচনং সোতমগ্গং সমগ্গং[১৭৬]

অর্থাৎ লোকান্তরে ভূমি বা আকাশবাসী এবং সুবর্ণময় পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুনিবাসী শান্তচিত্ত, ত্রিশরণগত ও সতত পুণ্যকার্যে নিরত দেবগণ পরম সন্তোষের সাথে বুদ্ধবাক্য শ্রবণ করার জন্য এখানে আগমন করুন।

তারপর মাধুর্য্যময় শ্রুতিমধুর সুরালাকণ্ঠে উল্লিখিত পরিত্তা সুত্ত আবৃত্তি হয়। অতঃপর শুরু হয় দেবতাদেরকে পুণ্যদান এবং রক্ষা প্রার্থনা পর্ব। প্রার্থনাটি নিম্নরূপ --

সব্বেসু চক্কবালেসু যক্খা দেবা চ ব্রাহ্মানো
যং অম্হেহি কতং পুঞ্ঞং সব্ব সম্পত্তি সাধকং
সব্বে তং অনুমোদিত্বা সমগ্গা সাসনেরতা
পমাদ রহিতা হোন্তু আরক্খাসু বিস্সেতো[১৭৭]।

অর্থাৎ আমাদের দ্বারা যে সমস্ত সর্বসম্পত্তি সাধক পুণ্যকর্ম করা হয়েছে, সমুদয় চক্রবালবাসী দেবতা যক্ষ ও ব্রাহ্মণগণ সেই পুণ্য অনুমোদন একতাবদ্ধ ও নির্বিঘ্ন শাসনাহিতে রত হন। বিশেষত শাসন রক্ষার্থে সর্তক হোন।

তারপর আবৃত্তিকারী ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও রক্ষাপ্রার্থনা করে নিম্নলিখিত ভাবে --

সাসন্স চ লোকস্স বুড্টী ভবতু সব্বদা
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ দেব রক্খন্ত সব্বদা।
সদ্ধিং হোন্ত সুখী সব্বে পরিবারেহি অত্তনো,
অনীঘা সুমনা হোন্ত সহসব্বেহি ঞাতিভি[১৭৮]।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ বুদ্ধশাসন এবং জগতের সতত শ্রীবৃদ্ধি হোক। দেবগণ বুদ্ধশাসন এবং জগতকে রক্ষা করুন। সকলে নিজ নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজদের সাথে শারিরীক ও মানসিক সুখে সুখী ও দুঃখহীন হোক।

এ আবৃত্তি সমাপ্ত হলে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ নর-নারী, শিশু-কিশোর, সাধু-সাধু-সাধু বলে জোড়ে সাধুবাদ প্রদান করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনে পরিত্তায় লোকধারণা নিম্নরূপ ----

ক. ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হয় ;

খ. সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ;

গ. বিভিন্ন উপদ্রব থেকে রক্ষা প্রাপ্ত হয় ;

ঘ. আত্ম উন্নতি ও পারিবারিক উন্নতি সাধিত হয় ;

ঙ. চরিত্র বিশুদ্ধকরণে সাহায্য করে ;

চ. নির্বাণ স্রোতে পদার্পনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পরিত্তা পাঠ এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল পরিচিত। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নয় ; বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী বৌদ্ধরাও এ পরিত্তার সঙ্গে ধর্মীয়ভাবে পরিচিত। এ পরিত্তা আবৃত্তি বা পাঠকে ঘিরে রয়েছে সামাজিক এবং ধর্মীয় গুরুত্ব। একদিকে এ পরিত্তা পাঠের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি, সম্মিলন ঘটে আবার অন্যদিকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দর আগামীয় প্রত্যাশায় নিজেকে নিজে জানতে শুরু করে। এ পরিত্তা সুত্ত আবৃত্তির ফলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং ভয়ভীত্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কিনা বলা দুরূহ ব্যপার। তথাপি তারা এ পরিত্তা আবৃত্তিকে অতি সম্মানের সাথে শ্রবণ করে, শ্রদ্ধার সাথে অনুধাবন করে, বিশ্বাস করে পরম ভক্তিতে অনুদ্ধত চিত্তে।

### ৪.৩. বিদর্শন ধ্যান

ধ্যান[১৮০] শব্দটি পালি ঝাণ থেকে উদ্ভূত। যা√ঝা ধাতু যোগে নিস্পন্ন। তবে পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ভাবনা' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ ধ্যানের মাধ্যমে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। আচার্য বুদ্ধঘোষ এ বিষয়ে বলেন ; আরম্বর বা ধ্যেয় বিষয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তা বা চিত্তের একাগ্রতার সাধনাকে ধ্যান বলে[১৮১]। ধ্যানের প্রতিশব্দগুলো নিম্নরূপ ----

Producing dwelling on Something, Putting ones thoughts to, Application, developing by means of thought or meditation, cultivation by mind culture[১৮২].

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন তথা প্রজ্ঞার সম্প্রসারণে এ ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রজ্ঞা এবং ধ্যান একে অপরের পরিপূরক। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান নেই। যিনি ধ্যানে নিরত থাকেন না, তার প্রজ্ঞার উন্মেষ সাধন হয় না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়েই আছে ; তিনি নির্বাণের সমীপবর্তী হয়ে অবস্থান করে[১৮৩]।

ধ্যান হচ্ছে চিত্তের ঐকান্তিক একগ্রতা সাধন। এ চিত্ত সকল দুঃখের কারণ যেমন তেমনি আবার মানসিক ক্রিয়াদিরও উৎস। এরূপ অস্থির-চঞ্চল সদা ধাবমান চিত্তকে সংযম করার একমাত্র উপায় ধ্যান। কোনো বিষয় বা আলম্বনের উপর চিত্তকে মনোনিবেশ বা সমাহিত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় ভাবনা এবং চিত্ত যখন সুস্থির ও সুনিবিড় হয় তখন তাকে বলা হয় ধ্যান। এ ধ্যান ত্রিদ্বার[১৮৪] দ্বারা সংযতপূর্বক সমন্বিত চিন্তা। যার মাধ্যমে অসন্তোষ পরিহার করা যায়, চিত্তসুখ লাভ হয়, নীবরণ পরিত্যাগে বিমুক্তি সুখ লাভ করা যায়। নিপুন সমাধি উপাদন এবং সম্যকবিহার অবস্থানে ধ্যান সহায়তা করে । সমাধি উৎপাদনের সংকল্প মুক্তি এবং মুক্তিলাভের অভিলাষও ধ্যান যোগে সম্ভবপর হয়।

### ৪.৩.১. বিদর্শন ধ্যানে প্রাথমিক করণীয়

গৃহী (Laymen) হলে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল বা উপোসথশীল (অষ্টশীল), প্রতিষ্ঠিত হয়, শ্রামণ হলে ত্রিশরণসহ শ্রামণের দর্শশীল আর ভিক্ষু হলে প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল (আপত্তিদেশনা) প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর নিম্নলিখিতভাবে[১৮৫] উপস্থিত সবাই বিদর্শন ধ্যানের প্রার্থনা করে। যেমন --

সব্ব দুক্খ নিস্সরণং নিব্বানং গচ্ছি
করণত্থায বিপস্সন কমট্ঠানং যাচামি (৩ বার)।

অর্থাৎ সকল প্রকার দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করার নিমিত্তে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য বিদর্শন কর্মস্থান যাচ্ঞা করছি।

### ৪.৩.২. বিদর্শন ধ্যান অনুশীলন পদ্ধতি

'বি ও দর্শনের' সমন্বয়ে গঠিত একটি অর্থযুক্ত অর্থ ব্যঞ্জনাত্মক শব্দ 'বিদর্শন'। এখানে 'বি' একটি উপসর্গ আর 'দর্শন' হচ্ছে সত্যের প্রত্যেক্ষ স্বানুভূতি। বস্তুর যথাযথ সম্যক সত্যের অনুদর্শনই হলো 'বিদর্শন'। 'বিদর্শন' হচ্ছে আত্মনিরীক্ষণ, আত্মপরীক্ষণ ও আত্মদর্শনের এক অনুপম স্রোতধারা। ইন্দ্রিয় সংযমই 'বিদর্শন' ধ্যানে অত্যাবশ্যক। এতে অগ্রপর্যায়ে ভূমিকা পালন করে পঞ্চইন্দ্রিয়[১৮৬] এবং ষড়ায়তন[১৮৭]। এগুলোর অসংযমতার কারণে মানবসমাজ প্রতিনিয়ত অসম দুঃখভোগ করে। তাদের উভয়ের সমন্বয়ে যে

Dhaka University Institutional Repository

আলম্বন বা অবলম্বন উৎপন্ন হয় তার স্বরূপ স্বভাবধর্মকে যথাযথভাবে জানাই হলো জ্ঞান বা বিদ্যা। পক্ষান্তরে আলম্বনগুলোকে না জানাই হলো অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এ অজ্ঞানতাকে এবং অবিদ্যাকে বিদূরিত করার একমাত্র মাধ্যম হলো বিদর্শন ধ্যান। এ বিদর্শন ধ্যানে চারি ইর্যাপথে[১৮৮] যখন যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় অহরহ তার স্মৃতি রাখতে হয়। তবে তিনটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তাড়াতাড়ি স্মৃতি রক্ষা সহজসাধ্য বলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস। এ তিনটি বিষয় হলো যথাক্রমে : ১. উপবেশন ২. গমণ বা চংক্রমণ এবং ৩. ভোজন। তাছাড়া হাঁটার সময় স্মৃতি সাধনার প্রক্রিয়া হলো হাত দুটোকে পেছনে রেখে পা তুলছি, সামনে নিচ্ছি এবং মাটিতে রাখছি এভাবে প্রতি ধাপে স্মৃতি রাখা। তাছাড়া খাবার সময় থেকে শুরু করে সকল-কর্মে স্মৃতি রাখা বিশেষ প্রয়োজন[১৮৯]।

### ৪.৩.৩. আত্মদর্শনে বিদর্শন

বিদর্শন ধ্যানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিকরণে নিজেকে নিজের সামনে উপস্থিত করা বা আত্মানুশীলন করাকে বোঝায়। এ বিদর্শন ধ্যানে অনিত্য, দুঃখ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়[১৯০]। এ ধ্যান দ্বারা নাম-রূপের[১৯১] ধারাহিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ নিবরচ্ছিন্ন ভাবে অনুধাবন করা হয়। এ রকম ধ্যান হচ্ছে আত্মউন্নতিতে এবং সংযমতার মধ্যে দিয়ে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে উত্তোরত্তর সমৃদ্ধ করা। এ বিষয়ে বুদ্ধের নিম্নলিখিত উপদেশটা খুবই তাৎপর্যবহ। তিনি বলেন ;

> চক্ষু সংযম হিতকর, কর্ণ সংযম হিতকর, ঘ্রান সংযম হিতকর, জিহ্বা সংযম হিতকর, কায়িক সংযম, বাচনিক সংযম হিতকর, মানসিক সংযম হিতকর, সকল প্রকার সংযম হিতকর। সবর্থ সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়[১৯২]।

এখানে ভিক্ষু বলতে বুদ্ধ বিদর্শন ধ্যানরত সাধক-সাধিকাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা সংসার দুঃখকে ভয়রূপে দর্শন করে সর্বদা দুঃখমুক্তির লক্ষে সাধনায় নিরত তারাই ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধিত। তাঁরা সকল প্রকার দুঃখ থেকে বিমুক্ত হন। এ জন্য বুদ্ধ ইন্দ্রিয় সংযমতাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদর্শন ধ্যানে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্য সম্পর্কে উক্ত আছে, Meditation helps to develof the awareness and the energy needed to transforn ingrained mental habit and patterns.[১৯৩] আরো দেখা যায়, Meditation can stop worry, relax mental tension, eradicate mental depression, offer instant peace of mind, and lead to concentration.[১৯৪] এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেন ; চার উপায়ে[১৯৫] স্মৃতিবান হওয়া যায় --

Dhaka University Institutional Repository

ক. দৈহিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার পদ্ধতি ;

খ. অনুভূতির উপর মনোযোগী হওয়ার পদ্ধতি ;

গ. চেতনার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পদ্ধতি ;

ছ. মনোগত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পদ্ধতি।

ইপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি তথা লোকাত্তর উন্নতির জন্য শারীরিক-মানসিক সুখশান্তি লাভে বিদর্শন ধ্যান এক প্রকার মহৌষধ। এটা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। এ ধ্যান অনুশীলনের কোনো কালাকাল নেই, যে কোনো বয়সে যে কোনো স্থানে এ ধ্যান করা সম্ভব। ধরাবাধা নিয়মের মধ্যে এটা আবদ্ধ থাকে না। এটি অসাম্প্রদায়িক জীবনশুদ্ধির একটা অন্যতম প্রক্রিয়া ; নিজেকে কুলষতা থেকে মুক্ত রাখতে এবং অপরকে সুখ শান্তির পরিবেশ দান করতে এ ধ্যানের ন্যায় অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই। এজন্য বুদ্ধ বিদর্শন ধ্যানকে দুঃখ মুক্তির একমাত্র পথ বলে উল্লেখ করেছেন[১৯৬]। মোহ হতে লোভ-দ্বেষাদি ও সকল পাপধর্ম উৎপন্ন হয়। ধ্যান যোগে সে-ই মোহান্ধ বিনাশক প্রজ্ঞাসূর্য চিত্তাকাশে উদিত হয়ে চিত্তকে প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত করে[১৯৭]।

রসের মধ্যে সত্যরসই মধুরতম[১৯৮]। মার্গের মধ্যে অষ্টবিধমার্গ এবং সত্যের মধ্যে চারিআর্য সত্যই শ্রেষ্ঠ[১৯৯]। উল্লিখিত সত্যকে যে সাধন পদ্ধতি দ্বারা জানা সম্ভব তার নাম 'বিদর্শন'। প্রজ্ঞা ব্যতীত প্রকৃত সত্য দেখা যায় না। সেই প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদনের যে প্রচেষ্টা তাকে বলা হয় বিদর্শন ধ্যান। এই ধ্যানের মধ্যে দিয়ে অনুৎপন্ন কুশল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন কুশল বর্দ্ধন হয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের নিম্নলিখিত[২০০] উক্তিটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সব্ব পাপস্স অকরণং কুস্লস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং

অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপ হতে বিরতি, কুশল ধর্মের পরিপূর্ণতা এবং নিজ চিত্তের পবিত্রতা সাধন এটাই বুদ্ধের অনুশাসন। বুদ্ধের সর্বজনীন এ মহান শিক্ষাকে আবার নিম্নলিখিত পর্যায়ে ব্যাখ্যা করে দেখানো যায়। যেমন -- সকল প্রকার পাপ হতে বিরতি - শীল (Morality), কুশল ধর্মের পরিপূর্ণতা - প্রজ্ঞা (Wisdom), নিজ চিত্তের পবিত্রতা সাধন - সমাধি (Concentration of mind)

উল্লেখ থাকে যে, এখানে শীল দ্বারা চারিত্রিক বিশুদ্ধিতা লাভ করে। সমাধি দ্বারা চিত্তের একনিবিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় আর প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মকে জানার জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৪. বিদর্শন ধ্যানের প্রচার-প্রসার

বিদর্শন ধ্যান অধুনা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কখন থেকে এ বিদর্শন ধ্যান প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে তার আনুমানিক সময় পরিধি খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। তবে মাঠ পর্যায়ের সাক্ষ্যৎকারে জানা যায়, ৫০ কিংবা ৬০ দশকের দিকে এ বিদর্শন ধ্যান অনুশীলন প্রচলন থাকলেও ৭০/৮০ দশকের শেষের দিকে এ ধ্যানের প্রচার ব্যাপকভাবে শুরু হয়[২০১]। এখন যারা এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মদান বিদর্শন ধ্যান প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো[২০২]: প্রয়াত বোধিপাল শ্রমণ, শাসনপ্রিয় স্থবির, নন্দবংশ স্থবির, স্মৃতিমিত্র ভিক্ষু, অনন্ত মোহন বড়ুয়া, তেমিয়ব্রত বড়ুয়া প্রমুখ। বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত হয়ে তারা এ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। নীচে এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য সারণী আকারে প্রদান করা হলো :

সারণি - ১

২১.০৮.১৯৯৭ - ০৪.১০.১৯৯৭ ইং

| বিদর্শন ধ্যান অনুষ্ঠিত স্থানের নাম | দিন | বিদর্শন ধ্যান অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|---|---|
| রাউজান বিমলানন্দ বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম | ১০ | ২১.০৮.৯৭-৩০.০৮.৯৭ ইং | ০৬ (ছয়) | ১১(এগার) |
| চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম | ১০ | ২৭.০৮.৯৭-০৫.০৯.৯৭ ইং | ০৬ (ছয়) | ২৪(চব্বিশ) |
| জেতবন সাধনা কেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম | ১০ | ০৬.০৯.৯৭-১৬.০৯.৯৭ ইং | ১৪ (চৌদ্দ) | ৩১(একত্রিশ) |
| কক্সবাজার বিহার, কক্সবাজার | ১০ | ১৯.০৯.৯৭-২৮.০৯.৯৭ ইং | ১৩ (তের) | ১২(বার) |
| গহিরা শান্তিনগর বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম | ১০ | ০১.১০.৯৭-০৯.১০.৯৭ ইং | ০৮ (আট) | ১৫(পনের) |
| চান্দগাঁও সর্বজনীন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | ১০ | ০৪.১০.৯৭-১২.১০৯৭ ইং | ০৪ (চার) | ২৬(ছাব্বিশ) |

তথ্যসূত্র : আর্যমার্গ পরিক্রমা (চট্টগ্রাম : ১৯৯৮)

মোট=৪১ জনপুরুষ মোট=১১৯ জন নারী

সারণি - ২

০২.০১.১৯৯৮ - ০৬.০৪.১৯৯৮ ইং

| বিদর্শন ধ্যান অনুষ্ঠিত স্থানের নাম | দিন | বিদর্শন ধ্যান অনষ্ঠিত হওয়ার সময় | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|---|---|
| শাক্যমনি বিহার, আব্দুল্লাহপুর, ফটিকছড়ি থানা, চট্টগ্রাম | ১০ | ০২.০১.১৯৯৮-১১.০২.৯৮ ইং | ২২(বাইশ) | ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) |
| শান্তি বিহার, শুমার্মদ্দন, ছটিকছড়ি থানা, চট্টগ্রাম | ১০ | ১১.০১.১৯৯৮-২০.০১.১৯৯৮ ইং | ১৪ (চৌদ্দ) | ১৮ (আঠার) |
| সুদর্শন বিহার, মায়ানী, মিরসরাই থানা, | ১০ | ২০.০১.১৯৯৮-০১.০২.১৯৯৮ইং | ১০(দ | ৪৪(চুয়াল্লিশ) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | | | শ) | |
| জেতবন বিহার, রাউজান, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম | ১০ | ০২.০২.১৯৯৮-১১.০২.১৯৯৮ ইং | ২৫(পঁচিশ) | ৩১(একত্রিশ) |
| জ্ঞানানন্দ বিহার, পশ্চিম ইদিলপুর, রাউজান থান, চট্টগ্রাম | ১০ | ০৩.০২.১৯৯৮-১২.০২.১৯৯৮ইং | ০৯ (নয়) | ২১ (একুশ) |
| শান্তি বিহার, পাইন্যাশিয়া, রামু থানা, কক্সবাজার | ১০ | ১৩.০২.১৯৯৮-২২.০২.১৯৯৮ইং | ১০ (দশ) | ২৬ (ছাব্বিশ) |
| শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য, বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র, ভান্ডারগাঁও, চন্দাইন থানা, চট্টগ্রাম | ১০ | ২৪ ফাল্গুন ১৪০০ | ১৬ (ষোল) | ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) |
| বৈজয়ন্ত বিহার, পূর্ব আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম | ১০ | ২৪.০২.১৯৯৮-০৫.০৩.৯৮ ইং | ১৪ (চৌদ্দ) | ২৮ (আটাশ) |
| ধর্মাধিরাজ মহামুনি, বিদর্শন ভাবনা, বাথুয়া, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম | ১০ | ১৯.০৩.১৯৯৮-২৮.০৩.১৯৯৮ ইং | ০৬ (ছয়) | ৩৮(আটত্রিশ) |
| আনন্দ বিহার, রুদুরা, আনোয়ারা থানা | ১০ | ২৮.০৩.১৯৯৮-০৬.০৪.১৯৯৮ ইং | ০৮ (আট) | ২৯ (উনত্রিশ) |

তথ্যসূত্র : আর্যমার্গ পরিক্রমা (চট্টগ্রাম : ১৯৯৮) বাংলাদেশ মোট পুরুষ=১৩৪ জন এবং মোট নারী=৩১৫ জন

সর্বমোট পুরুষ = ৪১+১৩৪ = ১৭৫ জন

সর্বমোট নারী = ১১৯+৩১৫ = ৪৩৪ জন

সর্বমোট নর-নারী সংখ্যা = ১৭৫+৪৩৪ = ৬০৯ জন নারী পুরুষ

বিহার (Buddhish Monastry) কমিটি কিংবা ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে এ ধ্যান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ধ্যান সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে একজনকে মহাসচিব এবং একজনকে চেয়ারম্যান করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে প্রচারপত্র বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রামে এ বিদর্শন ধ্যান অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়[২০৩]। তবে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রচারপত্র পাওয়ার পর থেকে সদ্ধর্মপ্রাণ নর-নারী বিভিন্নরকম সাহায্য সহযোগিতা[২০৪] মাধ্যমে তাদের হস্ত সম্প্রসারণ করে।

এ ধ্যান প্রশিক্ষণ উপলক্ষে একটি সুন্দর ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় বিহার বা কেন্দ্রটিকে নব নব সাজে সজ্জিত করে তোলা হয়। সামিয়ানা দিয়ে ঐ উঠোনকে ঘিরে ফেলে হয়। ধ্যানকারীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্নানাগারদি তৈরী করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মেয়াদে এ ধ্যানকোর্স অনুষ্ঠিত হয়। যেমন : ১০ দিন, ১৩ দিন, ১৫ দিন ইত্যাদি। তবে এ ধ্যানে অংশগ্রহণেচ্ছুকের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার্য করা হয়। এ জনগোষ্ঠীরা এ টাকাকে শ্রদ্ধা দান বলে। এ টাকা ধ্যান শুরু হওয়ার ২/৩ দিন আগে প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ধ্যান শুরুর দিন সন্ধ্যার আগেই ধ্যানীদের ঐ বিহারে নিত্য ব্যবহার্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়াদি নিয়ে উপস্থিত হওয়া অত্যাবশ্যক। অতঃপর অষ্টশীল অধিষ্ঠান গ্রহণের মাধ্যমে সবাই নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসে। এ প্রক্রিয়ায় বিদর্শন ধ্যান প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কুলবধূ কুলনারী সবাই দলবেঁধে ধ্যানীদের দর্শনার্থে বিহার বা কেন্দ্রে ছুটে যায়। আবার কুলবধু কুলনারীরা পুণ্যলাভের আশায় ধ্যানকারীদের কাপড়াদি ধৌত করে।

### ৪.৩.৫. বিদর্শন ধ্যানে প্রচলিত বিশ্বাস

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ বিদর্শন ধ্যানে ধর্মীয়বিশ্বাস এবং লোকবিশ্বাস বিরাজমান। বিভিন্নভাবে তারা এ বিশ্বাসকে বংশ পরম্পরায় আজন্ম লালিত স্বপ্নের ন্যায় পরিপালন করে আসছে। তা নিম্নরূপ ----

ধর্মীয় বিশ্বাস[২০৫] :

ক. জন্মমৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করা হয় ;

খ. আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয় ;

গ. সাম্যভাব উদয় হয় ;

ঘ. দুঃখ মুক্তি সম্ভব ;

ঙ. কায়িক-বাক্য-মন সংযত হয় ;

চ. আত্মশুদ্ধিতার মনোভাব জাগ্রত হয় ;

ছ. নির্বাণ লাভের কামনা করা হয়।

লোকবিশ্বাস[২০৬] :

ক. জটিল রোগ প্রশামিত হয় ;

খ. মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় ;

গ. গর্হিত কাজ থেকে দূরে অবস্থান করা যায় ;

ঘ. জ্যোর্তিময় চেহারার অধিকারী হওয়া যায় ;

জ. জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'বিদর্শন' ধ্যান একটি তাত্ত্বিক বিষয়ের নাম সন্দেহ নেই। মানবসমাজ লোভাসক্ত, মোহাসক্ত এবং দ্বেষাক্ত। সিংহভাগ মানুষ আবার আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করে। অনেকের অঢেল ধন সম্পত্তি থাকার পর পারিবারিক এবং মানসিক সুখ শান্তি নেই। এমতাবস্থায় চিত্তে প্রাসাদ উৎপন্ন করত শান্তি লাভ করতে বিদর্শন ধ্যান মহোপকারী বলে ধারণা করা হয়। পূজা-পার্বণ উদযাপন উপলক্ষে লৌকিকধারার সুন্দরতম প্রত্যাশা লোকোত্তর জীবনে অভিগমনের উজ্জ্বল সারণী আত্মপরিশুদ্ধতার পথ। এতে বিশ্বাসী যারা তারা বিকশিত হয় বিদর্শন ধ্যানের সুনিবিড় পরিক্রমায়। তবে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকজন বিদর্শন ধ্যানকে বিদর্শনভাবনা বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

৫. লোকজ উৎসব

সমাজ মানবজাতির প্রাণ। অনাদি অনন্তকাল থেকে মানবসমাজ এ লোকজ উৎসব পালন করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ এ লোকজ উৎসব পালন করে। বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীও এ লোকজ উৎসব পালন করে ।

৫.১. চৈত্র সংক্রান্তি[২০৭]

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা ও এদিনটিকে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করে। চৈত্র সংক্রান্তির কিছুদিন আগে থেকে এ জনগোষ্ঠীর পল্লীর শিশু-কিশোরদের মাঝে আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহমান। প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনমাঝে ব্যক্তি বৃত্তের বাইরে আবেগের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়। সেই দিন তার আনন্দ, সেই দিন তার উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনের মধ্যে এ জনগোষ্ঠীর রমনীরা বাড়ি-ঘর ঝেড়ে লেপনের মাধ্যমে পরিস্কার করে। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন খুব ভোরে শিশু-কিশোররা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে বিউফুল, নিমপাতা, কচি কেঁয়া পাতা এবং বেত এর নরম আগা ঘরের দরজার সামনে টাঙিয়ে দেয়। ঘরের ভিতরে বাহিরে সোনা-রূপার পানি ছিটিয়ে ঘরকে বিশুদ্ধ করে। বৌদ্ধ বিহারের বুদ্ধ মূর্তি দুধ দিয়ে ধৌত করে। চৈত্র সংক্রন্তির অন্যতম আয়োজন জাঁক। বাড়ি-ঘরের উঠানে বা ঘাটায় কেঁয়াপাতা, আমুস গাছ, বেত কাটা, বিষ কাটালী ইত্যাদি খড়ের সাথে মিশিয়ে স্তূপ করে সমস্বরে গানের মাধ্যমে পোড়ানোর নাম জাঁক দেয়া অনুষ্ঠান। অনেকে আবার একাধিক জাঁকও দেয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন সন্ধায়, চৈত্র সংক্রান্তির দিন ভোরবেলা ও সন্ধায় এবং নববর্ষের প্রথম দিন খুব ভোরে এ চারবার জাঁক দেয়ার প্রথাসিদ্ধ নিয়ম এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে। জাঁক দেয়ার সময় শিশু-কিশোর এবং বাড়ির অশীতিপর বৃদ্ধও সমস্বরে যে গানটি গায় ----

Dhaka University Institutional Repository

জাঁক জাঁক জাঁক আঁরঅ ঘরত জাঁক

সোনারূপা ট্যাঙা পইসাঁ

আঁরঅ ঘরত জাঁক

জাঁক জাঁক জাঁক আঁরঅ ঘরত জাঁক

ট্যাঙা পইসাঁ ধনসম্পদ

আঁরঅ ঘরত জাঁক

রোগ শোক দুঃখ কষ্ট

সাত দইয্যা পার হই

বারঅঁত দইয্যায় যাক[২০৮]।

এই জাঁক দেয়ার প্রথা এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কখন থেকে প্রচলন হয়ে আসছে তা বলা কঠিন। তবে ধারণা করা হয়, বংশ পরম্পরায় হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি দ্বারা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি প্রচলিত হয়। এ বিষয়ে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, জাঁক দেয়ার মধ্যে একটা স্বাস্থ্য সম্মত দিক লক্ষ্য করা হয়। নিমপাতা, কেঁয়াপাতা, বিষকাটালী, আমুস গাছ এর পোড়ানো ধোঁয়ায় পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের রোগ জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। লোকাচারিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এ জাঁক দেয়ার নিয়ম এখনো বৌদ্ধ পল্লীতে বলবৎ আছে।

এ দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে জাঁকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অতঃপর শিশু-কিশোররা পার্শ্ববর্তী নদনদী, খাল কিংবা পুকুর থেকে এক নিঃশ্বাসে একবালতি বা একজগ পানি নিয়ে আসে। তারপর গায়ে ঘিলা মেখে অল্প অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে পরিবারের সবাই স্নান করে। এ উপলক্ষে বৌদ্ধ বিহারগুলো বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। এ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিহারে ধর্মীয় কার্যক্রম চলে। চৈত্র সংক্রান্তির অন্যতম আকর্ষণ পাঁচন। পাঁচনের ভৈষজ গুণাগুণ সম্পর্কে অনিল কান্তি বড়ুয়া বলেন ; এলাচি শাক, মিজরিপাতা, তাঁড়া, ঢেঁকি শাক, গিমা শাক, কাটটুস কাঁচাকলা, কাঁচাকাঠাল, কাঁচা আম, শশা, বেগুন, পেপে, টমেটো, সীম বীচি, কলাই, ডাল, মিষ্টি কুমড়া, তিতা করলা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত করা হয় পাঁচন ; যা স্বাস্থ্যোপযোগী। বছরের এদিনটিতে এ পাঁচন খেয়ে এ জনগোষ্ঠীর লোকজন পরবর্তী বছর নিরোগী হয়ে বসবাস করতে চায়[২০৯]। তাছাড়া এ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘরে তৈরী করা পিঠা, মিষ্টান্ন, লাবন, খৈ, খৈ এর লাবন, চালের গুড়ার লাবন, মুখবোচক কড়ই। তাছাড়া বিভিন্ন ফলমূলাদির আয়োজন করা হয় প্রতিটি গৃহে।

Dhaka University Institutional Repository

সারাদিন ব্যাপী গ্রামের সমবয়সীরা দলবেঁধে একে অন্যের বাড়ী গিয়ে পাঁচন, লাবন কড়াই, খৈই পাঁয়েস, মিষ্টি, সেমাই, ফলমূলাদি ইত্যাদি খেয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

এদিন পারিবারিক শশ্মান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পর সন্ধ্যায় পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করার নির্মিত্তে মোমবাতি এবং সুগন্ধি দ্রব্য প্রজ্জ্বলন করে। কালগত জ্ঞাতিদের অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করে ; অন্যান্যরা দলবেধে সর্বজনীন শশ্মানে গিয়ে তাদৃশভাবে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে।

৫.২. নববর্ষ

জগদ্বাসী বছরের প্রথম দিনকে সানন্দে বরণ করে নেয় এবং আনন্দ-উৎসবে দিনকে স্মরণীয় করে রাখে। সকল জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নববর্ষের ঐতিহাসিক মেলবন্ধন রয়েছে। এ উৎসব আমাদের জাতীয়জীবনের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব। ধর্মনিরপেক্ষ একমাত্র সর্বজনীন উৎসব। যা বাংলা তথা বাঙালির চিরন্তন চিরশ্বাশ্বত উৎসব। দিনটি সরকারী ছুটির দিন। তাই এদিনে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই শাশ্বত চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে। নববর্ষের একটি ইতিহাস আছে। বাংলা নববর্ষের প্রবর্তন হয় ষোড়শ শতকে মোগল সম্রাট আকবর দিল্লীর শাহীতজগতে সমাসীনকালে বাংলা নববর্ষের প্রবর্তন হয়। বাংলাদেশ ছিল তখন মোগল সম্রাটের করদ রাজ্য। পয়লা বৈশাখে (মৌসুমের প্রথম দিনে) বাঙালি প্রজাদের খাজনা আদায় করা হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক বছরের লেন-দেন ও লাভ-ক্ষতির হিসেব খোলার রীতি নববর্ষ উদ্‌যাপনের সঙ্গে অতি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এ নববর্ষ উদ্‌যাপনের সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ধর্মীয়-আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এ দিন সবাই নূতন কাপড় পরিধান করে সাধ্যমত পূজোপকরণ নিয়ে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে সম্মিলিতভাবে বুদ্ধকে পূজা করে। অতঃপর পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুরো পৃথিবীবাসীর মঙ্গল কামনা করা হয়, কামনা করা হয় শান্তির বারিবর্ষণে ধরণী হোক কলঙ্ক মুক্ত। এ দিন বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক সংগঠন শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন খেলাধূলা আয়োজন করে এবং আয়োজন করা হয় বৌদ্ধ মেলার। বাড়ীতে রান্না করা হয় সামর্থ্যানুযায়ী উন্নতমানের সুস্বাদু মুখরোচক খাবার[২১০]। এদিন সমবয়সীরা পরস্পর পরস্পরের হাত ও কোলাকুলি করে ভাবের আদান-প্রদান করে। ছোটজন বড়দের পা ধরে নমস্কার করে। এতে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সংহতি, ঐক্য ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে উঠে। এদিন পড়ুয়ারা খুব ভোরে উঠে পড়ে। এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ; এ দিনে পড়াশোনা করলে পুরোবছর ভালো পড়াশোনা হয় এবং কৃতিত্বের সাক্ষর রাখা সম্ভব। এদিন তারা কেউ কারো সাথে মন্দ কথা বলে না, ঝগড়া করে না। তাছাড়া এদিনে প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

বিহারে ধর্মীয়-আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সাথে গান-বাজনাসহ বিবিধ নির্মল ও নিষ্কুলষ আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়[২১১]।

৫.

সংখ্যাগরিষ্ট ধর্মের উৎসবই গোটাদেশে প্রভাব ফেলে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা এবং বৈত্তিক সাহায্যের উপর উৎসবের জাঁকজমকতা এবং গুরুত্ব অধিকাংশই নির্ভর করে। রাজনৈতিক পরিবর্তনে এদেশে ঈদই এদেশের প্রধান উৎসব। তাছাড়া বিত্তে চিত্তে অগ্রগামী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যায় স্বল্পতার এবং পৃষ্টপোষকতার অভাবে বৃহত্তর সমাজে কোনো রেখাপাত করে না। শুধুমাত্র চট্টগ্রামের লোকজন এই উৎসবের কিছুটা জাঁকজমক উপলব্ধি করে। তারপরও তারা তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে নিজেদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো যথাযথভাবে পালন করে আসছে। তাছাড়া এ জনগোষ্ঠী পূর্ণিয়ার মধ্যে ফাল্গুণী পূর্ণিমা, পূজার মধ্যে উপগুপ্ত অর্হৎ পূজা ও ভিক্ষুদের বিনয়কর্মমূলক অনুষ্ঠান (ওয়াইক) ও মহাস্থবির বরণ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। বুদ্ধজীবন, তাঁর শিষ্য এবং ধর্মীয় ভাবাদর্শ এ উৎসবের প্রেরণা। উৎসবে অপরিমেয় সুখ এবং আনন্দ লাভ হয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে উৎসবের গুরুত্ব রয়েছে। উৎসববিহীন সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতি নাই বললেও চলে। উৎসব ব্যতীত মানুষে-মানুষে মিলনের এত বড় তীর্থ আর কিছুতেই নেই। গ্রামে যখন উৎসব হয়, তখন সমগ্র গ্রাম আনন্দে ও পরম শুভবোধে একটি পরিবারের রূপ ধারণ করে। দেশব্যাপী যখন উৎসব হয় তখন সমগ্র দেশ ও জাতি বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতিতে নিজের স্বার্থকতা যেন খুজে পায়[২১২]। উৎসবমূখর পরিবেশে স্বমহিমায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদি পালন করে।

**প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তথ্যনির্দেশ**

১. এ উৎসবের দুটো দিক উল্লেখযোগ্য ; প্রথমত এ উৎসব হচ্ছে আনন্দ ও সুখের বহিঃপ্রকাশ, দ্বিতীয়ত এটার অপর নাম মিলনমেলা, জ্ঞাতি সম্মেলন ও স্বজন সমাবেশ।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংকলন* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭), পৃ. ২৫১-২৫২

৩. একই তিথিতে পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ এ পূর্ণিমাকে একইসময়ে পালন করে বলে এ পূর্ণিমার অন্য নাম বৌদ্ধ পূর্ণিমা বলে অনেকে অভিহিত করে। আসলে এটা অনুচিত ; বুদ্ধের জীবনকে নিয়েই বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদেরকে নিয়ে নয়।

৪. এ পূর্ণিমাকে পালিতে বেসাখ, সংস্কৃতে বৈশাখ, সিংহলী ভাষায় বেসখ এবং ইংরেজীতে (Fullmoonday of May) বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এটি রাজা শুদ্ধোধনের রাজধানী ছিল। শাক্যরা এখানে রাজত্ব করতেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর শাক্যরা কুশীনারায় এসে বুদ্ধের দেহাবশেষ'র অষ্টমাংশ নিয়ে তথায় স্তূপ নির্মাণ ও পূঁজা করেছিলেন।

৬. সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণের প্রায় দু'দশক পরে (প্রায় খৃ. পূর্ব ২৪৯) পূণ্যউদ্যান লুম্বিনী পরিদর্শনে আসেন। বুদ্ধ যেখানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সেখানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।

৭. অশ্বঘোষ, বুদ্ধ *চরিত*, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : নবপত্র প্রকাশ, ১৯৭৮), পৃ. ৮৮

৮. ইহা কুশীনগর নামেও পরিচিত

৯. লোক-দ্বেষ-মোহ তথা সর্ববিধ দুঃখের নিরোধ বা পরির্নিবৃত্তিই হলো পরিনির্বাণ

১০. Sir Ediwn Arnold, *Light of Asia* (London : Routledge & Kegan paul Ltd, 1964), P. 137

১১. অনেকে আবার এ দিনে বুদ্ধ প্রবর্তিত আর্য গৃহীউপোসথ অষ্টশীল পালন করে।

১২. যারা গৃহে বসবাস করত বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও শুশ্রুষাদি করে তাদেরকে দায়ক-দায়িকা বা উপাসক-উপাসিকা বলা হয়।

১৩. অনেকে এটাকে ছোট প্রবারণা বা ছোট ছাদাং বলে অভিহিত করে।

১৪. অশ্বঘোষ, বুদ্ধ*চরিত* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩। Sir Ediwn Arnold, *Light of Asia*., op.cit., P. 02

১৫. অশ্বঘোষ, বুদ্ধ*চরিত* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫৪। Sir Ediwn Arnold, *Light of Asia*. op.cit., P. 60

১৬. প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাষ্ট বোর্ড, ১৯৩৭), পৃ. ১৪-১৬। আবার এ দিনেই বুদ্ধ তুষিতস্বর্গে মাতাকে ধর্ম দেশনা করেছিলেন। ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১৬৩

১৭. ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিই ভাদ্র পূর্ণিমা।

১৮. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬-৪৫৯।

১৯. করুণা : এটা সাধারণ অর্থে মমতা নয়। গরীবের প্রতি ধনীর মমত্বও নয়, ধনবান লোক গরীবকে দান করে, রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি ডাক্তার মমতা ভরে সেবা অতঃপর ঔষধ প্রদান করে। এসব কিছুই করুণা নয়। বুদ্ধ তাঁর ধর্মে করুণাকে অনেক উর্দ্ধেস্থান দিয়েছেন। সন্তান-সন্ততি মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধিকে গ্রহণ করলে তার রক্ষণাবেক্ষণের যে প্রচেষ্টা তার নাম করুণা।

২০. এ সময় আবার অনেকেই বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুর জন্য আলাদাভাবে মধুদান করে থাকে।

২১. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬-৪৮৪

২২. *ধর্মপদ*, যমকবর্গ/০৬

২৩. এটার অন্যনাম আশ্বিনী পূর্ণিমা। অনেকে আবার এটাকে বড় ছাদাং বলে সম্বোধন করে থাকে।
খোন্দকার রিয়াজুল হক-এর মতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণতা পরিহার করার উৎসব প্রবারণা।
খোন্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলাদেশের উৎসব* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), ১৯৫৫, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

২৪. আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এ তিন মাস বর্ষাবাস যাপনের কাল। এ সময় গৃহীরা উপোসথশীল বা অষ্টনীতি পালন করে শীল-সমাধি চর্চার মাধ্যমে আত্মপ্রীতি উপলব্ধি করে।

২৫. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

*Journl of the Pali Text Society*, vol-1, Ed. T.W. Rhys Davids (London : 1882), P. 118-119

২৬. Robert Casesar Childers, *Dictionary of Pali Language* (kyoto : Rinsen Book Campany, 1987), P. 374

২৭. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

২৯. একধরনের পাতলা চিনা কাগজ নামে পরিচিত পাতলা কাগজ দ্বারা এক অভিনব বিশেষপদ্ধতিতে এ ফানুস তৈরী করা হয়। মোম বা তৈল মিশ্রিত সলিতার জ্বলন্ত ধোঁয়ায় ফানুসটি উপরে উঠে গিয়ে তারার মতো দেখায়। যা রাতের আকাশে বর্ণিল সৌন্দর্য বিরাজ করে।

৩০. এটি মুসলিম আচারদ্বারা প্রভাবিত।

৩১. ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, *মহাপরিনির্বাণ সুত্তং* (চট্টগ্রাম : ১৯৪১), পৃ. ৬৯

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৩. *ধর্মপদ*, মার্গবর্গ/২৭৭-২৭৯

৩৪. Dilip Kumar Barua, *Buddhist Melas or Fair of Bangladesh and thier role in the Society*, The Journal of Graduate School of Humanities (Japan Aich. Gakuin University, 2000) P. 246-270.

৩৫. Robert Casesar childers, op.cit., P. 535

৩৬. কায়-বাক্য-মন দ্বার এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযম করে উপোসথ দিবস অতিক্রম করা হয়।

৩৭. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, *মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম* (ঢাকা : ১৯৮৮) পৃ. ৬৬

৩৮. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

A.K. Majumder, Concise *History of Ancient India* (New Delhi : Munshiram Manaharal Publishers, 1983), P. 389

৩৯. Robert Casesar childers, op.cit., P. 535

৪০. Sutra Translation commitee of the U.S.A. & Canada, *The Seekers Glossary : Buddhism* (New york : 1998), P. 669

৪১. Robert Casesar childers, op.cit., P. 535

৪২. চারদিন : পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা চতুদর্শী, কৃষ্ণা অষ্টমী এবং শুক্ল অষ্টমী।

Dhaka University Institutional Repository

*Journl of the Pali Text Society*, vol-1, Ed. T.W. Rhys Davids (London : 1882), P. 116

৪৩. জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৬), পৃ. ৬১-৬২

৪৪. Dilip Kumar Barua, *Syncretism in Bangladeshi Buddhism* (Nagaya : 2000), P. 95

৪৫. *ধর্মপদ*, মার্গবর্গ/২৮৬

৪৬. আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিণী পূর্ণিমা পর্যন্ত এ তিনমাস নিত্য উপোসথ শীল পালনীয়। ধর্মপ্রাণ এ জনগোষ্ঠীর নর-নারীরা অতি আগ্রহের সাথে এ উপোসথ পালন করে।

৪৭. এটাকে কার্তিক মাস বা চীবর মাস বলা হয়।

৪৮. উপোসথ তিন প্রকার : যেমন –

ক. গোপাল উপোসথ : গোপালকের ন্যায় উপোসথ পালন করার নামই গোপাল উপোসথ। এখানে লোভ সহগত চিত্ত বিরাজমান।

খ. নিগ্রন্থ উপোসথ : নিগ্রন্থরা যে উপোসথ পালন করে তাই নিগ্রন্থ উপোসথ, এখানে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ চিত্ত বিরাজমান।

ঝ. আর্য উপোসথ : বিশুদ্ধি পদ্ধতি দ্বারা ক্লেশমুক্ত চিত্তের পরিশোধনই আর্য উপোসথ।

৪৯. প্রবারণা হতে তৎপরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য আর্য উপোসথ পালন করাকে পটিহারিক উপোসথ বলে।

৫০. সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত*, (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ১০৩

৫১. এটাকে উপোসথশীলও বলা যায়। ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবনগঠনের নির্মিত্তেই এ অষ্টশীলের প্রবর্তন করা হয়। যত বুদ্ধ অতীত হয়েছেন প্রত্যেক সম্বুদ্ধই এ আর্য উপোসথ প্রবর্তন করেছেন। বুদ্ধশূন্য কল্পেও এই উপোসথ সোমরস নামক উৎসবের দিনে সর্বসাধারণ উৎকৃষ্ট ব্রতরূপে পালন করা হতো।

অষ্টশীল : ক. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা ;

খ. চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা ;

গ. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকা ;

ঘ. মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকা ;

ঙ. মাদক এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য পানাহার থেকে বিরত থাকা ;

চ. বিকাল বেলা ভোজন থেকে বিরত থাকা ;

ছ. যে কোন নাচ, গান, বাদ্য, দর্শন ও শ্রবণ থেকে বিরত থাকা ;

জ. উচ্চাসনে শয়ন থেকে বিরত থাকা ।

সূত্র : *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৫২. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *উপোসথের সামাজিক গুরুত্ব*, অনোমা (নির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া), ২৪তম প্রবারণা সংখ্যা (২০০০), চট্টগ্রাম, পৃ. ৬৮-৬৯

৫৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত।

৫৪. তিনি যে বিহারে বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের সংকল্প নিয়ে অবস্থান করতেন।

৫৫. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৫৬. মাহবুবউল আলম, *আদি সংস্কৃতির ভিত* ; অনোমা (নির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া), ২২ তম সংখ্যা (১৯৯৮), চট্টগ্রাম, পৃ.

৫৭. এ সময় তারা দর্শন, শ্রবণ, আলাপ, পরিভোগ এবং কায়িক এ পঞ্চবিধ সংসর্গ পরিত্যাগ করে।

৫৮. যিনি গৃহস্থ কিংবা জনসাধারণের সংগে সংসৃষ্টভাবে অবস্থান করেন না।

৫৯. *ধর্মপদ*, ব্রাহ্মণবর্গ/৪০৪।

৬০. দর্শবিধ সংযোজন ; কাম, রূপ, অরূপ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃটি, শীলব্রত, বিচিকৎসা (সন্দেহ), উদ্বত্য ও অবিদ্যা।

৬১. কমপক্ষে চারজন ভিক্ষু আমন্ত্রণ করে তাদের সন্মুখে দানযোগ্য বস্তু রেখে সংঘ উদ্দেশ্যে যে দান করা হয় তা-ই সংঘদান।

৬২. কোনো ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে যে দান দেওয়া হয় তাই পুদ্গলিক দান।

৬৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৬৪. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহার্য দান থেকে শুরু করে সমস্ত দায় দায়িত্ব যারা গ্রহণ করে তাদেরকে দায়ক-দায়িকা বলা হয়।

৬৫. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৬৬. যেমন : মৃত্যুর ৭ দিনের মধ্যে, পনের দিনের মধ্যে ছয়মাসের মধ্যে এবং বছরের মধ্যে।

৬৭. বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণকে ত্রিশরণ বলা হয়। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রবর্তনের প্রথমদিকে এ ত্রিশরনের মাধ্যমে দীক্ষা দিতেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৩ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৮. এটা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর গৃহীবিনয় এবং নিত্যপাল্য। এ পঞ্চশীলগুলো হলো : ক. প্রাণিহত্য বিরতি খ. চুরি হতে বিরতি গ. কামাচার হতে বিরতি ঘ. মিথ্যা বাক্য হতে বিরতি এবং ঙ. সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য পান থেকে বিরতি।

৬৯. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলম্বর বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ৪৩-৪৭, সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

৭০. ধম্মজ্যোতি ও নীলম্বর বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-৩০

সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-২১

পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৭১

৭২. Fausabal, *Jataka*, voll-II (London : Pali Text Society, 1879), p. 33

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. ভিক্ষুশীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১) পৃ. ১৭১-১৮১

৭৪. ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ১৯৩

৭৫. ভিক্ষুসংঘের ব্যবহার্য আটটিদ্রব্য সংঘসমীপে দান করার মাধ্যমে চিত্তের সংকীর্ণতা, মলিনতা---- আবিলতা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয় ; তাই এগুলোর নাম অষ্টপরিস্কার।

৭৬. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ; *সদ্ধর্ম রত্নমালা* (কলিকাতা : ১৯৮৪), *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৬)

৭৭. বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘকে একসাথে বন্দনা করার নামই ত্রিরত্ন বন্দনা। বৌদ্ধমতে এগুলো এক একটি অমূল্য রত্ন বিশেষ।

৭৮. 'সংঘ' বলতে বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষুসংঘকে বোঝায়। এ সময় কৃত অপরাধের জন্য সংঘসমীপে ক্ষমা চাওয়া হয়।

৭৯. বুদ্ধের বাণী বলতে করণীয় মেত্তসুত্ত, অঙ্গুলিমাল সুত্ত মঙ্গল সুত্ত, আটানটিয় সুত্ত ইত্যাদিকে বোঝায়।

৮০. জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

৮১. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৮২. কায় দ্বার, বাক্য দ্বার এবং মনোদ্বারকে বোঝায়।

৮৩. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

৮৪. বৌদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী, ধারক-বাহক, সুপথে প্রতিপন্ন, খজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়পথ প্রতিপন্ন বৌদ্ধভিক্ষুকে বোঝায়।

৮৫. আশ্বিনী মাসের পূর্ণিমা তিথিকে প্রবারণা তিথি নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় শীল, সমাধি এবং ধ্যানের মাধ্যমে ভিক্ষুদের বর্ষামাসের সমাপ্তি হয়।

৮৬. কঠিনচীবরের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য বছরের অন্যান্য সময় এ দানোৎসব অনুষ্ঠিত হয় না।
'বাংলাদেশের উৎসব' নামক পুস্তিকায় কঠিনচীবর দানের মাহাত্মতা সম্পর্কে দেখা যায়, মানুষের হিত ও সুখের জন্য কাজ করে যাওয়ার উৎসাহ সৃষ্টি করার উৎসব কঠিনচীবর দান। মানবের কল্যাণসাধন এবং শান্তি স্থাপন এ উৎসবের আসল উদ্দেশ্য। খোন্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলাদেশের উৎসব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৮৭. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

৮৮. চারজন বৌদ্ধভিক্ষুর উপস্থিতিই বৌদ্ধধর্মে সংঘনামে অভিহিত।

৮৯. পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে এটা পুদ্গল নামে সমধিক পরিচিত।

৯০. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫

৯১. অতিরিক্ত কাপড় সংযুক্ত করে চীবরের ভূমি হতে প্রত্যেকটির লাইন সাদৃশ আইলগুলো একটু মোটা হয়।

৯২. মনুষ্য কেশদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রটি।

৯৩. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২

৯৪. হিংস্র জন্তুর কেশ দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রটি।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. এক ধরণের আকন্দ গাছের ছাল।

৯৬. বাঁশের আঁশ দ্বারা প্রস্তুত একধরনের চাটাই।

৯৭. ধর্মদীপ্তি ভিক্ষু সংকলিত, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯), পৃ. ৭৫

৯৮. কায়, বাক্য ও মনোদ্বার।

৯৯. এটি বাংলাদেশে তার প্রথম বর্ষাবাস বলে অনুমিত।

১০০. উদ্বৃত ; *অনোমা* (নির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া) ২৩তম সংখ্যা, (১৯৯৯), পৃ. ১০২

১০১. বারোটার পূর্বে এ সংঘদানের কার্য সমাপ্ত করতে হয়। কেননা ভিক্ষু সংঘরা দুপুর বারোটার পর আর আহার্য গ্রহণ করেন না।

১০২. এ জনগোষ্ঠীর লোকজন সাধারণত এটাকে পুরোহিত বলে। এ পুরোহিত শব্দটি হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ; আসলে এটি একটি ধর্মপূজা। কেননা ধর্মকে উদ্দেশ্য করে বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুকে এ ধর্মপূজা দেওয়া হয়। একটি বড় থালায় পাঁচ পোয়া চাল, পান-সুপারী, এক কাদি কলা, একটি নারিকেল, সুই-সুতা, পত্র পল্লব দ্বারা বন্ধনকৃত একটি মঙ্গল ঘট, একটি দিয়াশলাই, এক প্যাকেট মোমবাতি ও সুগন্ধি দ্রব্য এ ধর্মপূজার অর্ন্তগত। এ ধর্মপুজাগুলো ধর্মমঞ্চের সামনে সুন্দর আগামী ও পুণ্যলাভের আশায় সুন্দর করে সারিবদ্ধভাবে সুসজ্জিত করে রাখা হয়।

১০৩. এ সময় বিহার কমিটির সভাপতি/সম্পাদক সংঘপ্রধানকে বন্দনা করে ধর্মমঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানায়।

১০৪. গ্রামের শিশু-কিশোর শিল্পীরা এ ধর্মীয়সংগীতে অংশগ্রহণ করে।

১০৫. ত্রিপিটকের অর্ন্তগত কিছু কিছু অংশ ছন্দবদ্ধাকারে কোনো শ্রামণ বা কনিষ্ট ভিক্ষু আবৃত্তি করে। এ সময় সবাই মৌনতা অবলম্বন করে।

১০৬. বিহারে অবস্থারত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বিহারাধ্যক্ষ বলে সম্বোধন করা হয়।

১০৭. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা নং ৬৭।

১০৮. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা নং ৬৮।

১০৯. উপস্থিত সকল সুধীবৃন্দ ভিক্ষুর মুখে মুখে সমস্বরে উক্তিটি উচ্চারণ করে।

১১০. পূর্বোক্ত

১১১. এটি একটি বৌদ্ধবিনয় বিধান। যাকে পালিতে কম্মবাচা বলে।

১১২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩১), পৃ. ২৪-২৭

১১৩. তিনি ছিলেন বুদ্ধের অন্যতম চিকিৎসক বুদ্ধ সমকালীন সময়ে তাঁর মত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দ্বিতীয়জন ছিলেন না। মহাবর্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৮১

১১৪. পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্যে যিনি মহোপসিকা নামে পরিচিত। বৌদ্ধধর্মে তার অবদান অতুলনীয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩-৩৬৭ এবং ৩৮৩-৩৮৬

১১৬. শশ্মানে পরিত্যক্ত কাপড় অথবা আবর্জনা স্তূপ থেকে কুড়ানো কাপড়কে পাংশুকূলীয় কাপড় বলে অভিহিত করা হয়।

১১৭. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

১১৮. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

১১৯. পারমী ১০টি ; যথা : দানশীল, নৈষ্কম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী প্রজ্ঞা ও উপেক্ষা। কিন্তু ত্রি-ধারায় এ পারমী ৩০ টি। যেমন : পারমী ১০; উপপারমী ১০ টি; পারমার্থ ১০ টি। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দশপারমী, দশ উপপারমী, দশপরমার্থ, লোকাত্ম চর্যা, জ্ঞাতিচর্যা, বুদ্ধত্বচর্যা প্রভৃতি কর্ম পূর্ণ করেছিলেন। তিনি কর্মফলে কখনো রাজা কখনো বা প্রজা, দেবতা, ব্রহ্মা বণিক উচ্চবংশীয় যুবক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র আবার কোনো কোনো জন্মে কর্মফলে হস্তী, অশ্ব, ময়ূর, মৃগ, রাজহংস প্রভৃতি রূপে জন্মলাভ করেন। কিন্তু প্রত্যেক জন্মেই কোনো না কোনো পারমী পূর্ণ করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

১২০. যাকে সচরাচর সাধন চিত্তে অবলম্বন বলা হয়।

১২১. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

১২২. অষ্টশত চৌষটি কোটি বৎসরকে এক কল্প বলা হয়। সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ১০৫

১২৩. এক যোজন সমান চার ক্রোশ অর্থাৎ একক্রোশ সমান দুই মাইলের কিছু বেশী।

১২৪. ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনির্বাণ সুত্তং*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

১২৫. *The Seeker Glossary : Buddhism*, op.cit., P. 669

১২৬. Robert Casesar Childer's op.cit., P. 185

১২৭. T.W. Rhys Davids and Stede, *Pali English Dictionary* (New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1921), P. 187

১২৮. যেমন : ককসন্ধ, কোনাগমন, কাশ্যপ ও গৌতম

১২৯. দ্রষ্টব্য : সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

১৩০. সুমন, রেবত ও শোভিত বুদ্ধ

১৩১. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত।

১৩২. ধর্মপাল ভিক্ষু সংকলিত, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (কলিকাতা : ১৯৮৪), পৃ. ১৮৪

১৩৩. সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়* (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৩১

১৩৪. সাক্ষাৎকার : আনন্দ বড়ুয়া (প্রয়াত যামিনী রঞ্জন বড়ুয়ার একমাত্র সন্তান) বয়স : ৫০, গ্রাম : ইছাখালি, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

১৩৫. বিশুদ্ধাচার স্থবির, *সীবলী ব্রতকথা* (কলিকাতা : জিনরত্ন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট, ২০০০) পৃ. ক

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. গ

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১৩৮. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

১৩৯. T.W. Rhys Davids and Williaum Stede, *Pali English Dictionary*, op.cit., P. 426

১৪০. সোনাইবালা বড়ুয়া, বয়স : ৮০, পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম, ০১.১০.২০০৬

১৪১. 'সূত্র' হলো গদ্যাশ্রিত বিবরণমূলক বুদ্ধবচন, এ অংশে বুদ্ধ কার সাথে, কোন স্থানে, কোন সময়ে এবং কেন দেশনা করেছিলেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৪২. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা : ১৩৮০), পৃ. ১১৬

১৪৩. সুকোমল চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

১৪৪. ধর্মপাল ভিক্ষু সম্পাদিত, *সদ্ধর্ম রত্নমালা* (কলিকাতা : ১৯৮৪), পৃ. ৯৪

১৪৫. সাক্ষাৎকার : ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত।

১৪৬. *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ১৮০-১৮৩

১৪৭. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

১৪৮. সুকোমল চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

১৪৯. ধর্মাধার মহাস্থবির, অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ১৯৮৭), পৃ. ১৫৯

১৫০. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দকপাঠো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-২১

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৭

পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৯

১৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-৩০

পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৬৪

১৫৩. M. Leon. Feer, *Samyutta Nikaya*, vol- V, Ed. (London, Pali Text Society, 1976), P. 63.

১৫৪. মহাকাশ্যপ স্থবির : তিনি ছিলেন বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য। তিনিই প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগনীতির মাধ্যমে বুদ্ধ শাসনের ধর্মবিনয় রক্ষা করেছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মহাকাশ্যপের নামও চিরস্মরণীয়।

১৫৫. মহামৌদগলায়ন স্থবির : কোলিত গ্রামের মহাকুলের পুত্র বলে তিনি কোলিত নামে পরিচিত। আবার মোগ্গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে মোগ্গল্লায়ণ নামে খ্যাত। তিনি বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রবাক ছিলেন।

১৫৬. উদ্ধৃত, জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

১৫৭. *Fausaball*, Jataka, voll. II, PTS, op.cit., P. 33

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৪), পৃ. ২৩০-২৩৭

১৫৯. ভিক্ষু শীলভদ্র অনুদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১), পৃ. ১৭১-১৮১

১৬০. চারদিকপাল রাজা : যক্ষ সেনা, গন্ধর্ব সেনা, কুম্ভন্ড সেনা এবং নাগ সেনা।

১৬১. প্রিয়দশী মহাস্থবির, বয়স : ৭৫, পশ্চিম আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম, ০১.১০.২০০৬
সুমন কান্তি বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ০২.১২.২০০৬

১৬২. উদ্ধৃত, জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য*, পূর্বোক্ত

১৬৩. বিশুদ্ধাচার স্থবির : *সীবলী ব্রতকথা* (কলিকাতা : ২০০০), পৃ. ঞ-১

১৬৪. দ্রষ্টব্য ; ১০২ নং পাদটীকা

১৬৫. চাল আহারের প্রতীক এবং বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন।

১৬৬. কলা, ডাব বা নারিকেল হচ্ছে সুস্থ স্বাস্থ্যের প্রতীক।

১৬৭. সুই-সুতা হলো আত্ম বিশ্বাসের প্রতীক।

১৬৮. পেন্সিল, খাতা এবং কলম জ্ঞানের প্রতীক।

১৬৯. পানি দীর্ঘ জীবনের প্রতীক।

১৭০. এটি আমের একটি ছোট ডাল, কলা গাছের কচি ডগা, বিভিন্ন ফুল ও ফলের কচি ডাল দিয়ে সাজানো হয়। এগুলো হচ্ছে চিরসবুজের প্রতীক অর্থাৎ চিরযুবার প্রতীক।

১৭১. মোমবাতি : আলোর প্রতীক, আর সুগন্ধিদ্রব্য : শীল সৌরভের প্রতীক।

১৭২. ৬৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৩. ৬৮ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪. *সদ্ধর্ম সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

১৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

১৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

১৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

১৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

১৭৯. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত।

১৮০. ধ্যান দুই প্রকার যেমন : শমথ ধ্যান এবং বিদর্শন ধ্যান।

১৮১. উদ্ধৃত, ভিক্ষু জে প্রজ্ঞাবংশ, *বিদর্শন ভাবনায় প্রজ্ঞাধূর* (চট্টগ্রাম : আর ফুরসো জ্ঞানরত্ন প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ১০২

১৮২. Rhys Davids and Williaum Stede, *Pali English Dictionary*, op.cit., P. 503

১৮৩. *ধর্মপদ*, ভিক্ষুবর্গ/ ৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪. কায় দ্বার, বাক্য দ্বার এবং মনোদ্বার।

১৮৫. বোধিপাল শ্রামণ, বিদর্শন পূর্ণশান্তি ও সমাধানসূত্র (চট্টগ্রাম : ১৯৯৯), পৃ. ৩

১৮৬. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান।

১৮৭. চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন

১৮৮. শয়ন, গমন, দাঁড়ান ও উপবেশন

১৮৯. বিভিন্ন গ্রামের বিদর্শন ধ্যানীদের থেকে এ তথ্য সংগৃহীত।

১৯০. Francis Story, *Demenion of Buddhist Thought,* vol-III (Kandy : Kandy Buddhist Publication Society, 1976), p. 336

১৯১. নামরূপ : এটা মূলত দেহ ও মনের অন্যনাম। নামরূপকে বিশ্লেষণ করলে পাঁচটি স্বন্ধ পাওয়া যায়। যেমন ; রূপ : যার রূপ আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশ আছে তাইরূপ। সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কস্তু এই রূপের অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে।

বেদনা : বেদনার অর্থ ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এর ভিত্তিতে বিশেষবস্তু সমন্ধে উপলব্ধি হয়। ইংরেজীতো যাকে Sense data বলে বেদনা তাই বোঝায়।

সংজ্ঞা : ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই সংজ্ঞা। ইংরেজী পরিভাষায় তাকে Perception বলে।

সংস্কার : ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বোঝায়।

বিজ্ঞান : চেতনা বা মনকে বোঝায়।

১৯২. ধর্মপদ, ভিক্ষুবর্গ/ ৩৬০।

১৯৩. S. Dhammika, *Good Question, Good Answer* (Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1991), P. 43

১৯৪. Dr. Mehm Tin Mon, *The Essence of Buddha Abhidhamma* (Yangoon : Mya Mon Yadanay Publication, 1995), P. 356

১৯৫. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৫৪), পৃ. ১৫৯-৭৮

১৯৬. *মধ্যম নিকায়*, স্মৃতি প্রস্থানসূত্র

১৯৭. আনন্দমিত্র মহাথের, *উপাসনা* (পশ্চিমবঙ্গ : সদ্ধর্ম প্রচার পরিষদ, ১৯৮৯), পৃ. ৪২

১৯৮. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্তনিপাত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮, (সচ্চং হবে মধুরতং রসানাং)

১৯৯. *ধর্মপদ*, মার্গবর্গ/ ২৭৩

২০০. *ধর্মপদ*, বুদ্ধবর্গ/১৮৩

২০১. ক. সাক্ষাৎকার : শিমুল বড়ুয়া, অধ্যাপক, গবেষক, সংগঠক, চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

খ. সাক্ষাৎকার : পলাশ বড়ুয়া, শিক্ষক বাঁশখালী আলাওল কলেজ, ০২.১০.২০০৬

২০২. তথ্যসূত্র, কল্যাণ বড়ুয়া, বয়স : ৫৯, শিক্ষক (অব) রাউজান, চট্টগ্রাম। এমেলি বড়ুয়া, বয়স-৫৩, ডাক+থানা: রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৬.১২.২০০৬

*Dhaka University Institutional Repository*

২০৩. সাক্ষাৎকার : প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, বয়স-৬০, গ্রাম-ঘাটচেক, থানা-রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম, ০২.০৬.২০০৬

২০৪. কেউ কেউ ভাবনাকারীদের সকালের আহার, কেউ দুপুরের আহার আবার কেউ বৈকালিক পানীয়, কেউ কেউ কায়িক পরিশ্রম করে। তাছাড়া অনেকে আবার বিভিন্ন অংকের টাকা দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

২০৫. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

২০৬. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

২০৭. বাংলা সনের চৈত্রমাসের শেষদিন ৩০ চৈত্রসংক্রান্তি নামে পরিচিত।

২০৮. এলাকাভেদে এটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

২০৯. সাক্ষাৎকার : অনিল কান্তি বড়ুয়া, বয়স : ৬৫, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, রাউজান, চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

২১০. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

২১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

২১২. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলাদেশের* উৎসব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# বিবাহ

### ১. ভূমিকা

বিবাহ সভ্যসমাজে অন্যান্য ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা[১]। বিবাহের উদ্দেশ্য একাধিক ; তন্মধ্যে বৈধসন্তান জন্মদানই অন্যতম। আর এ কারণেই দম্পত্তির একই গৃহে বসবাস, যৌন সম্ভোগ, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি হয়েছে ; রচিত হয়েছে সামাজিক এবং আইনগত বিধান[২]। বিবাহ শুধু আমাদের সমাজে নয়, সকলদেশে এবং সকলসমাজে মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়ে দুটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের সূচনা করে তার সঙ্গে অন্যকোনো সামাজিক বন্ধনের তুলনা হয় না[৩]। এ বিষয়ে উল্লেখ আছে ;

> The Wedding is the recognition of the significance of marriage to societies and to individual through the public ceremony usually accompanying it. Such a Ceremony indicates the Societies control, the pageantry impress upon the couple the importance of commitment they undertaking. [৪]

আবার K. Sri-Dhammananda এ বিষয়ে বলেন, Marriage is a Partnership in which two individuals of oppsite sex but equal worth as human being choose to live together[৫].

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-এর ন্যায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহও আচার সর্বস্ব। অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানই সনাতনী ধারায় পরিচালিত। তবে এ জনগোষ্ঠীর বিবাহ অনুষ্ঠানে এমন কিছু আচার প্রতিপালন করা হয়, বিশ্বাস পরিপোষণ করা হয় যা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বিবাহে পরিলক্ষিত হয় না।

### ১.১. বিবাহ-সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ লোকাচারিক আচার-অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে তাদের রয়েছে নানারকম বিশ্বাস ও প্রথাগত বদ্ধমূল ধারণা। যেমন[৬];

Dhaka University Institutional Repository

ক. অবিবাহিত মেয়ের সামনের দাঁত ফাঁকা থাকলে বিবাহের পর তার স্বামী মারা যায় ;

খ. অবিবাহিত যুবতী মেয়ে পা টেনে ভাত খেতে বসলে তার দূরদেশে বিয়ে হয় ;

গ. অবিবাহিত যুবক-যুবতীর গায়ে প্রজাপতি বসলে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয় ;

ঘ. অবিবাহিত যুবতী লুচারাং[৭] ফুল বুদ্ধ সমীপে দান করলে শীঘ্রই বিয়ে হয় ;

ঙ. খরম-পা-যুবতী মেয়ের বিয়ের পর স্বামী মারা যায়।

তাছাড়া এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের পর কন্যাকে বাবার বাড়ি আসা-যাওয়ার ব্যাপারে বহুবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন : নতুন বৌয়ের ভাদ্রমাসে নাইওর যাওয়া অনুচিত। বিয়ের পর বছর নতুন বউ হয় শ্বশুর বাড়ি নতুবা বাবার বাড়ি থাকবে। অর্থাৎ বছরের শেষ মাস বাবার বাড়ি থাকলে বাবার বাড়িতে এবং শ্বশুর বাড়িতে থাকলে শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করা আবশ্যক। উভয় দিকে অবস্থান করলে পরিবারে অশান্তি এবং অভাব নেমে আসে। তাদের বিশ্বাস ; লোকবিশ্বাস শাস্ত্রের নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। শাস্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে এগুলো লোকমানবের বিশ্বাসে পরিণতি হয়। এ সমস্ত বিশ্বাসের কোনো কালাকাল পরিলক্ষিত হয় না ; ধর্ম এবং কালের ঊর্দ্ধে এ বিশ্বাস।

হিন্দু ধর্মের মতে, আষাঢ় মাসে বিবাহ হলে কন্যা ধান্যাদি ভোগরহিতা, শ্রাবণ মাসে মৃত বৎসা, ভাদ্র মাসে বেশ্যা, আশ্বিন মাসে মৃত্যু, কার্তিক মাসে রোগমুক্ত, পৌষ মাসে মৃতবৎসা ও দীর্ঘকাল স্বামী বিরহিণী এবং চৈত্র মাসে বিবাহে কন্যা মদোন্মত্তা হয় ; তদ্ভিন্ন মাসে বিবাহ হলে কন্যা পতিব্রতা ও ঐশ্বর্যযুক্তা হয়ে থাকে[৮]। তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রের কোথাও এ বিষয়ে তেমন কোনো ব্যাখ্য পাওয়া যায় না। তবে এ জনগোষ্ঠীর কতকগুলো বিধি নিষেধ উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞাতি-বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। যেমন[৯] --

ক. বর্ষাবাসের সময় (আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত ৩ মাস) বিয়ে হতে পারে না ;

খ. পূর্ণিমার দিনে বিয়ে হতে পারে না ;

গ. পৌষ মাসে বিয়ে হতে পারে না ;

ঘ. চৈত্র মাসে বিয়ে হতে পারে না ;

ঙ. জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় না ;

চ. কার্তিক মাসে বিয়ে হয় না ;

ছ. জন্মদিনে বিয়ে হতে পারে না ;

জ. অশৌচ বর্ষে বিয়ে হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিল্লিখিত লোকধারণায় নিহিত আছে ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক, মাঙ্গলিক, শুভবোধ ও চিন্ত াচেতনা। এগুলোর আবার অন্য কারণও দেখা যায়। বর্ষাবাসের মধ্যে বিয়ে না হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় ; এ সময় বৌদ্ধভিক্ষুরা শীল-সমাধি চর্চা করে। ফলে তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মাঙ্গলিককর্ম সম্পাদন করতে পারে না। পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং গৃহীরা সবাই ধর্ম-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত ; তাই এ সময় বিয়ে হয় না। পৌষ মাস গৃহে ফসল তোলার সময়। এ সময় সবাই পৌষের ফসল তোলা নিয়ে ব্যস্ত বিধায় এ সময় বিয়ে হয় না। চৈত্র মাস খরার মাস এবং পাওনা টাকা আদায়ের মাস বলে বিয়ে হয় না। অমঙ্গলের চিরাচরিত আশঙ্কায় জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় না। কার্তিক মাস অভাব-অনটনের মাস তাই এ মাসে বিয়ে হয় না। অশান্তির আবির্ভাব হতে পারে এ আশঙ্কায় জন্মদিনে ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় না। অশৌচবর্ষে বিয়ে একেবারে নিষিদ্ধ।

## ২. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবাহপ্রথা ভিন্ন ভিন্ন। বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ প্রথায় সামাজিক গুরুত্বটাই সবচেয়ে বেশী। হরেক রকম লোকাচারে এ জনগোষ্ঠীর বিবাহ প্রথা সমৃদ্ধ। এ জনগোষ্ঠীর বিবাহ পদ্ধতির স্বরূপকে বলা হয় আবাহ বিবাহ[১০]। এখানে পুত্রের পরিণয়কে 'আবাহ' এবং কন্যার পরিণয়কে 'বিবাহ' বলে। আ+√বহ্+ন এর সমন্বয়ে আবহ। যার শব্দগত অর্থ সর্বপ্রথম পুরুষের মিলনের আগ্রহ প্রকাশকে বোঝায়। বি+√বহ্+ন এর সমন্বয়ে বিবাহ, যা স্পষ্টভাবে মেয়ের মিলনকে বোঝায়। তবে এখানে মেয়ের মিলন গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান। এ প্রসঙ্গে S.C. Sarker-এর উক্তিটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ; Marriage was her normal inevitable condition[১১]. এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, বিবাহের পূর্বে তাদেরকে (বর-কনে) ধর্মীয়-সামাজিক বিধিবিধানুসারে সংস্কার[১২] পালন করতে হয়।

### ২.১. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন হিন্দু জনগোষ্ঠীর অনুরূপ। এক্ষেত্রে উভয়ের কুষ্ঠি, রূপ-গুণ সর্বোপরি বংশ মর্যাদা বিচার করা হয়। অনেকে আবার ব্রাহ্মণ কর্তৃক গণনার মাধ্যমে বিয়ের সময় দিনক্ষণ নির্ধারিত করে। এতে জ্যোতিবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান। পাত্রী নির্বাচনে পাত্রের কোন ভূমিকা থাকে না। তবে আজকাল অনেকেই পাত্রী না দেখে বিয়ে করতে নারাজ। পাত্রী পছন্দ হলে বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আত্মীয় স্বজনরা সম্পন্ন করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২. সামাজিক শর্ত

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলা অত্যাবশক। সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে এ জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্য বিবাহের কার্য সম্পন্ন করে না। বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধগুলো নিম্নরূপ[১৩]:

ক. একই গোত্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে হয় না ;

খ. সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না ;

গ. একই পিতার ঔরসজাত ভিন্ন ভিন্ন মাতার সন্তানদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না ;

ঘ. বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না ;

ঙ. কাকাতো ভাই-বোন এবং জ্যাঠাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না ;

ছ. ভাইপো-পিসির মধ্যে বিবাহ হতে পারে না ;

জ. মামা-ভাগিনীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে না ;

ঝ. মাসি-বোনপোর মধ্যে বিবাহ হতে পারে না ;

ঞ. বিমাতা বিবাহ নিষিদ্ধ ;

ট. স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নিকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

এ জনগোষ্ঠীর বিবাহ মূলত একটি সামাজিক বিধি মোতাবেক সম্পাদিত বন্ধন। যেখানে উভয়েই অসীম মায়া মমতায় এ বন্ধনটাকে অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর। তাদের মধ্যে অজাচার বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেউ যদি এরকম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তারা সমাজ থেকে এমনিতেই আলাদা হয়ে যায়। সমাজ কর্তৃক নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হয়, সমাজ তাদের ধিক্কার জানায়।

৩. বিবাহের প্রকারভেদ

প্রাকবৌদ্ধযুগে অষ্টবিধ[১৪] উপায়ে পতি নির্বাচন করা হতো। আবার পালি সাহিত্যে তিন প্রকার বিবাহের উল্লেখ দৃষ্টনীয়[১৫]। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ মূলত স্থিরকৃত সামাজিক বিবাহ। এ রকম বিবাহ প্রথায় বিশেষভাবে বর-কন্যা উভয়পক্ষের অভিভাবকরা এক হয়ে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে গান্ধর্ব বিবাহের কথাও উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের বিয়ে সচরাচর মা-বাবার অনুমতি ব্যতিরেকে প্রণয় ও আবেগতাড়িত কারণে ধর্মীয়-সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে সম্পন্ন করে। তারা দু'ভাবে[১৬] এ বিবাহ কর্ম সম্পন্ন করে। যথা -

ক. দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে ;

Dhaka University Institutional Repository

খ. ধর্মীয় স্থানকে সাক্ষী করে ;

এ রকম বিবাহ প্রথা শুধু বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নয় বরং সকলদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান। এরকম বিবাহ প্রথাকে সহজেই এ জনগোষ্ঠী মানতে রাজি না হলেও পরবর্তীকালের কোন এক সময়ে মেনে নেয়।

স্থিরকৃত (Arranged marriage) বিবাহ-ই বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম্য মুখ্য বিবাহ প্রথা। স্থিরকৃত বিবাহ দু'ভাগে[১৭] বিভক্ত ---

নামন্ত : যে বিবাহ বরের বাড়িতে সম্পন্ন হয়ে থাকে তাকে নামন্ত বিবাহ বলে।

চলন্ত : যে বিবাহ কনের বাড়িতে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তাকে চলন্ত বিবাহ বলে।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলন্ত বিবাহ খুবই কম। সবাই নামন্ত বিবাহে আগ্রহী। নামন্ত বিবাহ বাপ- দাদার বাস্তু-ভিটায় নিষ্পন্ন হয় বলে এ বিবাহের প্রতি সবার আগ্রহ বেশী। অতি জাঁকজমক পূর্ণভাবে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

## ৪. অলংকার চড়ানি[১৮]

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অলংকার চড়ানি বহুল পরিচিত একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পর শুভ দিনক্ষণ নির্ধারণ করে বরপক্ষ সমাজের সুহৃদ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ কনের বাড়ীতে গিয়ে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে তার নাম অলংকার চড়ানি। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি প্রাক-বিবাহ স্বীকৃত সামাজিক অনুষ্ঠান বলে। এ সময় তারা সামর্থ্যানুযায়ী স্বর্ণালংকার, শঙ্খ, সিদুঁর, নতুন বস্ত্রাদি এবং সাজ-সজ্জার উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যায়। তৎসঙ্গে মিষ্টি[১৮] আবশ্যক। হিন্দু এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায় এ জনগোষ্ঠীও পাত্রীকে আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, আংটি উর্বরতাবাদের প্রতীক।

বরপক্ষ কনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে প্রবেশকালে গৃহের ভিতর থেকে ভেসে আসে বামাকণ্ঠের উলুধ্বনি। এ সময়ে তারা (বরপক্ষ) গৃহদ্বারে সজ্জিত কলস থেকে মাথায় উপর পানি ছিটিয়ে বরপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বরপক্ষের প্রবেশের পূর্বেই কনেপক্ষের সম্মানীয় লোকজন স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট থাকে। এ সময় উভয়পক্ষ একে অপরের সাথে অভিবাদন ও কুশলবার্তা বিনিময় এবং হালকা নাস্তা দ্বারা আপ্যায়িত হয়। তারপর সজ্জিত পানের থালা[২০] দ্বারা নতুন অতিথিদের সম্মান জানানো হয়। তারপর কনেপক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তি বরপক্ষের মনোনয়ন প্রাপ্ত সুধীজনকে জিজ্ঞাসা করেন এভাবে ---

'মহোদয়ের 'এ' স্থানে আগমনের হেতু ব্যক্ত করলে আমরা খুশী হই'।

Dhaka University Institutional Repository

তখন বরপক্ষের মনোনীত ব্যক্তি বলেন, আমরা 'ক' থানার অর্ন্তগত 'গ' গ্রামনিবাসী 'চ' এর দ্বিতীয় পুত্রের জন্য আপনাদের 'ম' এর কন্যা কল্যানীয়া 'স'-এর পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

কনেপক্ষ তখন তিনবার সাধুবাদের মাধ্যমে তাঁদের এহেন উক্তিকে সম্মতি জানান। ততক্ষণে বরপক্ষের সমুখে দু'খানা থালা আনীত হয়। তাতে অলংকার সাজ-সজ্জায় উপকরণাদি স্থাপিত হলে তা অন্দর মহলে প্রেরিত হয়। ইতোমধ্যে অতিথিদের ভোজনের আয়োজন ব্যবস্থা করা হয়।

আহারান্তে কনেকে নববধূরূপে বরপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। কনে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে তাঁর জন্য নির্ধারিত সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হয়। এ সময় বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনেকে একটি স্বর্ণের আংটি পরিয়ে দেয়[২১]। অলংকার চড়ানির পর কনে বাগদত্তা হয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনের জোড়া লাগানোর সূত্রপাত হয় বিধায় এর অন্যনামে জোড়াগাঁথা। অলংকার চড়ানির দিন এ জোড়াগাঁথা হয় বলে এর স্থানীয় নাম 'জোড়ানী ভাত' অনুষ্ঠান। যাকে অনেকে আবার আশীর্বাদ প্রদান অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করে। এ সময় বরপক্ষ কনের বাড়ী থেকে অষ্টদূর্বা নিয়ে এসে জোয়ারের সময় তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। যাকে স্থানীয়ভাবে গদ/গৎ বলা হয়।

### ৫. সামাজিক প্রস্তুতি

বিবাহের দিনক্ষণ সমাসন্ন হলে উভয়পক্ষ সমাজীদের ডেকে বিবাহের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করে[২২]। এদিন ক্ষমতানুসারে গ্রামের কিছু কিছু সক্ষম ব্যক্তিকে কাজ বণ্টন করে দেয়া হয়। এটি এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ আলোচনা ব্যতীত গ্রামের কোন ব্যক্তি ঐ বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দেয় না। এ রীতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। বিয়ের ২/৩ দিন আগে পাড়া প্রতিবেশী গ্রামবাসীদেরকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। বিশেষ আত্মীয়দের পান-সুপারী প্রদানের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করতে হয়। আবার জামাই/জামাতা নিমন্ত্রণের সময় তার হাতে সম্মানী দিতে হয় এবং তাকে পাঁচজন[২৩] নিয়ে আসার জন্য আহবান করা হয়। বিয়ে উপলক্ষে জামাতাদের একটা উপহারও নির্দিষ্ট থাকে।

### ৬. তৈলাভিষিক্তকরণের বস্তুগত উপকরণ

প্রাক্ বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে তৈলাভিষিক্তকরণ প্রধান এবং অন্যতম লোকাচারিক অনুষ্ঠান[২৪]। বস্তুগত উপকরণ সহযোগে বিয়ের দিন কিংবা ২/৩ দিন আগে বর ও কনের বাড়িতে আলাদাভাবে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে বর ও কনের মুখে এক খিলি পান মুখে নেয়। একটি নুতন চিত্রায়িত কূলায়[২৫] পাঁচ পোঁয়া ধান, পাঁচটি কাঁচা কলা, পাঁচটি কাঁচা কচি পেয়ারা, একগুচ্ছ দূর্বা ঘাস, কাঁচা হলুদ, নোড়া (গিল), একটি পাথর,

Dhaka University Institutional Repository

একটি মাটির তৈল প্রদীপ এবং সপল্লব মঙ্গল ঘট[২৬] স্থাপিত করা হয়। তৈলাভিষেকে কূলায় উপর্যুক্ত উপকরণ সম্পর্কে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস নিম্নরূপ[২৭] :

| | |
|---|---|
| ধান | : সমৃদ্ধির প্রতীক ধান বেঁচে থাকার অবলম্বন। সর্বোপরি বহু সন্তানের প্রতীক। |
| দূর্বা ঘাস | : দূর্বা যেমন নিজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অক্ষয় অমররূপে বিরাজ করে। সে রূপ নবদম্পতিদের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সন্তানেরা অমর অজর হয়ে থাকে। তাই দূর্বাঘাস দীর্ঘজীবনের প্রতীক। |
| কাঁচা কলা | : তারুণ্য এবং বহু সন্তানের প্রতীক। |
| নোড়া (গিলা) | : গম্ভীর স্বভাবের প্রতীক। |
| পাথর | : দৃঢ় চিত্ততার প্রতীক। |
| মাটির তৈল প্রদীপ | : আশা ও প্রজ্ঞার প্রতীক। |
| সপল্লব মঙ্গলঘট | : দীর্ঘায়ূর, সুন্দর ও সমৃদ্ধময় সুখী পরিবারের প্রতীক। |
| পান ও সুপারী | : সজীবতা ও অনেক সন্তানের প্রতীক। |

মোটকথা ধান, দূর্বাঘাস, কাঁচাকলা, কাঁচা পেয়ারা, পানসুপারী ইত্যাদি বংশবৃদ্ধির প্রতীক। মাছের ডিম থেকে যেমন অগণিত পোনা জন্মে ঠিক একইভাবে উল্লিখিত বস্তুগুলোই বংশবৃদ্ধিরই বস্তুগত উপকরণ। ধান, পান, সুপারীর ফলন হয় বেশী। দূর্বা বংশ বিস্তারে পারদর্শী। এখানে এগুলোর ব্যবহার লৌকিক। যার প্রায়োগিক ব্যবহারে ভাবী নবদম্পক্তির অনাগত জীবনকে সফল ও ফলবান হিসেবে দেখে ; এখানে তারই কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নয় শুধু এদেশের সকল ধর্ম ও বর্ণের লোকবিশ্বাস এটি।

### ৬.১. তৈলাভিষিক্ত অনুষ্ঠান

সাধারণত বর-কনের ভ্রাতৃস্থানীয় ছোট পাঁচজন ভাইবোন এবং আয়স্তীরা তৈলাভিষিক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তারা দু'হাতে দূর্বাঘাসের গুচ্ছ নিয়ে প্রথমে ভ্রাতৃস্থানীয় ছোট ভাইবোন এবং পরে ঐ আয়স্তীরা নির্ধারিত সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট বর-কনেকে সাতবার করে বরণ করে। এ সময় মা কিংবা মাতৃস্থানীয় কেউ পাশে বসে তৈল প্রদীপ স্পর্শ করে বর-কনের মস্তক স্পর্শ করে[২৮]। এভাবে এককভাবে বরণ করার পর আবার সকলে করাঙ্গুলি যুক্ত করে বর-কনেকে (নিজ নিজ বাড়ীতে) বরণ করে। প্রতিবার বরণের পর বর কিংবা কনেকে আসন থেকে নামানো হয় এবং আসনে তোলা হয়[২৯]। তৈলাভিষেকের পর উভয়ের মা

Dhaka University Institutional Repository

বর-কনেকে কোলে বসিয়ে গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস, হলুদ ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও চর্মরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ তৈলাভিষেকে বসার আগে বর-কনে নিজ নিজ বৌদ্ধবিহারে গিয়ে বুদ্ধ সমীপে সুগন্ধিদ্রব্য ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের দ্বারা পূজাকরত বৌদ্ধভিক্ষুর মাধ্যমে ত্রিশরণে অধিষ্ঠিত হয়। তারপর পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করা হয়। তৈলাভিষিক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে উপস্থিত সবাইকে মিষ্টি, পান ও সুপারী দ্বারা আপ্যায়ন করে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম সমাজেও এ রীতির প্রচলন দৃষ্টনীয়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ধারণা, তৈলাভিষেকের পর অপদেবতা বা অপশক্তি তাদের গায়ে আশ্রয় নেয়। তাই বর-কনেকে আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক অশুভ নজর থেকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য ভিক্ষুর সূত্রপূত সুতা ডান হাতে বেঁধে দেয়া হয়। তাছাড়া এ সময় উভয়ের গলায় এক ধরনের আঁচুলী[৩০] ও বামহস্তে একগাছ লৌহবলয় ও কোমরে নাপিতের দেয়া একটি তামার দাবন (দর্পন) দেওয়া হয়। উল্লিখিত বস্তুগত উপকরণের ব্যবহার প্রসঙ্গে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস নিম্নরূপ[৩১] :

ক. সূত্রপুত সুতার মধ্যে বুদ্ধদেশিতবাণী বিরাজমান, অনন্ত বুদ্ধবাণীর প্রভাবে কোনো অপশক্তি বর-কনের শরীরে আশ্রয় নেয় না ;

খ. তামার দাবন সাহসিকতার প্রতীক।

বিয়ে বাড়ীতে সমবেত হয়ে এ সময় পাড়া প্রতিবেশী রমনীরা সমস্বরে এক ধরনের গান গায়। যেটাকে মেয়েলী গীত[৩২] বলে অভিহিত করা হয়। এ মেয়েলীগীত গাইবার প্রথা বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজেও প্রচলন আছে।

অলংকার চড়ানির পর থেকে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নারীরা সিঁথিতে সিদুঁর এবং হাতে শঙ্খ পরিধান করে। সিঁদুর এ জনগোষ্ঠীর অবৈধব্য অথবা সধবার প্রতীক। বিয়ের সময় সিঁথিতে যে মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া হয়, তা স্বামীর জীবদ্দশায় মুছে ফেলা বারণ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী অবিধবা (অইহবা>অইহঅ>অইয়ো বা>আয়ো) বা ত্রয়ো যে দুটি উপকরণ মাঙ্গলিক বিয়ের সময় ব্যবহার করে থাকে তা হলো শঙ্খ ও সিঁদুর। তাছাড়া লৌহের বালা ব্যবহারও করা হয়। এ জনগোষ্ঠীর কাছে এখনো সিঁদুর ও শাঁখা 'আয়তি বা ত্রয়োতির' অর্থাৎ সধবার পরিচায়ক। আয়তি কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রসারিত হওয়া, বিস্তার প্রভৃতি। তাছাড়া সৌভাগ্য, বংশ-পুত্র ইত্যাদিও বোঝায়। যে নারী সৌভাগ্য রূপস্বামী বর্তমান এবং তিনি বিবাহের ফলে স্বামীর বংশবৃদ্ধির অধিকার পেয়েছেন তার অবস্থাসূচক শব্দ আয়তি বা এয়োতি এবং তিনি নিজে অবিধবা

Dhaka University Institutional Repository

বা আয়ো (ত্রয়ো)। সিঁদুর, শাঁখা ইত্যাদি স্বামীর বেঁচে থাকার ও মঙ্গলের প্রতীক। লাল সিঁদুরের সাথে ঋতুস্রাবের সম্পর্কের স্থিতি বিদ্যমান, ঋতুবতী নারীরাই গর্ভধারণে সক্ষম। রক্তের প্রতীক সিঁদুরকে এ জনগোষ্ঠীর বিবাহিত নারীরা সন্তানের সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করে। এ দুটি দ্রব্যও লৌকিক উর্বরতা ও আচারবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মূলত এগুলোর প্রকৃত উৎস যাদুবিদ্যা। কেননা সমপর্যায়ের যাদুবিদ্যার (Sympathetic magic) প্রভাবে সমধর্মী বস্তুর গুণ পাত্র থেকে পাত্রান্তরে সঞ্চারিত হয়। এ জনগোষ্ঠীর বিবাহের মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে বন্ধ্যা নারী এবং বিধবা নারীর উপস্থিতি অবাঞ্ছিত[৩৩]। এটাকে ট্যাবু বলা হয়। তারা উৎপাদনে অক্ষম বলেই তাদের উপস্থিতি অমঙ্গলজনক।

সিঁথিতে সিদুঁর ও শঙ্খ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অত্যাবশকীয় সম্পর্কে কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। তাছাড়া এ বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। বিশেষত স্বামীকে বশ করার উদ্দেশে শঙ্খ পরার রীতি শিব মঙ্গলে[৩৪] উল্লিখিত হয়েছে। ধারণা করা হয়, এগুলো হিন্দুধর্মীয় আচার ও সংস্কৃতিদ্বারা প্রভাবিত। এ লৌকিক চিহ্নগুলো উর্বরতা আচারের সঙ্গে জড়িত। সকল সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ সমস্ত আচার পালন করে।

### ৭. তোরণ নির্মাণ

বিবাহ উপলক্ষে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর-কনে উভয়ের গৃহে তোরণ নির্মাণ করে। সাধারণত গরীবরা পাতা দিয়ে এবং ধনীজনরা কাপড়ের তোরণ নির্মাণ করে। তবে তোরণের দুপাশে দু'টা কলাগাছ রোপন এবং একটি মঙ্গলঘট প্রতিস্থাপন করে। কলাগাছ লক্ষীদেবীর প্রতীক। সুতরাং ধারণা করা হয়, এটাও হিন্দু ধর্মীয় ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত।

### ৮. বরযাত্রীর কনে গৃহে যাত্রা

বিয়ের দিন কিংবা আগের দিন বরপক্ষ শুভ দিনক্ষণ দেখে ঢোল-বাদ্য-বাজনা ও বেয়ারাসহ পালকি কনের পিত্রালয়ে যাত্রা শুরু করে। সমারোহ জৌলুষ বাড়ানোর জন্য যাত্রাপথে নানারকম আতসবাজি পোড়ানো হয়[৩৫]। বরযাত্রীরা কনের পিত্রালয়ের নিকটবর্তী হলে কন্যাপক্ষ সরাসরি ভিতরে আহবান না করে স্থানীয় বৌদ্ধবিহারে সাময়িকভাবে বসার সুযোগ করে দেয়। পরে যথারীতি সবিনয় আহবান ও অর্ভ্যথনা করে বরযাত্রীদের কনের বাড়িতে স্বাগত জানানো হয়।

### ৮.১. বরযাত্রী বরণ

পুরনারীদের হুলুধ্বনির মধ্যে বরযাত্রীরা কনের পিত্রালয়ে প্রবেশ করে। তারা তাদের জন্য দক্ষিণ ও পূর্ব পংক্তিতে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে উপবেশন করে। আবার কনেপক্ষ উত্তর ও পশ্চিম পংক্তিতে বরপক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

মুখোমুখি হয়ে উপবেশন করে[৩৬]। অতঃপর বরপক্ষের আনীত বস্ত্রালংকার ও সাজ-সজ্জার উপকরণগুলো যথাযথ থালায় স্থাপন করে আসনে উপবিষ্ট উভয়পক্ষের সম্মানিত সকল ব্যক্তিবর্গকে দেখানোর পর কনে পক্ষের একজন প্রবীণ ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত সকলের অনুমোদনের পর এগুলো অন্দরে মহিলাদের নিকট প্রেরিত হয়। অন্দরে যখন কনে সাজাবার প্রস্তুতি চলে তখন বাহিরে সর্বসমক্ষে বরকর্তা এবং কনেকর্তার মধ্যে মৌখিকভাবে কনে দান ও প্রতিগ্রহণের পালা বা পর্ব চলে। তারা পরস্পর আলিঙ্গন করে এবং উপবিষ্ট হয়ে সজ্জিত পানের থালা বদলাবদলি করে এবং একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেয়। উভয়পক্ষের সুধীজনদের মিষ্টি সহযোগে চা আপ্যায়নের পর বরপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

৮.২. কন্যা বিদায়

আহারান্তে আবার চা দ্বারা বরযাত্রীদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। এ দিকে কনেকে যথারীতি নববধূরূপে সজ্জিত করে বরের পিতা কিংবা মনোনীত অভিভাবককে গৃহাভ্যন্তরে কনের পিতা বা অভিভাবক কন্যাকে সমর্পন করে।

যথাসময়ে বেয়ারা পালকি নিয়ে গৃহদ্বারে উপস্থিত। পালকিতে তোলার আগে কনের মা কনেকে কোলে নিয়ে দুধভাত খাইয়ে থাকে[৩৭]। একদিকে আজন্মের পালিত স্নেহের কন্যাকে বিদায় দিতে গৃহাভ্যন্তরে মা এবং সমবেত সকলের নয়নে করুণার প্রস্রবণ আর অন্যদিকে চলে জয়-ঢাক-সুরতান লহরী। এ অবস্থায় কনেকে পালকিতে তুলে দেওয়া হয়। কনে নিয়ে বরযাত্রী রওনা হবার প্রাক্কালে একজন বালক কনের বাড়ির চালের একগুচ্ছ শন অথবা অল্প পরিমাণ বারন্দার বা উঠানের মাটি বরের বাড়িতে নিয়ে আসে[৩৮]। ধারণ করা হয়, এগুলো দু'পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাসূত্রে মিলিত হবার প্রতীক।

কনের বাড়ীর থেকে বরের মাতার জন্য পান-সুপারী ও মিষ্টি পাঠানো হয়। কনের জন্য নুতন গামছায় বেঁধে দেওয়া হয় চিড়াকলা। কনে বিয়ের আগ পর্যন্ত বরের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতে পারে না। কলা ও চিড়া তার একমাত্র খাদ্য[৩৯]।

৮.৩. বধূবরণ

কনে (নববধূ) নিয়ে বরযাত্রীরা বরের গৃহে ফিরে এলে পুরস্ত্রীরা হুলুধ্বনির মাধ্যমে নববধুকে স্বাগত জানায়। তখন গৃহদ্বারে যথারীতি তৈল প্রদীপসহ মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। অতঃপর বরের মা বোন ও অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজন একে একে সবাই চিনি খাইয়ে তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস, এ সময় নববধূকে চিনি খাওয়ালে সুভাষী হয়।

৯. লোকঐতিহ্য[৪০]

এ জনগোষ্ঠীর বিবাহ উপলক্ষে কিছু কিছু লোক আচরণ পালন করে। যেমনথ--

৯.১. গৃহদেবতার পূজা : বিয়ের দিন সকালে আতপ চালের ভাত, কলার, যাগু প্রভৃতি দিয়ে গৃহদেবতার পূজা করা হয়। পৌরহিত্য করেন কোন প্রবীণ গৃহী।

৯.২. সিধা দেওয়া : গণক, ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা প্রভৃতিকে বিয়ের দিন সিধা দেওয়ার নিয়ম এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে। আহারের সকল উপকরণ থেকে শুরু করে পাত্রভেদে নূতন কাপড়, টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী এ সিধার অর্ন্তগত থাকে।

৯.৩. চুলামানা সিধা : বিয়ের যাবতীয় রান্নাদি যেন মুখরোচক হয় এবং এ উপলক্ষে যারা রান্না করে তাদের প্রধানকে রান্নার সকলসামগ্রী অর্পন করা হয়। এ সিধা পাবার পর তারা চুলার আগুন ধরিয়ে দিয়ে রান্নার কাজ শুরু করে।

৯.৪. কলসী ভরণ : বউ নিয়ে আসলে বরের ভগ্নিপতি অন্যান্যরা বাদ্য-বাজনাসহ পুস্করিণী থেকে বিয়ের জন্য নির্ধারিত মঙ্গলঘট ভরিয়ে পানি আনা হয়।

৯.৫. সম্মানী প্রদান : বউ নিয়ে আসার পর বাদকদল বরের গৃহে হালকা খাবার দ্বারা আপ্যায়িত হয়। বরগৃহ ত্যাগ প্রাক্কালে তাদের নবদম্পত্তির মঙ্গলকামনায় অতিরিক্ত সম্মানি প্রদান করা হয়।

৯.৬. পালকি ধরা : কনেকে যখন শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় তখন বোন জামাই এবং ছোট ভাই-বোন একং অন্যান্যরা তার সঙ্গে বরের পিত্রালয়ে আগমন করে।

৯.৬. মঙ্গলসূত্র শ্রবণ : নবদম্পতির সংসারধর্মে পদার্পণ উপলক্ষে সুখ-সমৃদ্ধি-কল্যাণ তথা ইহলৌকিক পারলৌকিক সুখের প্রত্যাশায় বৌদ্ধভিক্ষু দ্বারা মঙ্গলসূত্র শোনানো হয়। এ সময় তাদের উভয়ের পার্শ্বে উভয়ের ভগ্নিপতি উপস্থিত থাকে। কনে থাকে বরের বামপাশে।

প্রথমে উপস্থিত সবাই ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলসূত্র[৪১], করণীর মৈত্রীসুত্র[৪২], রতনসূত্র[৪৩], আটানাটিয় সূত্র[৪৪] ইত্যাদি আবৃত্তি করা হয়। গৃহীরা এগুলো পরিত্রাণ সূত্র হিসেবে মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ রকম লোকঐতিহ্য পালনের কোনোরূপ ভিত্তি নেই বললেও চলে। তথাপি লৌকিকবিশ্বাস স্থাপন এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির ভয়ে এ সমস্ত লোকঐতিহ্য পালন করে। এগুলো অনেকটা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত বলে অনুমিত।

১০. আবাহ-বিবাহ বাসরের মূলপর্ব

বিয়ের মূলানুষ্ঠানের নাম আবাহ-বিবাহ বাসর। বরপক্ষ এবং কনেপক্ষ নির্ধারিত আসনে উপবেশন করে। এ সময় বর-কনেকে কোলে[৪৫] করে নিয়ে এসে পূর্ব কিংবা পশ্চিম মুখী করে সুসজ্জিত আসনে দাঁড় করা হয়। কনেকে রাখা হয় বরের বাম পার্শ্বে[৪৬]। বরকে মুকুট এবং কনেকে একধরনের তাজ পরানো হয়। এ আসনে বর-কনের ভগ্নীপতিরা উপস্থিত থেকে তাদের পরিচায়কের কাজ সম্পন্ন করে।

কনেপক্ষের নির্বাচিত ও বরপক্ষের অনুমোদিত কোনো গৃহী মন্ত্রদাতার[৪৭] মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তিনি যথারীতি গায়ের চাদর উত্তরীর-এর ন্যায় ভাঁজ করে কাঁধে দিয়ে উভয়ের সামনে দাঁড়ায়। তার সামনে সপল্লব মঙ্গলঘট[৪৮] নূতন গামাছা দিয়ে আবৃত থাকে। মন্ত্রদাতা সকলের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রদান শুরু করে। পালি সাহিত্য কিংবা বর্হিভূত সাহিত্যের কোথাও বৌদ্ধ বিবাহের নিয়মরীতি সম্পর্কে উল্লেখ নাই তবে যৎ সামান্যই বিশাখার বিবাহে দেখা যায়।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে বিশাখার বিবাহ কাহিনী একটি মাইলপলক হিসাবে কাজ করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে মন্ত্রদাতা যে সমস্ত মন্ত্র আবৃত্তি করে তার সবই পালি ভাষায় রচিত। যা অধুনাতন সময়ে রচিত অনেকই সংকলানাকারে রচনা করে প্রকাশ করেছেন[৪৯]।

প্রথমে মন্ত্রদাতা ত্রিরত্ন বন্দনা, সত্যক্রিয়া দ্বারা বিবাহ বাসরে তার উপদ্রব বন্ধ করে। পরে বিবাহ বাসরের উপবিষ্ট বর-কনের উপদ্রব বন্ধ করে। পূতপবিত্র[৫০] হয়ে মন্ত্রদাতা যে ত্রিরত্ন বন্দনা করে তা নিম্নরূপ----

১. যো সন্নিসিন্নো বরবোধি মূলে,
মারং সসেনং মহতি বিজেত্বা।
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্ত ঞানো,
লোকোত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

২. অট্ঠঙ্গিকো অরিযপথো জনানং,
মোক্খপ্পবেসো উজুকো'ব মগগো।
ধম্মো অযং সন্তিকরো পণীতো,

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ানিকো তং পণমামি ধম্মং।

৩. সংঘো বিসুদ্ধো বর দকখিনেয্য,

সন্তিন্দ্রিযো সব্বমলপ্পহীনো।

গুণেহি'নেকেহি সমিদ্ধিপ্পত্তো,

অনাসবো তং পণমা'মি সংঘং।

নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা মন্ত্রদাতা[৫১] নিজের উপদ্রব বন্ধ করে। যেমন ; অম্হাক খো পন ভগবা দীপঙ্করপাদমূলতো পট্ঠায পঠমং দান পারমী, দুতিযং সীল পারমী, ততিযং নেক্খম্ম পারমী, চতুত্থং পঞ্ঞা পারমী, পঞ্চমং বিরিয পারমী, ছট্ঠং খন্তি পারমী, সত্তমং সচ্চ পারমী, অটঠমং অধিট্ঠান পারমী, নবমং মেত্তা পারমী, দসমং উপেক্খা পারমী'তি দস পারমিযো দস উপপারমিযো, দস পরমত্থ পারমিযো'তি সমতিংস পারমিযো পূরেসি। তাসং পারমীনং অনুভাবেন মযং সব্বানি উপদ্দবানি বিনাসমেন্ত।

তাছাড়া বর-কনের উপদ্রব বন্ধ করার সময় নিম্নোক্ত[৫২] মন্ত্রটি আবৃত্তি করে এভাবে ----

পুরথিমায দিসায, দক্খিনায দিসায, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায দিসায, পুরথিমায় অনুদসায়, দক্খিনায অনুদিসায, পচ্ছিমায অনুদিসায, উত্তরায অনুদিসায, হেট্ঠিমায় দিসায, উপরিমায দিসায, সব্বে সত্তা, সব্বে পানা, সব্বেভূতা, সব্বেপুগ্গলা, সব্বে অত্তভাব পরিযাপন্ন, সব্বে ইত্থিযো, সব্বে পুরিসা, সব্বে অরিযা, সবের অনরিয়া, সব্বে মনুস্সা, সব্বে অমনুস্সা, সব্বে বিনিপাতিকা, অবেরা হেন্তে, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত, দুক্খা মুঞ্চন্ত যথালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মসকা। ইমিনা মেত্তানুভাবেন জযম্পতিনো সব্বে উপদ্দবা বিনাসমেন্তু।

তারপর তিনি গুরু প্রণামও বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ নিয়ে থাকে এভাবে --

পঠমং দ্বাত্তিংস মহাপুরিসলক্খণ-সম্পন্ন অসীতি অনুব্যঞ্জন পতিমণ্ডিতং, নিরোধ সমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্নং বিয ভগবন্তং অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং নমামি, দুতিযং আচরিযং নমামি, ততিযং তিরতনং সরণ গচ্ছামি।

তারপর বিবাহবাসরের বর-কনের আসন রক্ষা করা হয় নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা ;

যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ

যো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো

পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং

বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধম্মানুভাবেন বিনাসমেন্ত

সংঘানুভাবেন বিনাসমেন্ত

এই মন্ত্রটি সমাপনান্তে পিতা কর্তৃক বা কনের মনোনীত অভিভাবক কর্তৃক বরের হাতে কনেকে সমর্পন করা হয়। এ সময় মন্ত্রদাতার সাথে সমস্বরে কনের অভিভাবক নিম্নোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করে ;

তুযহং দীঘরতং হিতায সুখায ইমং কঞ্ঞং গণ্হাহি[৫৩]।

উল্লেখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করার পর বরের হস্তে কন্যার হস্ত অর্পন করা। তখন তিনি (মন্ত্রদাতা) বলেন ;

দ্বিহত্থং সম্বন্ধং বিয তুমহেপি সব্বকালং সমগ্গভাবেন বসথ অঞ্ঞমঞ্ঞং দেব দেবী নং বিয সংবাসো চ হোতু।

তারপর শুরু হয় বর-কনের পদসংযুক্ত করা। এ সময় মন্ত্র দাতা উচ্চারণ করে ;

ইদ পাদদ্বযং সম্বন্ধকরণং তুমহাকং যাবজ্জীবনং

অঞ্ঞমঞ্ঞং গিহীধামং সমাদানায চেব কুসলকম্মং

করণায় চ অবিসংযোগস্স পচ্চযো হোতু।

তারপর মন্ত্রদাতা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের কাছে নবদম্পত্তির মঙ্গল কামনায় করে এভাবে ;

নত্থিতে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধোতে সরণং বরং ;

বুদ্ধতেজেন লোকস্স তাণালেণা পরাযণা ;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতুতে জযমঙ্গল।

নত্থিতে সরণং অঞ্ঞং ধম্মো তে সরণং বরং ;

ধম্মতেজেন লোকস্স তাণালেণা পরাযণা ;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতুতে জযমঙ্গলং।

নত্থিতে সরণং অঞ্ঞং সংঘো তে সরণং বরং ;

সংঘতেজেন লোকস্স তাণালেণা পরাযণা ;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জীব মঙ্গলং।

অতঃপর বর-কনের সন্মুখে বেদীর উপরিস্থিত পানিপূর্ণ কলসীদ্বয়ের পল্লব মন্ত্রদাতা নিজের ডান দিকের কলসীর পল্লব নিম্নমুখী করে বামদিকের কলসীতে এবং বামদিকে কলসীর পল্লব নিম্নমুখী করে ডানদিকের কলসীতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করার পর উভয় পল্লবস্থিত পানি বর-কনের মস্তকের

Dhaka University Institutional Repository

উপর ছিটিয়ে দেয়। এরূপভাবে কলসী ও পল্লবসহ উভয় হস্ত পরিবর্তন করে পূর্বের ন্যায় নিম্নোক্ত মন্ত্র এক একবার আবৃত্তি করে বর-কনের মস্তকের উপর পল্লবস্থিত পানি সাতবার করে ছিটিয়ে দেয়। যেমন --

সিদ্ধিরাজস্স সাসনে সিদ্ধিকিচ্চঞ্চ কারতো,
সিদ্ধিভাবং সমিজ্ঝন্ত সিদ্ধিলাভো ভবন্তুতে।
জয়ন্তো বোধিযামূলে সক্যান নন্দিবড্ঢনে।
এবমেব জযো হোতু জয়স্সু জয়মঙ্গল।
অপরাজিতা পল্লঙ্কে সীসে পুথু বিমুক্খলে।
অভিসেকে সম্বুদ্ধানং অগ্গপ্পত্তো পমোদতি ;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং।
জয় জয় মঙ্গলং বোধিপল্লঙ্কংব
জয় জয় মঙ্গলং ধম্মচক্কং'ব
জয় জয় মঙ্গলং সব্বগুণপাণিনং'ব
জয় জয় মঙ্গলং ঞানদিত্তিং'ব
জয় জয় মঙ্গলং সাধু সুপ্পতিটঠিতানং'ব

এ মন্ত্র উচ্চারণ শেষ হবার পর মন্ত্রদাতা নিম্নোক্ত মন্ত্র আবৃত্তির পর সম্মুখস্থিত ডানদিকের বরের ঘটের পল্লব হতে একটি পত্র বরের মস্তকের মুকুটের উপর এবং বামদিকের কনের ঘটের পল্লব হতে একটি পত্র কনের মস্তকের উপর তাজ-এ রেখে দিয়ে আর্শীবাদ প্রদান করে এভাবে ----

সমসীলা সমসদ্ধা ভবন্ত উভযো সদা,
আয়ু বন্নং সুখং বলং পটিভানং ভবন্তুতে।
ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্ত সব্বদেবতা
সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোথি ভযন্তুতে
সব্ব ধম্মানুভাবেন সদা সোথি ভবন্তুতে
সব্ব সংঘানুভাবেন সদা সোথি ভবন্তুতে।

বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতোই। এ জনগোষ্ঠীর বিবাহের সকল আচার-অনুষ্ঠানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ----

মেয়েলি আচার : বাড়ির, পাড়া এবং প্রতিবেশী সধবা মেয়ে দ্বারা এ আচার সম্পাদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় আচার : বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা সম্পাদিত এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে পবিত্রীকরণ করা। সংসার ধর্মে বিজয়ী-বিজয়িনী হওয়া। সর্বোপরি নির্মল, নিষ্কুলষ, বিশুদ্ধ জীবনযাপন করা।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে মেয়েলি আচার এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে কোনো রকম ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে বর-কনের উভয়েরই অমঙ্গল ঘটবে এরূপ বিশ্বাস বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর। এ সমস্ত বিশ্বাস সামাজিক চাপে আসেনি, বরং এসেছে মনের গভীর চেতনা থেকে। যা পরবর্তীকালে বংশ পরম্পরায় সবাই লৌকিকভাবে পালন পরিপালন করে আসছে।

১০.১. উপদেশ পর্ব

গৃহী মন্ত্রদাতা কর্তৃক মন্ত্র শেষ হবার পর আবাহ-বিবাহ বাসরেও উভয়পক্ষের প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা বিবাহস্তোর উপদেশ-এর আয়োজন করে। এ সম্পর্কিত উপদেশ পালি সাহিত্যেও আছে। যুগের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি যাই হোক না কেন পত্নী হবে পতির পরম বন্ধু এবং কল্যাণমিত্র। যারা কখনো ভোগ বিলাসিতায় দিবারাত্রিকে আবিল করে রাখে না। পরস্পরের কল্যাণ কামনায় প্রেম পবিত্রতায় পতি-পত্নীর সম্পর্ক মধুর হয়। সেখানে পত্নী-পতির হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণমিত্র বটে। এ সম্পর্ককে সুমধুর ও গভীর করে তোলার জন্য বুদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর করণীর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন ; পাঁচ প্রকারে[৫৫] পত্নী পতির কর্তব্য পালন করবে --

ক. সুচারুরূপে গৃহকর্ম সম্পাদন করা ;

খ. পরিজন ও অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি সর্বদা সম্ভাষণ করা ;

গ. নিজ স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা ;

ঘ. স্বামীর সঞ্চিত ধন অপচয় না করে যথাযথভাবে রক্ষা করা ;

চ. সর্বকাজে আলস্যহীন হওয়া।

অনুরূপভাবে বিবাহিতজীবনে পতি পাঁচ[৫৬] প্রকারে পতি পত্নীর কর্তব্য সম্পাদন অধিকার যত্নবান হবেন--

ক. স্ত্রীর প্রতি সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করা ;

খ. কখনো স্ত্রীকে অশোভনীয় আচরণ না করা ;

গ. নিজ পত্নীতে সন্তুষ্টি থাকা, অর্থাৎ পর দ্বারা গমন না করা ;

ঘ. স্ত্রীকে যথাযথ কর্তৃত্ব প্রদান করা ;

চ. সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীকে বস্ত্রালংকার প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া চারটি কারণে[৫৭] বিবাহের পর সংসারের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে নারীরা সহায়ক হয়। যেমন ;

ক. স্বামীগৃহে গৃহস্থ কার্যে সুদক্ষ হওয়া, আলস্য পরায়ণ না হওয়া, উচিত-অনুচিত কর্মবিচারে সুনিপনা হওয়া।

খ. দাস-দাসী, কর্মচারীর কর্ম পরিদর্শন করা, তাদের কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়েছে কি না খোঁজ খবর নেয়া, তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা ; তাদের শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী কাজ বন্টন করা, অসুস্থ হলে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা ; এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে খাদ্য-ভোজ্য বিতরণ করা।

গ. স্বামীর সঞ্চিত ধন স্বর্ণালংকার রক্ষা করা ; ধূর্তা চোর স্বভাবা না হওয়া এবং সর্বোপরি বিনাশিনী না হওয়া।

ঘ. স্বামীর ইচ্ছাবিরোধী কাজ না করা।

স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তার মেয়ে বিশাখাকে ১০টি[৫৮] মহামূল্যবান উপদেশ দিয়ে ছিলেন, যা নারীসমাজকে সংসার বিজয়িনী হতে যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সেগুলো নিম্নরূপ ----

ক. ঘরের আগুন বাইরে নিও না, অর্থাৎ ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ কর না।

খ. বাইরের আগুন ঘরে এনো না, অর্থাৎ বাইরের কথা ঘরে প্রকাশ কর না।

গ. যে দিয়ে থাকে, তাকে দিও, অর্থাৎ যে ঋণ নিয়ে ফেরৎ দেয় তাকে দিও।

ঘ. যে দেয় না, তাকে দিও না, অর্থাৎ যে ঋণ নিয়ে পুনরায় ফেরৎ দেয় না, তাকেও দিও না।

ঙ. যে দেয় না, তাকে দিও, অর্থাৎ যদি কোন দরিদ্র জ্ঞাতি ঋণ নিয়ে পুনরায় ফেরৎ দেয় না, তাঁকে দিও।

চ. সুখে বসবে, অর্থাৎ এমন স্থানে বসবে যেখানে গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয়।

ছ. সুখে আহার করবে, অর্থাৎ পরিবারের গুরুজনদের আহারের পর আহার করবে।

জ. সুখে শয়ন করবে, অর্থাৎ শশুড়-শাশুড়ি ও স্বামীর শয়নের পর শয়ন করবে।

ঝ. অগ্নির পরিচর্যা করবে, অর্থাৎ শশুড়-শাশুড়ি, স্বামী ও বড়দের পরিচর্যা করবে।

ঞ. গৃহ দেবতার ভক্তি করবে, অর্থাৎ পরিবরের গুরুজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

বুদ্ধ বিবাহবন্ধন সম্পর্কে আরো বলেছিলেন ; যে বিবাহবন্ধন ভালবাসার দুটি হৃদয়কে গ্রহিত করে নশ্বর মানবের পক্ষে ঐ বন্ধনই চরম সুখ। কিন্তু এটা অপেক্ষাও উচ্চতর সুখ আছে ; তা হলো সত্যের আলিঙ্গন।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু যে সত্যকে আলিঙ্গন করে মৃত্যু তাকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। সত্যের সঙ্গে পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস কর। যেসব স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ বশত অনন্তমিলনে আবদ্ধ হবার জন্য ইচ্ছাপোষণ করে, তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। স্ত্রী-স্বামীর প্রতি আস্থাবান হয়ে তার সেবা করবে। স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সম্মান করবে এবং ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে। তবেই বিবাহবন্ধন পবিত্র ও মঙ্গলময় হয়। তাদের সন্তান-সন্ততিও পিতা-মাতার ন্যায় সুখ উৎপাদন করবে[৫৯]। বিবাহ মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আনে। এ বিবাহত্তোর বন্ধন চিরস্থায়ীর লক্ষ্যে ঐকান্তিক স্নেহ মায়া-মমতায় একে অপরের প্রতি অনুগত থাকা বাঞ্চনীয়।

ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে উভয়ের শ্রদ্ধাশীল থাকা একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে উভয়ে-উভয়ের প্রতি সংসারজীবনে বিশ্বস্ত হতে হয়। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর কাজ থেকে নির্বিষ্ঠতা, পারিবারিক দায়িত্ব, কর্তব্যপালন, সত্যবাদিতা, মিতব্যয়িতা, সন্তান-সন্ততি দায়িত্ব পালন ইত্যাদি আশা করে। স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে বন্ধু সুলভ আচরণ, নিরাপত্তা, ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা, সতত উত্তমসঙ্গী মনে করা, নৈতিকসমর্থন ইত্যাদি কামনা করে। এ বিষয়ে মনুর উক্তিটিও প্রাণিধাণযোগ্য ;

যে পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ; নিশ্চয়ই সে কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে[৬০]।

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে বর-কনেকে উপদেশ দেওয়া একটি সামাজিক প্রথা হিসেবে দেখা হয়। এখানে তারা সংসারজীবনে প্রবেশের মূলশিক্ষা পায়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ উপদেশপর্ব ছাড়া নিথর ও স্থবির হয়ে পড়ে।

মন্ত্রপাঠ ও উপদেশপর্ব শেষ হলে কনে-বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতিবারই হাটুঁভেঙ্গে বসে বরকে প্রণাম করে[৬১]। মালাবদল শেষ করে বরের বাম হস্তের কনিষ্ট আঙ্গুলের সঙ্গে কনের ডান হস্তের কনিষ্ট আঙ্গুল সংযুক্ত করে বর সামনে থেকে আস্তে আস্তে কনেকে নিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করে। সেখানেই তাদের শুভ দৃষ্টি হয়।

### ১০.২. বর-কনের আহার গ্রহণ

বিয়ের দিন তৈলাভিষিক্তকরণের আগে থেকেই বর-কনে উপবাস করে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে উভয়েই এক সঙ্গে আহার করে। এ সময় বর-কনেকে আলাদা আলাদা করে সকল প্রকার তরিতরকারী

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে একসাথে খেতে দেয়। সবাই একসাথে বন্ধু বান্ধব নিয়ে বসে আহার করে বলেই এর অন্যনাম সহমেলা।

### ১১. কাক স্নান

বিবাহের পরবর্তী দিবসে বর-কনেকে কাক স্নান করা হয়। বরের ভগ্নিপতিরা বরকে এবং বরের বউদিরা কনেকে স্নান করিয়ে থাকে। তখন ভগ্নিপতিরা বর-কনেকে একটি উত্তরীয় দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে রেখে মোটা অংকের টাকা দাবী করে। বরের বড় ভাই-বোনদের হস্তক্ষেপে তারা উভয়ে এ অবস্থা থেকে রেহায় পায়।

কাক স্নানের পর নবদম্পত্তি একে একে গুরুজনদের প্রণাম করে। এখানে একটি বিশেষত হলো বরের মায়ের আর্শীবাদ প্রদান। আর্শীবাদটি নিম্নরূপ ;

আচার-বিচারে, জ্ঞানে-গুণে হালকা, নাতিতে-পুতিতে, ধন-জনে ভারী[৬২]। অনুরূপভাবে উপস্থিত অন্যান্য বর্ষীবয়সী আত্মীয়-স্বজনরাও এরূপ আর্শীবাদ প্রদান করে।

### ১২. বরের শ্বশুরালয়ে যাত্রা ও দ্বিরাগমন

সুবিধানুসারে বিয়ের পরদিন কিংবা তারপরের দিন বর-নববধূসহ সবান্ধব শ্বশুর বাড়িতে যায়। শ্বশুর বাড়িতে যাবার আগে বড়-কনে-বরের নিকট আত্মীয়কর্তৃক হালকা চা নাস্তা দ্বারা আপ্যায়িত হয়। বিয়ের পর প্রথমবার বর শ্বশুর বাড়িতে পর্দাপন করা হয় বলে একে ভূমিস্পর্শন বলা হয়[৬৩]। নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলের বৌদ্ধরা এটাকে আরাইয়া বলে[৬৪]। প্রথম বর এর শ্বশুর বাড়িতে আগমন উপলক্ষে কনে বাড়িতে বিয়ের আমেজ সৃষ্টি হয়। এ সময় বর দেখার জন্য শিশু-কিশোরদের মধ্যে একধরনের একটা কৃত্রিম প্রতিযোগিতা হয়। এ সময় বর এবং তার বন্ধু-বান্ধবদেরকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। বিয়ের পর কনে দ্বিতীয়বার পিতার গৃহ থেকে স্বামী গৃহে গমন করার নাম দ্বিরাগমন।

### ১২.১. কনের বাবার বাড়ি প্রত্যাবর্তন

বিয়ের সাতদিন[৬৪] পর কনের বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন দুধ, কলা এবং মিষ্টি নিয়ে বরের বাড়ি গমন করে। তারা উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে বরের কিংবা বরের মা-বাবার অনুমতি নিয়ে কনেকে বাবার বাড়ি নিয়ে যায়। বর তার সহপাঠি নিয়ে পরে শ্বশুর বাড়িতে 'প্রত্যাবর্তন অন্ন' গ্রহণ করে ; যাকে ফিরনী ভাত বা ফিরন্যা ভাত বলে। এভাবে অভ্যর্থিত না হলে বর কখনো স্বেচ্ছায় শ্বশুর বাড়ি যাতায়াত করে না বলে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ বংশ পরম্পরায় সনাতনী ক্রমধারায় লোকাচার সমৃদ্ধ। এ লোকাচার কখন এবং কিভাবে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করেছে, জানা যায় না। বিভিন্ন বিশ্বাস, লোকাচার, সামাজিক স্বীকৃতি এবং সারল্যতাই এ জনগোষ্ঠীর বিবাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে আইনি কোনো রকম জটিলতা নেই। সামাজিক সংহতির মাধ্যমে সংহৃত এক বিশেষ বন্ধনই বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহের মূল চালিকা শক্তি বা মূল স্তম্ভ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। এ জনগোষ্ঠীর বিবাহ হিন্দু এবং মুসলিম উভয় জাতির আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত। যেমন, বিয়ের সময় হুলু ধ্বনি দেওয়া, মেয়ের কপালে সিদুঁরের তিলক দেওয়া, হাতে শঙ্খ পরিধান করা, ভিক্ষু কর্তৃক মন্ত্র পাঠ ইত্যাদি হিন্দুধারা। আবার পানসল্লা, বাসিগোসল ইত্যাদি মুসলিমধারা। ধারণা করা হয় ; এগুলোকে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্ত। তাছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে পানখিলি ব্যবহার, গাত্র হরিদ্রা, ধান, নোড়া, হলুদ, দূর্বা, কলাগাছের ব্যবহার ইত্যাদি আচার ত্রিপিটকের কোথাও দৃষ্ট হয় না। এগুলো প্রাক-আর্য আদিবাসীদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বঙ্গের অধিবাসীদের নিজস্ব সম্পদ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা নেই, নেই যৌতুকের আশায় স্ত্রীকে নির্যাতন করা। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবাইকে লোকাচার ভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান মেনে নেয়। এ জনগোষ্ঠীর মানুষ বিবাহের লোকাচার সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি খুবই আস্থাশীল। তারা বাঙালি জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের বিবাহের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সবই দেশাচার এবং লোকাচার ভিত্তিক। এখন কিছু কিছু বিবাহ সময় স্বল্পতার জন্য ক্লাবে হলেও লোকাচারিক অনুষ্ঠান বাদ দেয় না কখনো। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিবাহের স্বরূপ বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

**প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তথ্য নির্দেশ**

১. পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : পশ্চিম বঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১), পৃ. ৩০৩

২. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান জন্ম বিবাহ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ১১৯

৩. মাহমুদা ইসলাম, *বিয়ে* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৪

৪. Anderson and Perker, *Society : Its Organisation and Operation* (New Dehli : East West press Pvt Ltd, 1966), p. 15

৫. K. Sri Dhammananda, *Human Life and Problems* (Kualalumpur : 1997. P. 35) ; Sandhya Mukerje এ বিষয়ে বলেন ; When a Person has gone through all the tests that

Dhaka University Institutional Repository

are required for the life of a householder, he decides to choose a bride for him. Sundhya Mukerje, *Some Aspects of social to Life in Anciant India* [325 Be-200 A.D] (Allahabad : 1976, Narayan Publishing House), P. 69

৬. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৭. একধরনের ছোট ফুল। যা পাহাড়ের ঢালুতে বার বছরে একবার ফোটে। তবে এ ফুল এক জায়গায় দু'বার ফোটে না।

৮. শিবশংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *সুদর্শন ডাইরেক্টরী* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, ১৪১১ বাংলা), পৃ. ১৮

৯. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

১০. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ১৬৫

১১. S.C. Sarker, *Some Aspects of the Earliest Social History of India* [Pre-Buddhist Ages] (Patna : Janaki prakashan, 1985), P. 127

১২. সংস্কার হলো বৌদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী লাভ করার জন্য বরের কিছুদিন প্রব্রজ্যাধর্ম আচরণ করা, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা আর কনের কর্ণছেদন করা।

১৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

১৪. ১. ব্রাহ্ম্য বিবাহ ২. দৈব বিবাহ, ৩. আর্য বিবাহ, ৪. প্রাজাপাত্য বিবাহ, ৫. আসুর বিবাহ ৬. গান্ধর্ব বিবাহ, ৭. রাক্ষস বিবাহ এবং ৮. পৈশাচ বিবাহ। মনুসংহিতা, ৩:২৭-৩:৩৪

১৫. ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪), পৃ. ৮৭-৮৮

১৬. পলাশ বড়ুয়া, শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বাঁশখালী আলাওল কলেজ, চট্টগ্রাম, পূর্বোক্ত

১৭. সুদর্শন বড়ুয়া, শিক্ষক, পশ্চিম আধার মানিক গুজরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাক : রঘুনন্দন চৌধুরী হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

১৮. এটার অন্যনাম আশীর্বাদ প্রদান ও খাওয়া-লওয়া। সাধারণত শুক্লপক্ষ অলংকার চড়ানির পক্ষে শুভ বলে গণ্য করা হয়। এ সময় কনে পক্ষ বর পক্ষকে ঘটা করে নিমন্ত্রণ খাওয়ায়। তাই তার অন্যনাম জোড়াগাঁথা বা জোঁড়নী।

১৯. মিষ্টির পরিমাণ কম হলে কনে বাড়ীতে মৃদু গুঞ্জন উঠে।

২০. স্থান বিশেষে পানের থালায় ১০০/২০০ কিংবা ৫০০ টাকার নোট দিয়ে সম্মান জানানো হয়। তখন বরপক্ষও সম্মানার্থে ১০০/২০০ কিংবা ৫০০ টাকার নোট দিয়ে তাদের সম্মান জানায়। পানের থালা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার বরপক্ষের ঐ নির্ধারিত টাকা সম্মানের সাথে পূণরায় ফিরিয়ে দিয়ে থাকে।

২১. বরের ছোট ভাই না থাকলে ছোট ভাই সম্পর্কীয় অন্যকেউ অথবা ভাগিনা-ভাগিনী আংটি পরিধানের কাজটি সম্পন্ন করে থাকে।

২২. এটা পানসল্লা বা সল্লা পরামর্শ বলেও সমধিক পরিচিত। এতে উপস্থিত সবাইকে পান-সুপারী এবং মিষ্টিদ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

২৩. এখানে পাঁচজন বলতে জামাই'র বন্ধু-বান্ধবকে বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. যার অন্যনাম তেললোয়াই, তেলল্যামানি, তেলচড়ানি ইত্যাদি। এটার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অশুভ শক্তির কবল থেকে বর-কনেকে দূরে সরিয়ে রাখা। এটা দু'বার করতে হয় ; গৃহের অভ্যন্তরে এবং উঠানের মধ্যে। তবে কেন করতে হয় এ বিষয়ে বিশদভাবে কেউ কিছু বলতে না পারলেও ধারণা করা হয় লোকচারিকতায় এটি সম্পন্ন করা হয়।

২৫. বর-কনের বোন জামাই এ কূলা চিত্রায়নের গুরু দায়িত্ব পালন করে। তবে অধুনা তৈরী করা চিত্রায়িত কূলাও এ জনগোষ্ঠীর বিবাহে ব্যবহার করা হয়।

২৬. বাঁশ পাতা, ফুলপাতা, বোধিবৃক্ষের পাতা, বট বৃক্ষের পাতা মিজরি পাতা এবং কলাগাছের পাতা ছাড়াও অন্যান্য পাতা দ্বারা এ মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়।

২৭. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

২৮. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর একে সোহাগ ধরা বলা হয়।

২৯. এ গুরুদায়িত্বটা পালন করে বর-কনের ভগ্নি পতিরা।

৩০. বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আঁচুলী বলতে একটি স্বর্ণের হারকে বোঝায়।

৩১. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩২. তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে আস্তে আস্তে এ জনগোষ্ঠীর মেয়েলীগীত উঠে যাচ্ছে।

৩৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলিকাতা : এ মুখার্জি এ্যান্ড কোং প্রা. লি. ১৯৯০), পৃ. ১৯৯ ; একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাঢ় দেশের লোক এবং পূর্ব বঙ্গের বর্মন রাজবংশের নৃপতি হরিবর্মনের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট বধূর শিরে আচার হিসাবে সিদুঁর তিলকদানের বিধান দিয়েছিলেন।
ব্রতীনাথ মুখোপধ্যায়, *বঙ্গ, বাঙ্গালী ও ভারত* (কলকাতা : ২০০০), পৃ. ৭৮

৩৫. সময়ের প্রেক্ষাপটে বাজি পোড়ানোর প্রথা এখন তেমন আর আগের মতো দেখা যায় না।

৩৬. এ রকম বসাকে কানাকানি বলা হয়।

৩৭. এ সময় কনের মা আলতোভাবে তার হাতের মধ্যমা আঙ্গুলটি কামড় দেয়। এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, এর মাধ্যমে তিনি সকল প্রকার আপদ-বিপদে ধৈর্যের ক্ষমতা লাভ করে।

৩৮. এমেলি বড়ুয়া, বয়স-৫০, গ্রাম : দক্ষিণ ঘাটচেক, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম, ০২.০৬.২০০৬

৩৯. এক্ষেত্রে অবশ্য কোন নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী আনীত অন্নগ্রহণে কোনোরকম আপত্তি নেই। পংকজ বড়ুয়া, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, থানা : রাউজান, চট্টগ্রাম, ০১.১০.২০০৬

৪০. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৪১. সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত* (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ৬৮-৭১

৪২. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, *খুদক পাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ৪৩-৪৭

৪৩. সাধনানন্দ মহাস্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৯

৪৪. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১), পৃ. ১৭১-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. দায়িত্বটা বর-কনে উভয়ের ভগ্নিপতিরা করে থাকে।

৪৬. যে আসনে বর-কনেকে এনে রাখা হয়, তাকে 'আবাহ-বিবাহ' বাসর বলে।

৪৭. মনকে ত্রাণ করে অর্থ 'মন্ত্র'। যিনি এ মন্ত্র আবৃত্তি করে তাকে বলা হয় মন্ত্রদাতা।

৪৮. পূর্বেই মঙ্গলঘটগুলো বাদ্য-বাজনাসহকারে নিকটবর্তী পুকুরের পানি দিয়ে পুর্ণ করে আনা হয়।

৪৯. ধম্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬); ধর্মপাল ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্নমালা*, (কলিকাতা : ১৯৮৪); জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৬); ধর্মদীপ্তি স্থবির, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (চট্টগ্রাম: ১৯৯৯); *বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি* (কলিকাতা : ১৯২৩); Sukomal Chaudhuri, *Contemporary Buddhism in Bangladesh* (Calcutta : 1982); নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্র ও ইতিবৃত্ত* (চট্টগ্রাম : ১৯৯০)

৫০. এ সময় ভিক্ষুর উত্তরাসঙ্গ চীবরের ন্যায় বামস্কন্ধের উপরে মন্ত্রদাতার চাদর একাংশ করে ব্যবহার করতে হয়। মুখ ভালভাবে প্রক্ষালনের পর নিজেকে পবিরশুদ্ধ হতে হয়। তারপর মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়।

৫১. এ সময় মন্ত্রদাতা পানিপূর্ণ গ্লাস হস্তে ধারণাপূর্বক মন্ত্র আবৃত্তির পর গ্লাস থেকে একটু পানি নিয়ে নিজ মস্তকের উপর ছিটিয়ে দেয়।

৫২. পানি পরিপূর্ণ গ্লাস হস্তে মন্ত্রদাতা মন্ত্র আবৃত্তি করার পর গ্লাস হতে সামান্য পানি নিয়ে বর কনের মস্তকের উপর ছিটিয়ে দেয়।

৫৩. এ সময় মন্ত্রদাতা তাদের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করে। ভাষণ শেষ হলে কুলবধূরা হুলধ্বনি দেয়। এ হুলুধ্বনি সামাজিক স্বীকৃতির প্রতিধ্বনি।

৫৪. এ সময় বরের বামপায়ের সাথে কন্যার ডানপায়ের সংযোগ স্থাপন করা হয়।

৫৫. ভিক্ষুশীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৫৭. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, *বৌদ্ধ মহিয়সী নারী* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৪০০), পৃ. ৭৪

৫৮. পূর্বোক্ত

৫৯. উদ্ধৃত, *বৌদ্ধবিবাহ ও মন্ত্র ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৩

৬০. সন্তষ্টো ভার্যয়া ভর্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।

*মনু সংহিতা* ৩.৬০

৬১. আবার অনেকেই গৃহে প্রবেশের পর শুভদৃষ্টির আগে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে।

৬২. আর্শীবাদ এলাকা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

৬৩. অনেক জায়গায় এটাকে মাটি পারানি বলা হয়।

৬৪. পাপড়ি বড়ুয়া, বয়স-২৭, গ্রাম : কেশনপাড়, ডাক : কেশনপাড়, থানা : কুমিল্লা, ০৪.০৭.২০০৬

৬৫. অনেক ক্ষেত্রে এ সময় আরো বৃদ্ধি পায়। মূলত এটা এলাকার উপর নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# লোকসাহিত্য : মেয়েলীগীত, প্রবাদ ও কীর্তন

'লোক' ও 'সাহিত্য' এ দু'য়ের সমন্বয়ে লোকসাহিত্য। এখানে 'লোক' কথাটার অর্থ লোকমনের অধিকারী লোকজন। অন্যভাবে বলা যায়, 'লোক' বলতে প্রাকৃতজন, অশিক্ষিত, অমার্জিত ও অরুচিশীল সহজ-সরল গ্রামীণ লোকজনকে বোঝায়। সাথে থাকে এ অর্থে 'সাহিত্য'। সুতরাং বলা যায়, নিভৃত পল্লীর নিম্ন আয় স্তরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যে সাহিত্য অনুশীলন করে তাই লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্য মানবসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যে কোনো জাতির স্মৃতির সম্ভার পরীক্ষা করলেই অনেক তথ্য-উপাখ্যান, প্রবাদ এবং মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় লোকসাহিত্যকে অস্বীকার করে কোনোও জাতির সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা চলে না।[১] Franceies Lee Utley এ বিষয়ে বলেন ; The study of literature transmitted is highly respectable subject.[২] বাংলার মানুষের লোকসংস্কৃতির ধারণা দিতে গিয়ে ওয়াকিল আহমদ বলেন ; একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকসাহিত্য সৃষ্টির যে সব শর্ত আবশ্যক, বাংলাদেশে সে সব বিদ্যমান ছিল। বাংলার মানুষের ভাষা ছিল, ভাষা প্রকাশের আবেগ অনুভূতি ছিল, অক্ষর জ্ঞান না থাকায় মানুষ নিজের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারেনি। মুখের কথা লোকমুখে তুলে দিয়েছে। শ্রুতিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে লোকরচনা এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে প্রচারিত-প্রসারিত হয়েছে। লোকসাহিত্য এ অর্থেই জনসমষ্টির রচনা।[৩] তাই লোকসাহিত্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর রচনা।

লোকসংস্কৃতির অধিকাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এই লোকসাহিত্য ; যেখানে নিম্নবিত্ত, নিরক্ষর, অবহেলিত সরল গ্রামজীবনের খাঁটি পরিচয় মেলে। এই শ্রেণীর লোকমনের সজীব হাসি, উষ্ণ অশ্রু এবং সহজ সাবলীল ভঙ্গি, ভাষা বা ছন্দ-এতগুলো সুন্দর ও প্রিয় জিনিসের একত্র সমাবেশ লোকসাহিত্য ছাড়া খুবই কম দেখা যায়।[৪] এ সাহিত্য সাধারণ লোকজনের জীবন্ত ভাষ্য। অযত্ন-অবহেলায় সংরক্ষণ হয় বলে কেউ তাকে মূল্য দেয় না। আবহমান পল্লী মানুষের তুচ্ছমনের জমানো অনুভূতি ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না এসব পুঁথির বুকে লিখিত না হয়েও হারিয়ে যায়নি। লোকসাহিত্য অপরিসীম মমতার পরম সতর্কতার সাথে সেগুলোকে জীবন্ত করে রেখে দিয়েছে তার Living fossil-এর বুকে।[৫] পল্লীর সাধারণ মানুষের মননশীলতার প্রতীক লোকসাহিত্য।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসাহিত্য কৃত্রিমতা-বিবর্জিত সাহিত্য। লোকসমাজের সহজ-সরল মানুষের জীবনবোধের বাস্তবানুভূতি এ সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। বাংলাদেশ লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ দেশ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এদেশের একটি সম্প্রদায়। বিভিন্ন উপাদানে এ জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ হলেও তন্মধ্যে থেকে মেয়েলীগীত, প্রবাদ এবং কীর্তনই আমার গবেষণার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মেয়েলীগীত

লোকসংগীতের একটি সমৃদ্ধধারা নারীদের দ্বারা রচিত এবং সংরক্ষিত হয়, এ ধারাই হলো মেয়েলীগীত। এ রকমের গীতগুলো একান্তই লোকজ। তাই লোকসংগীতের[৬] সাথে এ ধরনের গীতের একটি ঐতিহ্যগত সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। লোকসংগীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে Alexander Huggerty Krappe বলেন ; The folksong is highly emotional sometimes even sentimental ; but the emotions are simple ; there is no question of problem of conflict but alone searching self analysis or are even introspection.[৭] মেয়েলীগীতের নির্মাণশৈলী, বর্ণনা ও পরিবেশনগত পদ্ধতি দেখে মনে হয় সত্যিকার অর্থে তা লোকসংগীতেরই একটি অংশ। এ গীতে পল্লীর হাস্য-লাস্যময় জীবনের সুর শোনা যায়। সরলা পল্লী মেয়েদের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, প্রেম ও মিলন-এর আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে এ গীতে। পল্লী ললনাদের নিখুঁত জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাদের সরলতা, গভীর উচ্ছ্বাস ও অনুভূতির সাক্ষ্য এ গানগুলো।[৮] গীতগুলো মাতৃসুধা রসে অভিসিঞ্চিত ; এগুলোতে নিতান্ত, সরল ও কোমল প্রাণের অভিব্যক্তি রয়েছে।[৯] গীতগুলো তার স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল। কথার সারল্য আর সুরের মাধুর্য-এর অন্যতম দিক। পল্লী রমণীর নিরাবরণ ও নিরাভরণ মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের ন্যায় মেয়েলীগীতের স্নিগ্ধরূপ তার অনাড়ম্বর পরিবেশনায়। কারণ মেয়েলীগীতের পরিবেশনার ক্ষেত্রে যেমন কোনো আড়ম্বর বা বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, তেমনি তাল-মান-মাত্রা রক্ষায়ও কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।[১০]

'মেয়েলীগীত' নারীমনের জমাট অনুভূতিমুখর কাব্য। নারীজীবনের নানাস্তর প্রেম-প্রীতি, হাসি-কান্না-আনন্দ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক[১১] আয়োজনকে উপলক্ষ করে তার প্রকাশ। এগুলোর মধ্য দিয়ে একদিকে নারীজীবনের আনন্দ-হাসি ব্যথা-বেদনার চিত্র প্রকাশিত ; অন্যদিকে তা লোকসমাজের নিখুঁত দর্পণও বটে।[১২] মেয়েলীগীতকে প্রাকৃতিক সংগীতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেমন : পাখীর গান বনের মর্মর, নদীর কলধ্বনি একান্তভাবেই নৈসর্গিক। সম্পূর্ণ সহজাতভাবে এটা উৎসারিত। মেয়েলীমনের উৎসভূমি থেকে মেয়েলীগীতের জন্ম- এমনি সহজাত বলে মনে হয়। মেয়েলীগীতের কোনো পরিকর্ষণ নেই, পরিমার্জনা নেই, পরিকল্পনা নেই, শুধু বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

কোন ঘটনা মেয়েলীমনের স্মৃতি আশা-হতাশা যেন উন্মীলিত হয়ে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । এমন খাঁটি নিখাদ মেয়েলীমন। এই অনুভূতির সব কিছুর বাইরে একেবারেই মেয়েলী অনুভূতি। নিসর্গ সংগীতের সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু এই যে, নিসর্গ সংগীত স্বভাবগত আর মেয়েলীসংগীত অনুষ্ঠান নির্ভর, ঘটনা নির্ভর, কিন্তু এদের প্রকৃতি একই।[১৩] নারীসমাজের বিচিত্র উপাদানের আকর মেয়েলীগীতের ভাবসম্পদ। প্রকৃতপক্ষে মেয়েলীগীত মেয়েদের জীবনবেদ স্বরূপ, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের, জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক, যে দেহের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্কের ন্যায় দৃঢ় নিবদ্ধ মেয়েলীগীতের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য তার অনন্য দৃষ্টান্ত।[১৪] মেয়েলীগীতের এরকম জীবনঘনিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রসঙ্গে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ;

> আমাদের মেয়েলীগীতগুলো প্রকৃতির নিরালা নিকুঞ্জ বিহারীর ঘুঘুর কাকলী কিংবা বনলতার মর্মর ধ্বনির ন্যায় সমগ্র নারীমনের ব্যথা, বেদনা ও আনন্দ লহরীর স্বতঃস্ফুর্ত স্বাভাবিক অনুভূতির অভিব্যক্তি। মাটির সঙ্গে এ সবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। মেয়েলিগীতের আবেদন বড়ই করুণ ; মধুর একান্ত মর্মস্পর্শী।[১৫]

গ্রামে প্রচলিত মেয়েলীগীত পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংগীত। এ সংগীত লোকসাহিত্য দরিদ্র রসিকের হৃদয়গ্রাহী হবে তাতে সন্দেহ নেই। এ মেয়েলীগীত সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে শাক্য বালা বড়ুয়া বলেন ; এ গীত হচ্ছে এক ধরনের মুখবিদ্যা, যা সমাজের নিম্ন আয়ের মহিলারা মুখে রচনা করে গায়। সুদীর্ঘকাল থেকে লোকপরম্পর হয়ে শ্রুতির মাধ্যমে এ মেয়েলীগীত সংগৃহীত হয়ে আসছে।[১৬] সনাতন পল্লী প্রাণের ঘ্রাণ পাওয়া যায় এতে।[১৭] গীতগুলো স্বমহিমায় মহিমান্বিত; স্ব-স্ব গুণে গুণান্বিত। সর্বোপরি গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে সমগ্র লোকসমাজের নারীজীবন কাহিনী চিত্রায়িত হয়।

### ১. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মেয়েলীগীত

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেয়েলীগীতের প্রচলন রয়েছে। এ জনগোষ্ঠীর সাধারণ লোকজন বিবাহউৎসবে এ গীত গেয়ে থাকে। নারীজীবনের নানারকম দুঃখ কষ্টময় চিত্র এখানে আবেগের সাথে উপস্থাপন করা হয়।[১৮] লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্যে তথা বাঙালি জাতির সমাজনিরীক্ষণে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এ মেয়েলীগীতের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর সমস্ত দেশে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সমাজেই বিয়ে হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। নারী-পুরুষের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সামাজিক প্রথা-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমকভাবে বিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ন্যায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর নিভৃত পল্লীর বিয়ে অনুষ্ঠানকে

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের মেয়েলীগীত প্রচলিত আছে। তাছাড়া বিয়ের অন্যান্য সময়ও এ গীত পরিবেশিত হয়। যেমন : বউ দেখা, বস্ত্রালংকার প্রদান অনুষ্ঠান, বরণ ডালা অংকন, তেললোয়াই বা তৈলাভিষিক্ত করা, স্নান পর্ব, বরযাত্রী গমন, বরযাত্রী আগমন, কন্যা বিদায়, বধূবরণ ইত্যাদি।[১৯]

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এ মেয়েলীগীত বিশেষ কোনো নারীমনের প্রকাশ নয়। এ গীত সংহত নারী সমাজের আলেখ্য। এ মেয়েলীগীতে আনুষ্ঠানিকতার কাঠামোর মধ্যেও সাধারণত তিনটি[২০] বিষয় অবধারিত রূপে পাওয়া যায়। তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. মেয়েলি মনের বৈশিষ্ট্য ;

খ. সমাজে মেয়েদের অবস্থা তথা সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ;

গ. আঞ্চলিক ভাষায় নিখুঁত মৌলিক নির্ভরযোগ্য নিদর্শন।

এ জনগোষ্ঠীর লোকজীবনে চলমান মেয়েলীগীতগুলো বিবাহ ছাড়াও যেসব ঘটনা ও অনুষ্ঠানাদির উপর নির্ভর করে প্রচলিত আছে তা হলো ; ধর্মানুষ্ঠান, দোলনায় তোলা, কর্ণছেদন(কন্যাশিশু) ইত্যাদি। তবে বিবাহকেন্দ্রিক গীতগুলোই বেশী

## ১.১. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আচার ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মেয়েলীগীত

### ১.১.১. তৈলাভিষিক্ত বা তেলপাই

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিয়েতে আচরিত প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠানের নাম তৈলাভিষিক্ত বা তেলপাই। এ আনন্দঘন চিত্তাকর্ষক বর্ণালি অনুষ্ঠানটি ধনী-দরিদ্র সবার বিয়েতে চিরায়ত প্রথায় যথাসাধ্য সাড়ম্বরে পালন করে। পৃথক পৃথকভাবে বর এবং কনের নিজ নিজ বাড়িতে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ রকম লোকাচারিক অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিবাহ অনুষ্ঠানের পরিবেশকে আরো বেশী উল্লাসময় করে তোলা। তাছাড়া শারীরিক সৌন্দর্যের বৃদ্ধির কথা স্মরণ করেই বহুলপ্রিয় এ অনুষ্ঠানটি পালন করে অনেকেই। যে সমস্ত গীত এ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় তা :

ক. নীচেতে বসুমতি উপরে আস্‌মান
শীতল পাডিইত বসে কইন্যা
লইলু বুদ্ধের নাম
বুদ্ধেরঅঁ আশীবাদে হইল শুভ কাম
না---রে না---রে না---রে---রে---রে মোর
আ---য়---রে---আ---য়---রে---আ---য়---রে
নীচেতে বসুমতি উপরে আস্‌মান
শীতল পাডিইত বসে কইন্যা
লইল ধরমের নাম

*Dhaka University Institutional Repository*

ধরমেরঅঁ আর্শীবাদে হইল শুভ কাম
না---রে না---রে না---রে রে---রে মোর
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
নীচেতে বসুমতি উপরে আস্‌মান
শীতল পাডিইত বসে কইন্যা
লইল সংঘের নাম
সংঘেরঅঁ আর্শীবাদে হইল শুভ কাম
না---রে না---রে না---রে রে---রে মোর
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে[২১]

খ. ঘাডাআঁর আগাআঁত দুলফুলারে
আইনত্য গরে টেলাটেলি
আবোল বলি ওরে
না---রে না---রে না---রে ওরে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
মামাতো না পিঅত বইনরে (২)
পিরার কোনআঁন ভরা--রে
বিডার উতুর পালদি কলার ডগা
আইনত্য গরে---টেলাটেলি
আবোল বলি ওরে-----
না---রে না---রে না---রে ওরে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
চঅঁত না ন লাগের রে
বিয়া বাড়ির নান--রে
আবোল বলি ওরে---

চাচাঅঁতো না জেডাঅঁতো বইনরে (২)
ডেরি ঘরঅঁত কোনআঁন ভরা-রে
না---রে না---রে না---রে ওরে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
বাড়ীর পিচে আমেরঅঁ পল্লক
আইনত্য গরে টেলাটেলি
না---রে না---রে না---রে ওরে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে[২২]

গ. কালা কালা মুরার মাঝে
রাঙা রাঙা মাটি
কোন কুমাড়ে বানাই দিচে
তেল চড়ানির বাতি
উতুর পাইজ্যা আয়স্তীরা নোআঁ আস্‌ত জানে
কুলার চারদিকে নয়গুচি পান

Dhaka University Institutional Repository

একগুচি পান তুলি আয়স্তী বোলায় আনে
আয়স্তী ন আঁইয়ে লাজে
দুলআঁর ভাইঅঁর বউয়ের শাড়ী বরকনবালা খোঁজে।

কালা কালা মুরার মাঝে
রাঙা রাঙা মাটি
কোন কুমাড়ে বানাই দিচে
তেল চড়ানির বাতি
দক্খিন পাইজ্যাঁ আয়স্তীরা নোআঁ আস্ত জানে
কুলার চারদিকে নয়গুচি পান
একগুচি পান তুলি আয়স্তী বোলায় আনে

কালা কালা মুরার মাঝে
রাঙা রাঙা মাটি
কোন কুমাড়ে বানাই দিচে
তেল চড়ানির বাতি
পুগঅরঁ পাইজ্যাঁ আয়স্তীরা নোআঁ আস্ত জানে
কুলার চারদিকে নয়গুচি পান
একগুচি পান তুলি আয়স্তী বোলায় আনে
আয়স্তী না অঁইয়ে লাজে
কন্যার বওঅঁজের পিদনের শাড়ী বরকনবালা খোঁজে।

কালা কালা মুরার মাঝে
রাঙা রাঙা মাটি
কোন কুমাড়ে বানাই দিচে
তেল চড়ানির বাতি
পচ্চিম পাইজ্যাঁ আয়স্তীরা নোআঁ আস্ত জানে
দুলআঁর বওঅঁজের ট্যাং এর চ্যাঙেল বরকনবাল খোঁজে [২৩]

### ১.১.২. বরযাত্রী আগমনবিষয়ক

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ে 'বরযাত্রী' অর্থবোধক শব্দটি অতি পরিচিত। বিয়ের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে যখন দিনক্ষণ এসে উপস্থিত হয় তখন বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথায় সামাজিকভাবে কনেকে বউ হিসেবে নিয়ে আসার জন্য বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। বরানুগমন দেখে কনে বাড়িতে নারীরা গীত গায় :

ক. না---রে না---রে না---রে

আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে না---রে
পাতঅঁর ভাতকুন খাওয়াইরে রাতাঁ
পাতঅঁর ভাতকুন খাওয়াইরে রাতাঁ তোঅঁরে----

Dhaka University Institutional Repository

পালঅঁন গইজ্জিদি---রে
সামনঅর ভাতকুন খাওয়াইরে রাঁতা তোঅঁরে
পালঅঁন কইরলুম তোঅঁরে------
রাইতঅঁর নিশিকালে রাতাঁরে---- (২)
উড়কায় বাক্ ন অইদ্দরে
উড়কায় বাক্দিলি---ও রাতাঁরে
বৈরাতি থানঅঁ পাইবরে
বৈরাতি থানঅঁ পাইলে রাতাঁরে---- (২)
কোলেঅঁর শিশু লইয়া যাইবরে
না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

পাতঅঁর ভাততুন খাওয়াই রাতাঁরে
পালঅঁন কইরলুম তোঅঁরে
মুআঁনের ভাতকুন খাওয়াইরে রাতাঁ
পালন কইরলুম তোঅঁরে না---রে
রাইতঅঁর নিশিকালে রাতাঁরে
উড়কায় বাক্ ন অইদ্দরে
উড়কায় বাক্ দিলি রাতাঁরে
বৈরাতি থানঅঁ পাইবরে
বৈরাতি থানঅঁ পাইলে রাঁতারে
কোলেরঅঁ শিশু লইয়ারে যাইব----রে
না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে না---রে [২৪]

খ. মতিরঅঁ ঘাঁডা এত সুন্দর
মতি কতো সুন্দর----রে
আয় আয়---রে আ---য়---রে
সুন্দর মতির বৈরাতরে
আরো কদ্দুর যাইয়া বৈরাত
তিয়াই পুচার গইল্লরে
সুন্দর মতির বৈরাতরে
না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
আয় আয় ---আ---য়---রে আ---য়---রে
সুন্দর মতির বৈরাতরে
মতিরঅঁ ঘাঁডা এত সুন্দর
মতি কতো সুন্দর-------রে
আয় আয় আয়---আ---য়---রে

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর মতির বৈরাত----রে
ঐ দেখা যায় ঐ দেখা যায়
সুন্দর মতির বৈরাতরে
আয় আয় আ---য়---রে
ধীরে লাজে যারগৈরে বৈরাত (২)
সুন্দর মতির বৈরাতরে
আয় আয় আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

আইল্যা বাইঅঁরতুন জিজ্ঞাস গরে
সুন্দর মতির বাড়ীরে
ঐ দেখা যায় সুন্দর মতির ঘাডারে
আয় আয় আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

মতিরঅঁ ঘাডা এত্‌রে সুন্দর
মতি কত সুন্দররে
আয় আয় আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

কোথায় গেইল্যা মতির ভাইরা
বৈরাতি উজায় লওনারে
আয় আয় আয়------রে
সুন্দর মতির বৈরাতরে
তেল পানি লইয়ারে বৈরাত
দিল বৈরাতি এর মাথায়----রে
আয় আয় আয়------রে
না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে [২৫]

১.১.৩. বাল্য বিবাহবিষয়ক

বাল্যবিবাহ সকলের নিকট সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হলেও কিছু কিছু মানুষ এ রকম বিয়েতে এগিয়ে আসে। কিন্তু পারিবারিক কোনো কাজেই এ রকম বিবাহিত মেয়েরা সিদ্ধহস্ত পরায়ণ নয়। প্রায়শ শ্বশড় বাড়িতে অতিশয় ভীত থাকে তারা। তাদের হৃদয়ের মর্মান্তিক বেদনার কথা এ গীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে উঠেছে ----

দারুনঅঁ মা-বাপ পঁয়সারঅঁ কাতর
দারুনঅঁ মা-বাপ ধনেরঅঁ কাতর
অবুজকালে দিল বিয়ারে
রাধিতঅঁ ন জানি বারিতঅঁ ন জানি
ন জানি শ্বাশুরির সেবারে
কিহালে কাটাইয়ুম দিনভররেঁ
কিহালে কাটায়ুম রাইতরে

দুরগইত্যা মা-বাপ স্বামীরঅঁ কাতর

Dhaka University Institutional Repository

অবুজকালে দিল বিয়ারে
রাধিতঅঁ ন জানি বারিতঅঁ ন জানি
পরিত ন জানি শাড়ীরে
কিহালে কাটাইয়ুম দিনভরেঁ
কিহালে কাটায়ুম রাইতরে

দুরগইত্যা মা-বাপ পঁয়সারঅঁ কাতর
দুরগইত্যা মা-বাপ ধনেরঅঁ কাতর
অবুজকালে দিল বিয়ারে
রাধিতঅঁ ন জানি বারিতঅঁ ন জানি
ন জানি ভাসুরের সেবারে
কিহালে কাটাইয়ুম দিনভররেঁ
কিহালে কাটায়ুম রাইতরে
রাধিতঅঁ ন জানি বারিতঅঁ ন জানি
ন জানি শ্বাশুরির সেবারে

দুরগইত্যা মা-বাপ পঁয়সারঅঁ কাতর
দুরগইত্যা মা-বাপ ধনেরঅঁ কাতর
অবুজকালে দিল বিয়ারে
রাধিতঅঁ ন জানি বারিতঅঁ ন জানি
ন জানি ননদের সেবারে
ন জানি দেবরের সেবারে
কিহালে কাটাইয়ুম দিনভররেঁ
কিহালে কাটায়ুম রাইতরে
না---রে না---রে না---রে না---রে---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
না---রে না---রে না---রে না---রে---রে [২৬]

১.১.৪. নবজাত শিশুর চুল কামানোবিষয়ক

নতুন বিবাহের পর সন্তান-সন্ততি জন্ম নিলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকজন লোকপ্রথায় জন্মের ৭/৯ দিনের মধ্যে দিন মাথা ন্যাড়া করে তাকে পুত পবিত্রতায় পরিশুদ্ধ করে তোলে। যখন নাপিত আসে তখন পারস্পারিক আত্মিক সম্পর্কোন্নয়ন এবং পরিবেশকে আনন্দঘন করে তোলার জন্য এ ধরনের গীত পরিবেশন করে। যেমন ----

সুন্দর গরি কামাইলে নাপিত (২)
পাইবা ভালা বক্শিস্
মন্দ গরি কামাইলে নাপিত
কাডা যাইব কান
অ-উ সোনার নাপিত অঁ---রে

Dhaka University Institutional Repository

না---রে না---রে না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

সোনার নাপিতঅঁ---রে (২)
আঁ-র বাড়ীইত আঁই- ওরে নাপিত
সোনার নাড়িং রূপার বাটি
অংগে গরি আনিব্যাঁ
অ-উ সোনার নাপিতরে
ভালা গরি কামাইলে নাপিত
পাইবাঁ ভালা বক্শিশ
খারাপ গরি কামাইলে নাপিত
কাডা যাইব কান
সোনার নাপিত অঁ---রে
সোনার নাপিত অঁ---রে
আঁ-র বাড়ীইত আঁই-ওরে নাপিত
না---রে না---রে না---রে না---রে----রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে [২৭]
সোনার নাপিতঅঁ---রে[২৭]

১.১.৫. দোলনায় তোলাবিষয়ক

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ৭/৯ দিনের মধ্যে শিশুদের দোলনায় তোলা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম লোকাচারিক কৃত্য। এ দিন কনে বাড়ির লোকজন শিশুকে দোলনায় তোলা উপলক্ষে কনের শ্বশুরবাড়ি আসে। দোলনা তোলার সমাসন্ন হলে পাড়া প্রতিবেশী সবাই একত্র হয়ে আনন্দ ও উল্লাস করে। এ সময় এ ধরনের গীত গাওয়া হয় --

একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
পুগে চে পচ্চিমে
না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
মা জননীর কোলতঅঁ বসিরে
না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে ও----রে

আরঅঁ একঅঁ চাদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
দাদু দিদির কোলতঅঁরে

Dhaka University Institutional Repository

না---রে  না---রে  না---রে
আ---য়---রে  আ---য়---রে  আ---য়---রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
ঠাকুর দাদা ঠাকুর মা আঁর কোলতঅঁ বসিরে
না---রে  না---রে  না---রে
আ---য়---রে  আ---য়---রে  আ---য়---রে  ও----রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
জেডা জেডির কোলতঅঁরে
না---রে  না---রে  না---রে
আ---য়---রে  আ---য়---রে  আ---য়---রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
কাকা-কাকীমার কোলত বসিরে
না---রে  না---রে  না---রে
না---রে  না---রে  না---রে  ও---রে----রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
মামা মামির কোলতঅঁরে
না---রে  না---রে  না---রে
আ---য়---রে  আ---য়---রে  আ---য়---রে  ও---রে----রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
বাবার কোলঅঁ বসিরে
না---রে  না---রে  না---রে
না---রে  না---রে  না---রে  ও---রে----রে

আরঅঁ একঅঁ চাঁদঅঁ উলেরে
চাঁদঅঁরে চাঁদঅঁ মনি
পিসির কোলঅঁ বসিরে
না---রে  না---রে  না---রে
আ---য়---রে  আ---য়---রে  আ---য়---রে  ও---রে----রে[২৮]

১.১.৬. অতিথি আগমনবিষয়ক

গ্রামবাংলায় অতিথি হিসেবে কেউ আসলে কোনো কোনো এলাকায় তাদের গীত পরিবেশনের মাধ্যমে স্বাগত জানায়। এ রকম একটি গীত :

Dhaka University Institutional Repository

সকাল বেলা আইত্যাঁরে বেয়াই
গরম গরম খাইতা
বিকাল বেলা আইস্সরে বেয়াই
উদা ভাত খাইবা
রাইতঅঁর নিশি আইস্সরে বেয়াই
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাইবা।[২৯]

১.১.৭. ধর্মবিষয়ক

বিভিন্ন পূর্ণিমা, অষ্টমী, অমাবস্যা উপলক্ষে এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধর্মীয় গীত পরিবেশন করে। এরকম একটি গীতগান নিচে উপস্থাপিত হলো --

অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
আমাবইস্যাঁ পূর্ণরেমাসী
যতনে পালাইঅঁ নিশি
অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
যুবক-যুবতীগণ বিহারেতে যাই য়াঁ
পঞ্চশীলঅঁ লয়----রে
অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
না---রে না---রে-------রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
রাণী যায় ফুলবাগানে
আওয়াল ফুলঅঁ তুলিল
অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
না---রে না---রে-------রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে

অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
আমাবইস্যা পূর্ণরেমাসী
যতনে পালাইঅঁ নিশি
না---রে না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
যুবক-যুবতীগণ বিহারেতে যাইয়াঁ
পঞ্চশীলঅঁ লয়ে----রে
অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে
না---রে না---রে না---রে না---রে
আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে আ---য়---রে
অহিংসা পরমঅঁ ধর্ম ধর্ম----রে[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

২.

লোকপ্রিয় লোকাচারসহ হাসি-তামাসা এবং রস-রসিকতা বিয়ে বাড়ীর পরিবেশনকে আনন্দ মুখরিত করে তোলে। মেয়েলীগীত একান্তভাবে মেয়েদের ; বিয়ের সকল লোকাচারাদি এ গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার ভূক্ত মেয়েরা পাড়া প্রতিবেশী সামাজিক মেয়েরা এ গান গায়। এ সময় নারীজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি হৃয়দ বিদারক চিত্র অতি সহজ ও সরল ভাষায় ফুটে উঠে। যা অন্যের সুপ্ত হৃদয়কেও ভাবিয়ে তোলে।

প্রবাদ

'প্র' ও 'বাদ' যোগে প্রবাদ। এখানে 'প্র' একটি উপসর্গ ; যার অর্থ উৎকর্ষ, আধিক্য, ব্যাপকতা। আর 'বাদ' অর্থ অনুভূতিময় কথন বা উক্তি। সুতরাং 'প্রবাদ' হচ্ছে একধরনের বাক্য যেখানে সাধারণ জনগণের সূক্ষ্ম জ্ঞানের গভীরতা নিহিত থাকে। প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা যা বহুকাল থেকে প্রচলিত উপদেশমূলক উক্তি জনশ্রুতি হিসেবে-প্রচার-প্রসারিত হয়ে আসছে। দৈনন্দিন কার্যে অভিজ্ঞতার অনন্যসাধারণ প্রকাশে প্রবাদ অপরিসীম তাৎপর্যের ভাণ্ডার ; মানবজীবনের অনেক নিগূঢ়রহস্য এর মধ্যে সহজ বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। প্রবাদগুলো স্বল্প শব্দ প্রয়োগে সারবান ও গম্ভীরভাব প্রকাশ করতে সমর্থ।[৩১] একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা কর্মকুশলতা ও চিন্তাধারা পরিচয় মেলে প্রবাদ সাহিত্যে।[৩২] এগুলো রচনা করার জন্য রচিত হয়নি। মানুষের মনে মনে আপনি জন্মেছে, তাই মানুষের মুখে মুখে আপনি প্রচলিত হয়েছে।[৩৩] মানবসভ্যতার উন্মেষের সংগে সংগেই মৌখিকভাবে জন্মলাভ করে লোকোক্তি হিসেবে শ্রুতি পরম্পরায় চলে আসতে লেখার প্রচলন হলে এগুলো কালিকলমে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।[৩৪]

বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রবাদ বাক্যের আদিস্রষ্টা। প্রবাদের রচনাকাল ও রচয়িতার নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এ প্রবাদের আগমন-দিনক্ষণ সম্পর্কেও বলা দুরূহ ব্যাপার। এমতাবস্থায় এটাকে ব্যক্তি বিশেষের বেড়াজালে আবদ্ধ করা ঠিক নয়। এ বিষয়ে সুশীলকমার দে'এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ; তিনি বলেন --

> প্রবাদের আদি কথা যাহাই হোক না কেন, খুব সম্ভব এই প্রবাহের প্রথম উৎস তখনই মানুষের মনে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল যখন তাহার পক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি মরম বেগে সহজ ভাষায় নিঃসৃত হইয়াছিল। প্রথম যিনি কাটা নুনের ছিটের জ্বালা পরম্পরায় অসহ্য, রথ দেখা ও কলা বেচার পারম্পরানুষঙ্গিক সন্তোষ দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার অনুপযোগী দুঃসাধ্যতা অথবা অতিভক্তি চোরের লক্ষণের সহজ কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ ভাবটি দৈনন্দিন সাধারণ বুদ্ধির টুকরা হিসাবে বিবৃত করিয়া যে ক্ষিপ্র টিকা টিপ্পনী কাটিয়া ছিলেন তাহা ক্রমে অভ্যস্ত বাক্যে জনশ্রুতিতে বা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

'প্রবাদ' হলো লোকঅভিজ্ঞতা বা লোকদর্শনের একটা সুসংহত ও সুন্দর ভাষাগত রূপ। প্রায়ই একটি মাত্র বাক্যের কখনো কখনো দুটি সংলগ্ন বাক্যের, দুটির বেশী বাক্য দিয়ে প্রবাদ বাক্য কদাচিৎ দেখা যায়।[৩৬] মূলত প্রবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো প্রখর নিরীক্ষণ (Observation) এবং একক দৃষ্টান্তের গ্রহণীয় ক্রমশ ব্যাপ্তিবিধান। মানুষের প্রথম দীপ্ত মননশীলতার ভাবটিকে আত্মস্থ করে রেখেছে প্রবাদের মাধ্যমে। সভ্যতার প্রথমস্তরে প্রবাদ সৃষ্টি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত প্রবাদ সম্পর্কিত ধারণা থেকে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক Francies Bacon(1561-1626)-এ বিষয়ে বলেন ; The genius wit and spirit of a nation are discovered in its Proverbs.[৩৭] Jerzy Gluski বলেন; Proverbs mostly in bilingual arrangement[৩৮]. আবার Folklore in America নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, The wit of one and the wisdom of many.[৩৯] স্পেনীস সংজ্ঞায় Proverb is a short sentence based on long exprience.[৪০] জার্মানদেশীয় প্রবাদে, As the country so the proberbs. [৪১] স্কটল্যাণ্ড দেশীয় প্রবাদে প্রবাদের স্বরূপ As the people so the Proverbs. [৪২] ফরাসী পণ্ডিত-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় ; Proverbs are crystalized form human experience. [৪৩] অ্যারিস্টোটল যাকে, Fragments of an elder wisdom[৪৪] বলে অভিহিত করেছেন। আবার Ray. B. Browne তাঁর The wisdom of many : Proverbs and proverbial Expressing নামক গ্রন্থে বলেন --

> Proverbs and Proverbial expression ane now and apparently always have been an integral part of people lives. They are an element of culture of people on all levels of society, from the most ignorant of the most sophisticated. [৪৫]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবাদ হলো জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধি, দ্বিভাষিক বাক্যের আয়োজন বুদ্ধিময় জ্ঞানভাণ্ডার ইত্যাদি। তাছাড়া প্রবাদ সহজ-সরল লোকজ ধারায় উপস্থাপিত ; যেখানে জাতির ঐতিহ্যের যোগসূত্র নিহিত আছে। সর্বোপরি অসংস্কারিক প্রবাদ রূপক বক্রোক্তি, বিরোধাভাস ও অতিশয়োক্তি অলংকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রবাদের স্বরূপ

পৃথিবীর সকল দেশে সকল ভাষাভাষী জাতি বা সম্প্রদায়ের মুখরচিত সাহিত্যিক সম্পদ হলো 'প্রবাদ'। এ কথাটি বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য। পল্লীর দরিদ্র নিম্ন আয় স্তরের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এ প্রবাদ ব্যবহার করে। তার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষিতজনরা প্রবাদের প্রায়োগিক ব্যবহার করে না ; তারাও বিভিন্ন উপমায় এ প্রবাদ ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ হানিফ পাঠান- এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেন ; প্রবাদগুলো গ্রাম্য বিচার-বির্তকে, মেয়েলি বিবাদে-বিসম্বাদে-উৎসব আলাপে মানুষের মুখ হতে আপনি বের হয়ে পড়ে।[৪৬] একথাও স্বীকার্য যে, কাউকে আনন্দদান তথা কারো তুষ্টি বিধানের জন্য এ ক্ষুদ্র বড়ুয়া জনগোষ্ঠী প্রবাদ ব্যবহার করে না কখনো।

প্রবাদ বাক্যের আদিস্রষ্টা অতি সাধারণ মানুষ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সাধারণ লোকজন একজনের দেখাদেখি আরেকজন অথবা বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করে এ প্রবাদগুলো। এগুলো শ্রুতিমধুর ও কর্ণসুখকর না হলেও তারমধ্যে একটা অর্ন্তনিহিত অর্থ লক্ষণীয়। সুশীল কুমার-এর ভাষায়-ইহা সাধারণের নির্বিশেষ সম্পত্তি। সেইজন্য ইহার বা উহার একালের বা সে কালের নয়। ইহা সর্বকালের সর্বজনের।[৪৭] অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের ন্যায় এ জনগোষ্ঠীর সাধারণ লোকজন কথায় কথায় প্রবাদ না বললেও বিদ্রূপবশত একজনকে আরেকজনের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এ প্রবাদগুলো সচরাচর ব্যবহার করে। এগুলো ব্যবহারের কোনো কালাকল নেই, সময়-অসময় নেই, কথা প্রসঙ্গে বিশেষ করে তর্কাতর্কি, ঝগড়ায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এগুলোর প্রয়োগ হয়। এককথায় বলা যায়, প্রবাদের সরল অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গীর জন্যই এর এত কদর, সহজবোধ্যতা এবং সারল্যতা জন্য সাধারণ মানুষ প্রবাদকে তার প্রাত্যহিক জীবনে গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে।[৪৮] বড়ুয়া জনগোষ্ঠির প্রবাদ দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ নয় তবে তাদের সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবনাযোগ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের সরস অভিব্যক্তি সেখানে বিরাজমান। সংগ্রামময় জীবনযাপনে প্রবাদ ত্রুটি-বিচ্যুতির কঠোর সমালোচকও বটে। এগুলো যারা প্রয়োগ করে তারা শিক্ষিত নয়, অক্ষরজ্ঞান তাদের একেবারে নেই বললেও চলে ; অতি সাধারণ মানুষই প্রবাদের আশ্রয়ভূমি। শুধু এ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নয় বরং পৃথিবীর প্রবাদ ব্যবহারকারী সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই এটি সত্য। অর্থাৎ যারা প্রবাদের ব্যবহারকারী, সংরক্ষক ও প্ররক্ষক সবাই অক্ষর জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষ। শিক্ষিতজন এ গুলোকে পরে সাহিত্যিক রূপ দেয়।

প্রবাদ নিরক্ষর সমাজের মুখনিঃসৃত বলে এগুলোতে নিরেট বাস্তবতা উন্মুক্ত সরলতা ও ব্যঞ্জনাময় রসিকতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষিত কবি সাহিত্যিকদের রচনা সেরূপ সুলভ নয়। কারণ তাঁদের রচনা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিতজনদের জন্য রচিত বলে শিল্পগুণসম্পন্ন হয়। অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে এগুলো তাদের মুখে আপনি বাহির হয়ে পড়ে বলে কোনো রুচির ধার তারা ধারে না। এজন্য প্রবাদগুলো নিরাবরণ শিশু সৌন্দর্যের অধিকারী।[৪৯] যারা এ প্রবাদ রচনা করে তাদের কবিত্বময় জ্ঞান তথা জীবনের স্পন্দন সম্পর্কে ধারণা অন্যান্যদের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বেশী। মোটকথা কোনো দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বা অন্তরের গভীর অনুভূতি হতে সৃষ্টি সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাময় বাক্য বা বাক্য সমষ্টির নাম প্রবাদ। এ জনগোষ্ঠীর প্রবাদ হতে পারে জাতীয় সাহিত্য সাধনার অন্যতম উৎস ; যা সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের লোকসাহিত্য আরো বেশী সমৃদ্ধতম হবে। এ জনগোষ্ঠীর প্রবাদগুলো নিম্নরূপ ;

## ২.১. নারীবিষয়ক প্রবাদ

নারী চরিত্রকে নিয়ে সবসমাজে জল্পনা-কল্পনা করা হয়। এ জনগোষ্ঠী নারীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রবাদে তুলে ধরে --

সতী নারীর পতি জানঅঁ
পর্বতের চূড়া
অসতীরঅঁ পতি জানঅঁ
ভাঙ্গা নৌকা মুড়া [৫০]

অর্থাৎ সতী নারী পর্বতের চূড়ার ন্যায় দণ্ডায়মান। অসতী ভাঙ্গা নৌকা মুড়ার মতো সবার অবহেলার পাত্র।

লাজার দোষে লাজ্য নষ্ট
পজা কষ্ট পায়
নারীর দোষে সংসার নষ্ট
পুরুষ কষ্ট পায়। [৫১]

অর্থাৎ রাজার দোষে রাজ্যে যেমন নানারকম অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়ও অসন্তোষকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ; তেমনি নারীর দোষে সংসারে পুরুষ কষ্ট পায়।

কারিগরঅঁর ভাআঁ ঘর
ডাক্তাঅঁর বউঅঁর নিত্যি জ্বর।[৫২]

অর্থাৎ কারিগরের সবসময় ভাঙ্গা ঘর থাকে আর ডাক্তারের বউয়ের নিত্য জ্বর থাকে।

লাজায় পাপ গইরলে
লাজ্যরে ধরে
স্ত্রীর পাপ গইরলে
স্বামীরে ধরে।[৫৩]

অর্থাৎ রাজা পাপ করলে তার পাপরাশির পুঞ্জিভূত অভিশাপ রাজ্যকে গ্রাস করে আর স্ত্রী পাপ করলে তার কৃত পাপের পাপরাশি স্বামীকে গ্রাস করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১. সতীনবিষয়ক প্রবাদ

কোন সমাজেই সতীনকে কেউ ভালোভাবে মেনে নেয় না বরং সতীন পরিবারে কন্টকস্বরূপ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সতীন সম্পর্কিত প্রবাদ নিম্নরূপ --

দুআঁ বউ যার সুখ নাই তার
উগ্গা বউ যার ডাল ভাত তার।[৫৪]

অর্থাৎ যার পরিবারে বউয়ের সংখ্যা দুইজন তার ঘরে সুখ নাই। কিন্তু যার ঘরে একজন বউ তার ঘরে ভাল ভাত হলে সুখ শান্তি আছে।

দুআঁ বউ যার নিত্যি কইজ্জ্যা তার
উগ্গা বউ যার দুধভাত তার।[৫৫]

অর্থাৎ যার পরিবার দুই বউ আছে তার সংসারে সবসময় ঝগড়া লেগে থাকে। কিন্তু যার একজন বউ তার ঘরে প্রতিনিয়ত দুধ ভাত খাওয়া যায়।

নিম তিতা সয়
সতীনের তিতা নয়।[৫৬]

অর্থাৎ তিতার মধ্যে নিম পযর্ন্ত খাওয়া যায় কিন্তু সতীনের জ্বালা-যন্ত্রনা সহ্য করা যায় না।

২.১.২. বিধবা নারীবিষয়ক প্রবাদ

সব সমাজ-সংসারে বিধবা নারীকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। হরেকরকম লাঞ্ছনা ও মানসিক অত্যাচার যেন তাদের নিত্যদিনের সাথী। এ সম্পর্কিত এ জনগোষ্ঠীর প্রবাদ নিম্নরূপ ;

বিধাবা নারী
যাইত ন পারে সহসা
শ্বশুর বাড়ি ছাড়ি।[৫৭]

অর্থাৎ ইচ্ছা করলে বিধাবা নারী সহজেই শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যেতে পারে না।

স্বামী ছাড়া বউ
মাঝি ছাড়া নাউ।[৫৮]

অর্থাৎ মাঝি ছাড়া নৌকার যেমন কোনো গুরুত্ব থাকে না, তেমনি স্বামী ছাড়া স্ত্রীর সমাজসংসারে মূল্য নেই।

২.১.৩. বধূ চরিত্রবিষয়ক প্রবাদ

বিভিন্ন কারণে বধূরচরিত্র নষ্ট হয়ে থাকলেও তন্মধ্যে পুকুরের ঘাটকে অনেকেই দায়ী করে। যেমন ----

চাইল্যা নষ্ট হাডঅঁত
বউ নষ্ট ঘাডঅঁত[৫৯]

অর্থাৎ চালতা (টক জাতীয় এক রকম ফল) হাটে নষ্ট হয় অর্থাৎ বিক্রি হয় ; তেমনি বউ পুকুরের ঘাটে নষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৪. শাশুড়ি-বউ বিষয়ক প্রবাদ

শাশুড়ির ভাল যেমন দিক আছে তেমনি আবার আছে মন্দ দিকও। এ সম্পর্কিত অসংখ্য রসময় প্রবাদ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর রয়েছে ;

মাঝি গুনে নউ
অউরী গুনে বউ।[৬০]

অর্থাৎ সুদক্ষ মাঝি যেমন দৃঢ়তার সাথে যাত্রীদের পরপারে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম তেমনি সতত স্নেহময়ী মা সাদৃশ্য শাশুড়ি বউকে সুন্দর করে সংসারী করে তোলে।

মুসরী হঅঁয়
শাশুড়ি নঅঁয়।[৬১]

অর্থাৎ মনের মত শাশুড়ি পাওয়া খুবই দূরূহ ব্যাপার। তবে শাশুড়ি পাওয়া না গেলেও মুসরী পাওয়া সম্ভব।

যে ঘরে নাই অঁউরী
সে ঘরে নাই শ্রী।[৬২]

অর্থাৎ শাশুড়িবিহীন পরিবারে কোনোরকম মাধুর্যতা পরিলক্ষিত হয় না ; এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

মা ঝি যিউত
ভাত নাই বউর হিউত।[৬৩]

অর্থাৎ নতুন বউয়ের সংসারে শাশুড়ি এবং ননদ থাকলে নববধু সেখানে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়।

২.১.৫. বিবাহিত মেয়ের পিতৃ বাড়িতে অবস্থানবিষয়ক প্রবাদ

বিবাহিত মেয়ের বাবার বাড়িতে অবস্থান কোনো সমাজ-বর্ণ ও সম্প্রদায়ে ভালোভাবে মেনে নেয় না। এ সম্পর্কিত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রবাদ নিম্নরূপ ;

কঅঁর নষ্ট পরনে
মেয়ে নষ্ট বাপের ঘর বরনে।[৬৪]

অর্থাৎ কাপড় যেমন পরিধানে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি বাপের ঘরে মেয়ের অবস্থানে তার সংসার নষ্ট হয়ে যায়।

গরম ভাতঅঁত ঘি নষ্ট
বাপেঅঁর বাড়িইত ঝি নষ্ট।[৬৫]

অর্থাৎ গরম ভাতের পাশে ঘি রাখলে তা যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি বাপের বাড়ী অধিককাল মেয়ে অবস্থান করলে তার সংসার নষ্ট হয়ে যায়।

২.১.৬. মা-মেয়ে বিষয়ক প্রবাদ

অধিকাংশ সময়ে জিনগত কারণে মা'র স্বভাব, চরিত্র ও চালচলন মেয়ে আয়ত্ব করে। এ অর্থে এ জনগোষ্ঠীর প্রবাদ ;

Dhaka University Institutional Repository



মা চাআঁ ঝি চাআঁ।[৬৬]

অর্থাৎ মা যেমন তার মেয়েও সহজাতকারণে তার মত হয়।

মাঁর ঝি রইম বিবি
যেন মাঁর হেন ঝি।[৬৭]

অর্থাৎ মা এবং মেয়ের স্বভাব একই রকম অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

### ২.১.৭. দুশ্চরিত্রবিষয়ক প্রবাদ

এ রকম চরিত্র সমাজ কর্তৃক নিন্দিত। সবাই তাকে ধিক্কার দেয়। এ চরিত্রের অধিকারী নারীকে চেনা ও জানা উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবাদ এদের মধ্যে প্রচলিত ;

সোনারূপা খারাপ হলে
বাইন্যার বাড়ি যায়
মেয়ে খারাপ হলে
বাপের বাড়ি যায়।[৬৮]

সোনারূপা খারাপ হলে স্বর্ণকারের মাধ্যমে তার সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়। কিন্তু মেয়ে খারাপ চরিত্রের হলে শশুড় বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যায়।

যে মাইয়া পোআঁ পান খেয়ে
জিব্বার আগা চায়
সে মাইয়া পোআঁ খারাব চরিত্রের
আগে চিনা যায়।[৬৯]

অর্থাৎ যে সমস্ত মেয়ে মানুষ পান খেয়ে জিহ্বার অগ্রভাগ এক নজরে দেখে সবাই তাদেরকে খারাপ চরিত্রের মনে করে।

## ২.২. চাষাবাদবিষয়ক প্রবাদ

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষই কৃষি নির্ভর। এ প্রবাদগুলোর মধ্যে কৃষি কাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ;

ভুঁই গুনে রোআঁ
মা গুনে পোআঁ।[৭০]

অর্থাৎ মা যদি ন্যায়-পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হয় তেমনি তার সন্তান হয়। অনুরূপভাবে ভূমি যদি উর্বর হয় শষ্যাদিও তেমনি ভাল হয়।

আঁরা গায়ের চাষা
লাঙ্গল জুয়াল কাঁদে লইয়ুম
দুআঁ অঙ্গেঁ বলদ লইয়ুম
ইআঁন আঁরার পেশা।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ গ্রামের কৃষকদের পেশা কৃষিকাজ, তারা লাঙ্গল-জোয়াল এবং দু'টা বলদ নিয়ে মাঠে কৃষি কাজ করতে যায়।

ইতরি নাকল বিরতরি পাল
পোহাইত্যা জোড়ে
বৈদরঅঁ হাল।[৭২]

অর্থাৎ লাঙ্গল জুয়াল নিয়ে বৈদ্যর চাষা খুব ভোরে মাঠে হাল দিয়ে চাষ শুরু করে।

কি হাল চঅঁয় বহরাঁর বলে
এক হউল ন যায় তেচারা চলে।[৭৩]

অর্থাৎ কৃষক তার বাহুবলে যে হাল দিয়ে জমি কর্ষণ করে তা মাটির ভিতরে এক আঙ্গুলও না গিয়ে হালকাভাবে মাটির উপর দিয়ে বেঁকে চলে যায়।

## ২.৩. ধনী-দরিদ্র বিষয়ক প্রবাদ

যুগে যুগে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে একটা দূরত্ব বিরাজমান। এ প্রবাদগুলোর মধ্যেও তা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। যেমন ;

তেইল্যাঁ মাথায় তেল দাও
পুঅঁনা মাথায় ভাঅঙ্গ বেল।[৭৪]

অর্থাৎ যাদের অর্থ সম্পদ আছে তাদেরকে আদর আপ্যায়ন ও ঋণ দেওয়া যায়, আর যাদের কিছুই নেই তাদের তা করার এবং দেওয়া প্রয়োজন নেই।

চাপ করইজ্জ্যাঁ চাপ করইজ্জ্যাঁ
গরম ভাতের থালা
কালা করইজ্জ্যাঁ কালা করইজ্যাঁ
পানি ভাতের থালা।[৭৫]

অর্থাৎ অর্থ বৈভবসম্পন্ন ব্যক্তিরা গরম ভাতদ্বারা আপ্যায়িত হয় আর দীন-দরিদ্র অসহায় মানুষ পানিভাত দ্বারা আপ্যায়িত হয়।

তেইল্যাঁ মাথায় তেল
হাতিল্যাঁর মাথা টাডাই গেল।[৭৬]

অর্থাৎ যাদের প্রাচুর্যে ভরপুর তাদেরকে দিতে কাপর্ণ্যতা না করলেও যাদের কোন সহায়সম্বল নেই তাদের দিতে নেই তা লক্ষ্য করা যায়।

তুই দি আঁরে মুই দিয়া।[৭৭]

অর্থাৎ যেসমস্ত ধনী ব্যক্তিরা টাকা পয়সা ঋণ নিয়ে দিতে পারবে তাদের দেয়া শ্রেয়, অন্যকে দেওয়া উচিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

## ২.৪. আলস্যবিষয়ক প্রবাদ

অলসতা বয়ে আনে জীবনে চরম অভিশাপ। এ অলসতাই দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। তাই অলস ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। এ প্রসঙ্গে প্রবাদ নিম্নরূপ ;

আছে গরু ন চয় হাল
দুঃকখ ন যায় সর্বকাল।[৭৮]

অর্থাৎ যাদের গরু থাকার পরও হালচাষ করে জীবনে টিকে থাকার মৌলিক উপাদান খাদ্য যোগার করে না তাদের চিরকাল দুঃখ তাদের অনুসরণ করে।

অলসের নাইদি কালাকাল
দুঃক তাদের সারাকাল।[৭৯]

অর্থাৎ অলস চিরকালই অলস থাকে। কোন কার্য তারা সঠিক সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। তাই দুঃখ তাদের পিছু ছাড়ে না।

ভাত ন জোটে কোআঁলর দোষে
রাইত পোহাইলে বিডারে দোষে।[৮০]

অর্থাৎ পুণ্য যেভাবে সুখ নিয়ে আসে তেমনি আলস্যতার প্রভাবে ব্যক্তি তার দারিদ্রতা ডেকে নিয়ে আসে।

## ২.৫. গুণবিষয়ক প্রবাদ

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু গুণ থাকে। আবার অনেকে বংশ পরম্পরায় সেই গুণ অর্জন করে। এ সম্পর্কিত প্রবাদ এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত --

ভআঁই কইলি রং গআঁরে
পেডআঁত থাইলে গুন করে।[৮১]

অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই কারো মনের কথা বলা উচিত নয়। বললে সবাই হাসাহাসি রং তামাসা করে। কিন্তু সেই কথা যদি আবার মনে মনে রেখে দাওয়া যায় তা পরবর্তীতে তা গুণ করে।

কথা রশি নয়
পচি যাইত।[৮২]

অর্থাৎ রশি পঁচে যায় কিন্তু কথা রশি নয় যে তা পঁচে যায়। তা দীর্ঘদিন মনে থাকে।

গুষ্টির ধরা বায়আঁন এর কড়া
বঁউত ন হইলে তোরা তোওরা।[৮৩]

অর্থাৎ বংশজাত সন্তানের মধ্যে অধিক পরিমাণে না হলে তার মধ্যে বংশানুক্রমে অল্প গুণ থাকা স্বাভাবিক।

কইলে কথা লরা লরা
ন কইলি কথা পেট ভরা।[৮৪]

অর্থাৎ কথা বললে অনেক অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু না বললে সেই কথা হৃদয়ে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

## ২.৬. ভোজনবিষয়ক প্রবাদ

ভোজন সম্পর্কিত অসংখ্য প্রবাদ এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। যেমন ;

উনাঁ ভাতে দুনাঁ বল
অধিক খাইলে রসাতল।[৮৫]

অর্থাৎ যারা অধিক পরিমাণে আহার গ্রহণ করে তাদের চেয়ে যারা কম আহার করে তারা অধিক বলশালী।

উনা ভাতে দুনাঁ বল
এতরা ভাতে রসাতল।[৮৬]

অর্থাৎ যারা কম ভাত খায় তারা সকল কাজে আনন্দ পায়। আর যাদের সব খায় খায় ভাব তারা কিছুই করতে পারে না।

কথায় কথা বাড়ে
বেশী ভাতে পেট বাড়ে।[৮৭]

অর্থাৎ কথা দিয়ে কথা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বেশী ভোজনে পেট বড় হয়ে যায়।

হইল ভাত পরানের বড়ি
খাই পেলাইলাম তাড়াতাড়ি।[৮৮]

অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণে উনন থেকে নামানের পর পরই অনেকে অন্নগ্রহণে দেরি করে না, এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

## ২.৭. উপমাবিষয়ক প্রবাদ

গ্রাম বাংলার সমাজব্যবস্থায় কথায় কথায় উপমা প্রয়োগ সর্বজনবিদিত। উপমা প্রয়োগে তাদের পাণ্ডিত্যর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও উপমা প্রয়োগ রীতির প্রচলন দেখা যায় ----

আগঅঁর হলে যেইহিক্কা
পিচর হলে হেইহিক্কা।[৮৯]

অর্থাৎ সামনের গরু যেদিকে যায় একই ভাবে পিছনের গরুও তাকে অনুসরণ করে। অনুরূপভাবে পরিবারে বড় ভাই যা করে, ছোট ভাই সে-ই কাজ সম্পন্ন করে।

এক খেত আরেক পুত।[৯০]

অর্থাৎ একটি পরিবার চাষাবাদ ও শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তেমনি আবার তার বাধ্য-অবাধ্য সন্তানের মাধ্যমে সমাজে সম্মানিত এবং অসম্মানিত দুই-ই হতে পারে।

বাপ চাআঁ পুত চাআঁ।[৯১]

অর্থাৎ বাবা যদি গুণী, বিদ্যাধর, নৈতিক, চরিত্রবান, সৎ, প্রজ্ঞাবান হয়ে থাকে তেমনি তার সন্তান সেই রকম হয়।

মার বইন মাসী মারতুন বেশী।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ মা'র তুলনায় ভাগিনা-ভাগিনীকে মাসী বেশী আদর যত্ন করে এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

হইলে পুত ন হইলে দুক।[৯৩]

অর্থাৎ সন্তান ভালো হলে মা বাবার কোনো দুঃখ থাকে না, যদি তা না হয় সারাজীবন মা-বাবাকে চরম দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়।

গরীবের গরীবানা
নুন দিয়ে চিনি পানা।[৯৪]

অর্থাৎ গরীবেরা প্রায়শ আতিথেয়তায় চিনির পরিবর্তে লবণ দিয়ে চা তৈরী করে এ অর্থে ব্যবহৃত।

ডেকা গরু বাঘা চাষ
পুঁতে গইরজে আর সর্বনাশ।[৯৫]

অর্থাৎ বলগা চাষ এবং গরু বাছুর যেমন মানুষের যেমন উপকারে আসে না তেমনি সন্তান-সন্ততি অনেক সময় মা-বাবার অশান্তির কারণ।

## ২.৮. মা বিষয়ক প্রবাদ

জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত মার স্নেহ-মায়া-মমতা সবাইকে আকৃষ্ট করে। মা বলতেই মনের অশান্তি বিদুরিত হয়ে মনে শান্তি বিরাজ করে। মার অফুরন্ত ভালবাসা চিরদিন সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। মা বিষয়ক কিছু প্রবাদ নিম্নরূপ ----

লতা খাইলাম পাতা খাইলাম
ভাতের সমান নয়
সতাই মায়ে মা ডাকিলাম
মাআঁর সমান নয়।[৯৬]

অর্থাৎ ভাতের সমান কোনো খাবারই হতে যেমন পারে না তেমনি বিমাতাকে মা ডেকে মা ডাকার যে অনুভূতি তা উপলব্ধি করা যায় না।

মা নাই ঘরে যার
সংসারে সুখ নাই তার।[৯৭]

অর্থাৎ মা বিহীন সংসার সাগরের পানির মতো মনে হয়। একটুখানি মায়ের মুখ দর্শন সন্তানের সমস্তপ্রকার দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে সুখ শান্তিতে বসবাসে সাহায্য করতে পারে।

মা মরলে বাপ তালই।[৯৮]

অর্থাৎ মমতাময়ী মা মারা গেলে বাপ সন্তান-সন্ততির আর কোন খবর রাখে না।

পশু পাখি জানার আগে
জানে মায়ের মন।[৯৯]

অর্থাৎ সন্তান সন্ততির কোন বিপদ ঘটলে তা কেউ জানার আগে মা'র মনে জানা হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

## ২.৯. অহংকারবিষয়ক প্রবাদ

অহংকার চিরাচারিত প্রথার মধ্যে অন্যতম। অহংকার পতনের মূল তথাপি অহংকারবোধ নেই এমন মানুষ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। এ অহংকার বিষয়ক প্রবাদ নিম্নরূপ ----

অহংকার যার ধ্বংস তার।[১০০]

অর্থাৎ যিনি অহংকার করে সমাজসংসারে চলাচল করে তার একদিন না একদিন পতন বা ধ্বংস হবেই।

সুন্দরঅঁর ভান তেজপাতার নান
বটগাছঅঁত লটকাই এইজ্জে মদ্দ ন চুঁই পান।[১০১]

অর্থাৎ যে সমস্ত মেয়ে নিজেদেরকে সুন্দরী মনে করে অহংকার করে তাদের সহজেই বিয়ে হয় না।

ট্যাঙা পইসা গায়ের চাআঁতা
আইজ আছে কাল নেই।[১০২]

অর্থাৎ টাকা পয়সার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজ যার অঢেল ধন-সম্পত্তি কাল সে দরিদ্র হয়ে যায়। এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

## ২.১০. অধ্যাবসায় বিষয়ক প্রবাদ

অধ্যাবসায় মানবজীবনে সফলতার সর্বোকৃষ্ট পন্থা। অবিরাম সাধনা তথা ধৈর্য্যর সাথে যে কোন কাজ করলে সফল অবশ্যম্ভাবী। এ সম্পর্কিত প্রবাদ নিম্নরূপ ----

গাইতে গাইতে গলা
হাঁইটতে হাঁইটতে নলা।[১০৩]

অর্থাৎ গান করতে করতে সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী যেমন হয় ; তেমনি আবার হাঁটতে হাঁটতে শরীরের ভেতরের সরু হাড় শক্ত হয়।

গাইতে গাইতে গায়ক
বাজাতে বাজাতে বাদক।[১০৪]

অর্থাৎ গান করতে করতে একসময় গায়ক যেমন হওয়া যায় ; তেমনি বাজাতে বাজাতে একদিন সুদক্ষ বাদকও হওয়া যায়।

কইতে কইতে কতা
পঁইরতে পঁইরতে হাঁটা।[১০৫]

অর্থাৎ ছোট ছোট শিশুরা আস্তে আস্তে কথা বলতে একসময় কথা বলা শুরু করে তেমনি আবার তারা পরতে পরতে হাটা শিখতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১১. বিদ্রূপবিষয়ক প্রবাদ

শ্লেষমিশ্রিত উপহাস, তামাশামূলক প্রবাদ এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। গ্রামের সহজ ও সরল মানুষ এ প্রবাদে পারদর্শী। এরকম প্রবাদ ----

যতক্ষণ পাতঅঁত ভাত
ততক্ষণ আশীর্বাদ।[১০৬]

অর্থাৎ যতক্ষণ পযর্ন্ত মানুষ খাওয়াতে পারে, পরাতে পারে, দিতে পারে সেইক্ষণ পযর্ন্ত মানুষ তার গুণগান করে, পরে নয়।

হাইঅঁ লক্ষী য বালাই।[১০৭]

অর্থাৎ আসলেও আবার না আসলেও লাভ বা ক্ষতি নেই।

বঅঁর বইন ফু কুত্তার নাআঁন লু।[১০৮]

অর্থাৎ কুকুর যেমন যা দেখে তা খেতে চায় অনুরূপভাবে বাপের বোনও বাড়ীতে আসলে সব খেতে চায়।

ভাত ছিডিলে কাউআঁর অভাব নাই।[১০৯]

অর্থাৎ টাকা পয়সা দিলে লোকজনের তেমন কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

হেডাম নাই যার বড় বড় কথা তার।[১১০]

অর্থাৎ যার সামর্থ নেই তার বড় বড় কথা প্রকাশ কিংবা উচ্চারিত হয়।

যে ফুল নিন্দু সে ফুল ফিন্দু।[১১১]

অর্থাৎ যাকে ঘৃণা করা হয় তাকেই আবার গ্রহণ করতে হয় ; এ অর্থে ব্যবহৃত।

দেইত ন পারি যারে হাঁটতে ভেংচি দিই তারে।[১১২]

অর্থাৎ যাকে অপছন্দ হয় তাকে সব সময় উপহাস করা হয়। এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত।

২.১২. সর্তকতাবিষয়ক প্রবাদ

সতর্কতার অভাবে মানুষ অনেক সময় নানারকম বিপদের সম্মুখীন হয়। বিভিন্নভাবে অপমানিত হয় ; এ সম্পর্কিত প্রবাদ নিম্নরূপ ;

নিতাই নিমন্ত্রণে আগে
ঝগড়ায় পিছে।[১১৩]

অর্থাৎ নিমন্ত্রণে খাবার সবসময় আগে খেতে হয় কিন্তু ঝগড়ায় যেতে হয় সবার পিছনে।

আগে গেইলে বাগে খায়
পিছে গেইলে সোনা পায়।[১১৪]

অর্থাৎ ঝগড়ার বিবাদে আগে গেলে মামলা মোর্কদমায় জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সেখানে পরে গেলে তা হতে রেহাই পাবার সম্ভাবনা থাকে।

হোঁসে হোঁসে চইল্লু খোঁসে খোঁসে হাঁইটটু।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নিজ চিন্তা-চেতনা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে পথ চলতে হবে আর পরিমাণমত খাবার গ্রহণ করতে হবে।

ওজন বুঝে ভোজন কর।[১১৬]

অর্থাৎ পেটের আন্দাজ বুঝে ভোজন করা আবশ্যক অর্থে এ প্রবাদ।

## ২.১৩. বংশবিষয়ক প্রবাদ

সমাজব্যবস্থায় বংশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বংশ জেনে বুঝে মানুষ সম্পর্কন্নোয়নে বা আত্মীয়করণে এগিয়ে আসে। এ সম্পর্কে প্রবাদগুলো নিম্নরূপ ;

গাছ চিনে বাঁকলে মানুষ চিনে আঁকলে।[১১৭]

অর্থাৎ গাছকে তার আঁশ দিয়ে যেমন চেনা যায় তেমনি মানুষকে চেনা যায় তার নিজ জ্ঞান দিয়ে ;

বৃক্ষ তার ফলে পরিচয়।[১১৮]

অর্থাৎ মানুষের কর্মদক্ষতা ও আচার-আচরণের মধ্যেই তার বংশের পরিচয় নিহিত থাকে।

নদী মরে গেলেও লেক থাকে।[১১৯]

অর্থাৎ বংশ পরম্পায় সবাই চলে গেলে পরবর্তী উত্তরাধিকারীরাই তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

## ২.১৪. দানবিষয়ক প্রবাদ

দান মানুষকে মহৎ হতে শেখায়। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সম্পর্কিত প্রবাদ নিম্নরূপ ----

দানে পুণ্য আনে পাপে আনে দুক।[১২০]

অর্থাৎ যত দান করবে তত পুণ্য সঞ্চয় হবে, আর পাপ করলে দুঃখ প্রতিনিয়ত পিছ লেগে থাকবে।

দানে দূর্গতি খণ্ডে।[১২১]

অর্থাৎ দানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার লাঞ্ছনা ও দূরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

## ২.১৫. জনরববিষয়ক প্রবাদ

আবেগবশত অনেক সময় মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠে। এ সম্পর্কিত প্রবাদ নিম্নরূপ ----

যার বিয়ে তার খবর নাই
পাড়ার লোকের ঘুম নাই।[১২২]

অর্থাৎ যার বিয়ে হবে তার কোনরকম খোঁজ খবর না থাকলেও পাড়া প্রতিবেশীদের মনে এক ধরনের আনন্দবোধ কাজ করে।

পোআঁ হইব যার
ঘুম নাই তার মার।[১২৩]

অর্থাৎ যার প্রসবকাল সমাসন্ন সে ঘুমালেও তার মা ঘুম যেতে পারে না, এ অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত ;

Dhaka University Institutional Repository

## ২.১৬. চোরবিষয়ক প্রবাদ

চুরি করা ঘৃণ্য কাজের মধ্যে অন্যতম। সবাই এ রকম কাজকে নিন্দা করে। এ সম্পর্কিত প্রবাদ ----

চোরের দশ দিন গৃরস্থির একদিন।[১২৪]

অর্থাৎ চোর যতই চালাক হোক না কেন গৃহস্থের হাতে একদিন ধরা পড়বেই।

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা
যদি না পড়ে ধরা।[১২৫]

অর্থাৎ চুরি করতে গেলে অদম্য সাহস এবং চালাক হতে হয়। যতক্ষণ পযর্ন্ত চুরি করতে গিয়ে ধরা না পড়ে ততক্ষণ পযর্ন্ত এ পেশাকে মহৎ পেশা বলে চোর উল্লেখ করে।

## ২.১৭. চাটুকার বিষয়ক প্রবাদ

চাটুকারিতা স্বভাবত কারোই পছন্দ নয়, তবু অনেকেই চাটুকারিতায় বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে প্রবাদ নিম্নরূপ ----

আধসের চৈল দুই আন পিডা
যার কথা শুনে তার কথা মিডা।[১২৬]

অর্থাৎ নিজের আচার-বিচারকে গুরুত্ব না দিয়ে অপরের কথায় তাল দিয়ে চলা অর্থে এ প্রবাদ ব্যবহৃত ;

যে কয় রাম তার সঙ্গে যাম।[১২৭]

অর্থাৎ যে যা-ই বলুক না কেন প্রতিজনের প্রত্যেক প্রশ্নোত্তরে সম্মতি জ্ঞাপনার্থে এ প্রবাদ ব্যবহৃত।

## ২.১৮. যথার্থ শিক্ষাবিষয়ক প্রবাদ

অনেকেই আছে যারা কারো কথায় তেমন কর্ণপাত করে না। এমতাবস্থায় তাদের শাসন করা এবং সমুচিত শিক্ষা প্রদান অর্থে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ----

হাডঅঁত লাথি ঘাডঅঁত কিল
যার কোআঁলে যে বিতিল।[১২৮]

অর্থাৎ অন্যায় আচার-আচারণ করলে হাটে, ঘাটে, বিলে সবখানে অপমানিত হবার সম্ভবনা থাকে।

লাথির কাঁঠালে লাথিতে পাঁকে।[১২৯]

অর্থাৎ যে যেমন তাকে সেভাবে শিক্ষা দিতে হয় এ অর্থে ব্যবহৃত।

পোআঁ মারতে হয় ছোডঅঁ থাইকতে
জাইল্যা মারতে হয় নাওঅঁত থাইকতে।[১৩০]

অর্থাৎ শিশুকে বাল্যকালে যথার্থ শিক্ষা দিতে হয় তেমনি জেলেকে কোন কারণে গায়ে হাত দিয়ে আঘাত করতে চাইলে তা অবশ্যই নৌকায় থাকাকালীন অবস্থায় আঘাত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## ২.১৯. আশাবিষয়ক প্রবাদ

আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আবার এ আশাই সংগ্রামময় জীবনে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করে। এ সম্পর্কিত প্রবাদ--

মানুষ আশায় বাঁধে বাসা।[১৩১]

অর্থাৎ মানুষ আশা করে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধময় জীবনগঠনে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ভাআঁ ঘর ভাঙ্গি ফেলা
ট্যাআঁর ছালা পাইরে পাই
জলঅঁর মধ্যে আঁই
ট্যাআঁর জালা পাই।[১৩২]

অর্থাৎ পুরাতন জরাজীর্ণ ভাঙ্গা ঘর ভেঙ্গে ফেল কেননা আমি মাছ ধরতে গিয়ে জালের মধ্যে টাকার বস্তা পেয়েছি।

## ২.২০. ক্রোধবিষয়ক প্রবাদ

ক্রোধ কেউ আশা করে না। ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে লোভচিত্ত সহযোগে ভাল-মন্দ কাজ সম্পাদনে ব্রতী হয়ে পড়ে।

মাইয়া পোআঁ ঘোস্‌সা বেইশ্যা
মরদ পোআঁ ঘোস্‌সা বাদশা।[১৩৩]

অর্থাৎ মেয়ে মানুষ রাগ করে কোনো কাজ করলে তার পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। অন্য দিকে ছেলে রাগ করে কাজ করলে সে বাদশা হয়।

মুরার উদ্দি বাতাস যাআঁর
কল্লপে থান ন পাআঁর।[১৩৪]

অর্থাৎ পাহাড় পর্বতের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহমান হলে নিচের গাছপালা যেমন টের পায় না, তেমনি পরিবারের উপর ঝড় তুফান গেলে তা তার পরিবারের সন্তান-সন্ততি বুঝতে পারে না।

## ২.২১. বিশ্বাসবিষয়ক প্রবাদ

বিশ্বাস পরম ধন। তবে কিছু কিছু বিশ্বাস অনেকেই সৎকাজে সাহায্য করে। এ সম্পর্কিত প্রবাদ ----

বুড়াঁর কথা কুরার গু
পোআঁর কথা
অমরণ দারু।[১৩৫]

অর্থাৎ বিচার কার্যে বয়োঃবৃদ্ধদের কথা কেউ বিশ্বাস না করলে অবোধ শিশুরদের কথা সবাই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে।

*Dhaka University Institutional Repository*

### ২.২২. কৃপণবিষয়ক প্রবাদ

অনুদার, নীচুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ লোক সহজে অর্জিত টাকা-পয়সা খরচ করতে চায় না। পরে এমন কি তারা নিজেরাও টাকা-পয়সা ভোগ করতে পারে না, অন্যে ভোগ করে থাকে। যেমন ;

মিডাআঁর লাভ পুড়াআঁয় খায়।[১৩৬]

অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি টাকা সঞ্চয় করলেও শেষ পযর্ন্ত সে নিজের হাতে খরচ করতে পারে না।

### ২.২৩. বদ অভ্যাস সম্পর্কিত প্রবাদ

সমাজজীবনে অনেকে এ কুটাভ্যাস পরিপালন করে। এ সম্পর্কিত একটি প্রবাদ ;

দেখিলে মসকারী
ন দেখিলে চুরি।[১৩৭]

অর্থাৎ কোনো জিনিস নেওয়ার সময় কেউ না দেখলে তা চুরি পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু না দেখলে তা চুরি হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ধারণা জন্ম নেয়।

### ২.২৪. নিকট আত্মীয়বিষয়ক প্রবাদ

রক্ত, সম্প্রদায় এবং বংশ অর্থে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

স্ব-স্ব জাতি পরম প্রীতি।[১৩৮]

অর্থাৎ নিজ নিজ সম্প্রদায় জাতি একে অপরের প্রতি তাদের মায়া মমত্ববোধ প্রদর্শন করে।

### ২.২৫. নঞর্থকবিষয়ক প্রবাদ

জীবন বাস্তবতায় অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব হলেও অনেক আত্মীয় স্বজন আপন হতে পারে না। যেমন ;

যম জামাই ভাগিনা
নয় কারো আপনার।[১৩৯]

অর্থাৎ যম, জামাই এবং ভাগিনা কোনো সময় কারো আপন হতে পানে না।

### ২.২৬. জ্যাঁ বিষয়ক প্রবাদ

একই পরিবারে একাধিক জ্যা থাকলে পরস্পর ঝগড়া, তর্কাতর্কি তথা ঈর্ষাপরায়ণ হয়। তাদের কর্ম সম্পাদনে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

জালআঁর কাজ তালে তালে।[১৪০]

অর্থাৎ একই পরিবারে একাধিক বউ থাকলে তালে তালে কাজ সম্পন্ন করা অর্থে এ প্রবাদ ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.

সমাজবদ্ধ হাসোজ্জ্বল মানুষের হৃদয়ে এ ধরনের অমার্জিত, অব্যক্ত পংক্তিগুলো সহজ সারল্যে উপস্থাপিত। এ ধরনের আরো বহু প্রবাদ দেখা যায় এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এ প্রবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত-প্রতিভা জাগ্রত হয়, মানবিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, দায়িত্ববোধে নিজেকে উৎসাহিত করে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো অসংস্কৃত, অসরল ও অমার্জিত মনে হলেও সত্যপ্রতিজ্ঞ জীবনের দ্যুতিমান উপস্থিতি এতে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এগুলো সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম ও হিন্দু আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত।

কীর্তন

'কীর্তন' হলো এক প্রকার গান। চিরসবুজ গ্রামবাংলার তথা বাঙালি সংস্কৃতির এক অনুপম প্রাণ-সম্পদ কীর্তন। কীর্তনের মাধুরী মিশানো সূর ও ছন্দ অনাবিল শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় সংগীত পিপাসুদের মনে। যুগ যুগ ধরে কীর্তনের অমিয়ধারায় বাঙালির হৃদয়-মন হয়েছে সিক্ত, পুলকিত। সে-ই প্রাণ ছোঁয়ার ধারায় আজো বাংলার জনগণ পরম আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে, চরম আনন্দে প্রাণ সঞ্চার হয়। বাংলার 'কীর্তন' সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারায়ণ চৌধুরী বলেন --- বাংলার কীর্তন বাংলার এক জাতীয় সম্পদ। এটিই বাংলার জাতীয় সংগীতরূপে অভিহিত হয়ে থাকে। তার কারণ, এ ধারায় গানে যেমন কাব্যভাবের উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায় তেমনি বাংলার নিজস্ব সংগীতের প্রতিভার জারকরসে জারিত সুরের ঐশ্বর্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য আর সুর এখানে গলাগলি জড়াজড়ি করে মিশে আছে আর এ দুই অংশই এ গানে নাটকীয়তার ভাব খুব প্রবল। বাকী অংশে নাটকীয়তা এসেছে তার আখর যোজনায় আর সুরাংশে এই নাটকীয়তার আরোপ হয়েছে দুরূহ সব তাল-লয়ের অপূর্ব সুসামঞ্জস্য মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে।[১৪১] তবে কীর্তনে কিয়ৎ পরিমাণ নাটকীয়তা থাকবে। আর থাকাটাই নেন স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, এ নাটকীয়তাই হলো বাংলা কীর্তন সংগীতের প্রাণ।[১৪২] কীর্তনে নাটকীয়তার সংমিশ্রণ না থাকলে দর্শকদেরকে আকৃষ্ট করা যায় না। তাই কীর্তনীয়া নিজেই এ নাটকীয়তা সৃষ্টি করে।

'কীর্তন' একটি সংস্কৃত শব্দ। এটি কৃৎ ধাতু যোগে গঠিত। এখানে কৃৎ অর্থ প্রশংসা। অর্থাৎ 'কীর্তন' হলো প্রশংসামূলক, গুণগানমূলক, কাব্যময় ছন্দোবদ্ধ গাথা। যার মাধ্যমে ঈশ্বর, দেবতা, ধর্ম প্রবর্তকদের যশোকীর্তি বর্ণন, যশোকথা, মহামতিদের জীবনাচরণ, ধমীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সুরালা কণ্ঠে প্রকাশিত হয়। এ কীর্তন একদিন বাংলাকে মুগ্ধ করেছিলো, বাঙালিকে পাগল করেছিলো।[১৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

'কীর্তন' ধর্মীয় সংগীত নিঃসন্দেহ। ছন্দোবদ্ধ কাব্যাকারে গ্রথিত ধর্মীয় বিষয়াদি যখন সুরারোপে পরিবেশিত হয় তখন দর্শক শ্রোতার হৃদয়-মন আবেগে সিক্ত হয়। কীর্তন শুধু গীতগান নয়, সুরের বিলাশমাত্র নয়, কীর্তনের সুরশিল্প শুধু সংগীতের বিকাশের জন্য কল্পিত এমন নয়। কীর্তন সুর, কাব্য ও ধর্মের এক সমন্বিত শিল্প। কীর্তনের তিনটি অংশ। যথা : সুর, কাব্য এবং ধর্ম।[১৪৪]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রাচীন বাংলায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে আনুমানিক একাদশ/দ্বাদশ শতাব্দী পযর্ন্ত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা ধর্মীয় আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, করণীয়-অকরণীয়, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কাব্যিক ছন্দে বিবিধ রাগভিত্তিক পদ রচনা করে নিজেরাই সুরারোপ করতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারে গিয়ে কয়েকটি পুঁথি দেখতে পান। একটির নাম 'চর্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'। তাতে কতগুলো কীর্তনের গান আছে। গানগুলো বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত। গানের নাম "চর্যাপদ" থেকে অনুমান করা হয় যে, সেকালেও কীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলোকে চর্যাপদ বলা হত।[১৪৫] এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন- এর কথা দিয়েই বলি--- 'কীর্তন গানের গঠনে চর্যাগীতির সঙ্গে খুবই ভিন্নতা নেই। কীর্তন গীত পদ্ধতিতে চর্যাগীতি পদ্ধতির অনুসরণ খুবই স্বাভাবিক।[১৪৬] চর্যাপদই প্রাচীন বাংলা কীর্তনের অন্যতম নিদর্শন। আমরা যে কীর্তন পাই এখন তা মূলত সে সময়েরই রচিত পদাবলী অনুসরণে অনুরচিত। তবে শাস্ত্রী মহোদয় আবিস্কৃত বৌদ্ধগান ও দোঁহা হতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙলার গান হাজার বছরেরও পুরানো গান। লুইপাদ, নাড় পণ্ডিত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যদের পদ প্রাচীন কীর্তনের রীতিতেই বিরচিত। সে পদ পল্লীতে পল্লীতে গান করে বেড়াত।[১৪৭]

বৌদ্ধদের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধবিহারের কার্যক্রমেও স্থবিরতা নেমে আসে। এ সময় শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী জয়দেব বিদ্যাপতি বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি গায়ক কর্তৃক হিন্দুধর্ম বিষয়ক শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে পদ রচনা ও সুর সংযোজনা ধারাবাহিকভাবে হয় ; যা পদাবলী নামেই বিশেষ খ্যাত। চৈতন্য পরবর্তী শ্রীগৌরঙ্গ দেব (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য/নিমাই পণ্ডিত ১৪৮৬-১৫৩৩)-এর আর্বিভাবের প্রভাবে বাংলায় নতুন করে কীর্তনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তারও বিষয়বস্তু ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা। শ্রীচৈতন্যের আমলে "পদ" এর পরিবর্তে কীর্তন শব্দটির প্রচলন ঘটে। পদ রচনা ও কীর্তন রচনা একই পর্যায়ের এবং সমার্থক। পদাবলী একক গায়কের গান, আর কীর্তন একক সমবেত কণ্ঠের গান।[১৪৮] এ ভাবে ক্রমান্বয়ে 'পদ' কীর্তন-এ পরিবর্তন হবার সাথে তাল লয়েরও পরিবর্তন হয়। তখন ভিন্ন ভিন্ন রীতিতেই কীর্তন পরিবেশন হতো। কীর্তন দু'রকমের;[১৪৯] যথা - ক. কথকতা কীর্তন বা শুক কীর্তন এবং খ. নারদীয় কীর্তন। আবার নারদীয় কীর্তন বা

Dhaka University Institutional Repository

গানের অনেক উপরিভাগ আছে যেমন : বন্দনা কীর্তন, প্রার্থনা কীর্তন, আরতি কীর্তন, অধিবাস কীর্তন, পরবগান কীর্তন, সূচক কীর্তন, নাম কীর্তন, পদাবলী কীর্তন ও লীলা কীর্তন বা পালা কীর্তন। এগুলো কোনোটিরই সৃষ্টি একসময়ে তা নয়। পদাবলী ও পরবগান প্রাচীন হলেও পরবর্তীতে সেগুলো লীলা কীর্তনের রূপ পরিগ্রহণ করে। পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাবে 'নাম' কীর্তনের রূপায়ণ এবং বৈষ্ণবীয় ভজন প্রণালীসূত্রে বন্দনা প্রার্থনা, আরতি ও অধিবাসের সূচনা হয়। উল্লেখ থাকে যে, সূচকগানও প্রাচীনকালের সৃষ্টি, তবে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্যদবৃন্দের সূচক ষোড়শ শতকেরই প্রকরণ। তাছাড়া গড়ের হাটি, মনোহরসাহী, রেনেটি, মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী চাপ কীর্তন, পাল্টা কীর্তন, প্রভাতফেরী কীর্তন ইত্যাদির নাম দেখা যায়।[১৫০] বলাবাহুল্য যে, সকল কীর্তনেরই বিষয় ছিল হিন্দুধর্ম। এ কীর্তন যে একান্তই বাঙালির নিজস্ব গান। যেমন : "বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালার গান কীর্তন। রাগ রাগিনীযুক্ত ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরী বাঙ্গালার গান নয়। বাঙ্গালী তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। বাঙ্গালীর নিজস্ব গান, জাতীয় গান কীর্তন। স্মরণাতীতকাল হতে বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসে, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে যে সুর ঝংকৃত হচ্ছিল তা নিয়েই বাঙ্গালী প্রথম গানের সৃষ্টি।[১৫১] তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন ; বাঙালির কীর্তন গানে-সাহিত্যে এবং সংগীতে এক অপূর্ব মিল সৃষ্টি হয়েছে।[১৫২]

### ৩. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর কীর্তন গান

ষষ্ঠ থেকে আনুমানিক একাদশ/দ্বাদশ শতাব্দীতে যে কীর্তনের গোড়াপত্তন হয়েছিল, সেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পদাবলী ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সম্পূর্ণভাবে সমাজ থেকে লোপ পেয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সারমেধ (১৮০১-১৮৮২), ধর্মপাল মহাস্থবির, অভয় শরণ মহাস্থবির (১৮১৬-১৯২৩), পুন্নাচার মহাস্থবির (১৮৩৭-১৯০৮), কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬), জ্ঞানলংকার মহাস্থবির (১৮৩৮-১৯২৭), অগ্রসার মহাস্থবির (১৮৬০-১৯৪৫), ধর্মবংশ মহাস্থবির (১৮৭২-১৯৩৯ মতান্তরে ১৮৭৯-১৯৭১) প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৮-১৯৭০) বংশদীপ মহাস্থবির (১৮৮০-১৯৭১), বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮)–এর মতো কর্তব্য পরায়ণ, সাধক, সমাজহিতৈষী কর্মবীর প্রাণপুরুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মাঝে আবার নেমে আসে প্রাণের জোয়ার। যে জোয়ারে অবগাহন করে এ জনগোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হতে লাগলো। সচেতন হতে লাগলো নিজেদের অস্তিত্ব আর সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে। এ সময় হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোহন চন্দ্র বড়ুয়া[১৫৩] (১৮৮১-১৯৭৫)। তিনিই বৌদ্ধধর্মীয় কীর্তন রচনায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম নন্দিত বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু কীর্তন রচনা করেননি, নিজে কীর্তনে সুর সংযোজন করতেন এবং কীর্তনীয়া হিসেবে আবার পরিবেশনও করতেন। তিনি কীর্তনকে এক রসোত্তীর্ণ শিল্পে রূপান্তর করার জন্য অবিরাম সাধনা করে গেছেন।[১৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের জীবনোতিহাস, বৌদ্ধধর্মীয় যশোগাথা সুর ও ছন্দাকারে বর্ণন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশনাই হলো বৌদ্ধকীর্তন। অন্যভাবে বললে বলা যায়, বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের লোকল্যাণপ্রদ কীর্তিকথনই বৌদ্ধ 'কীর্তন'। যিনি দর্শক শ্রোতার সামনে আবেগ মিশ্রিত সুরেলা ও সুললিত কণ্ঠে এ কীর্তন পরিবেশন করে, তাকে বলা হয় কীর্তনীয়া। অর্থাৎ যিনি কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন তিনিই কীর্তনীয়া। মোহন চন্দ্র বড়ুয়া বৌদ্ধ কীর্তন হিসেবে প্রথমে অবতার লীলা[১৫৫] পরবর্তীকালে *সিদ্ধার্থের জন্ম* ও *বাল্যলীলা* নামে দুইটি বই প্রকাশ করেন। তারপর ঢপ কীর্তন[১৫৬] আকারে প্রকাশ করলেন *বুদ্ধ সন্ন্যাস*। সাধারণ মানুষ এ কীর্তনের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের নির্যাস কথা উপলব্ধি করতে লাগলো। পরবর্তীকালে অনেকেই বুদ্ধ কীর্তন রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।[১৫৭] যেমন : সর্বানন্দ বড়ুয়া, বিশ্বম্ভর বড়ুয়া, বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, পণ্ডিত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া, সন্তোষ বড়ুয়া, সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, শান্তিরক্ষিত মহাস্থবির।

**৩.১. বৌদ্ধ কীর্তনের অঙ্গ :** কীর্তনের অঙ্গ সর্ম্পকে পারস্পরিক মতদ্বৈততা দেখা যায়,[১৫৮] তবে বৌদ্ধ কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি ; সেগুলো নিম্নরূপ : [১৫৯]

### ৩.১.১ কথা

একটি পদ গাওয়ার পর অন্যপদ গাওয়ার পূর্বে কীর্তনীয়া উভয়পদের সংযোগ সূত্র স্বরূপ যা বলে থাকেন, তা-ই 'কথা'।[১৬০] সংগীতশাস্ত্রেরও লক্ষ্য ও লক্ষণের সমাবেশ নিহিত আছে। এখানে 'লক্ষ্য' অর্থে গান (কথা), 'লক্ষণ' তার শাস্ত্র (রাগ-নিয়মাদি)। বৌদ্ধ কীর্তনে কথার উদাহারণ নিম্নরূপ :

ক. ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদের নিকট ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার উৎসাহ গ্রহণ করে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে "ভিক্ষু" সম্বোধন করে আহবান করলেন, [১৬১] পুরানো উপমহাদেশ ভারতবর্ষই আদিকালের জম্বুদ্বীপ। এ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তে অবস্থিত নেপাল রাজ্যে কপিলাবাস্তু নগরী এখনও আছে। এই কপিলাবাস্তুর রাজা ছিলেন প্রজাদরদী শুদ্ধোধন ; তার রানীর নাম মায়া। রাজ্যে পরমশান্তি ছিল ; ধন, দৌলত, বন্ধু, অমাত্য, কোনো কিছুর অভাব ছিল না। তবু একটি সন্তানের অভাবে তিনি সবসময় বিমর্ষ থাকতেন।[১৬২]

খ. অনেক দিন আগের কথা। চম্পকনগর ছিল ধনধান্যে ফলেফুলে নিরন্তর পরিপূর্ণ। মনোরম সুউচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট্য সৌধশ্রেণী এ রাজ্যের শোভা বর্ধন করেছিল। সকল প্রজা প্রাণপণে পঞ্চশীল রক্ষা করতেন, তাই রাজ্যের কোথাও অশান্তি ছিল না। সবাই শান্তির অমৃতরসে ডুবে থাকতেন।[১৬৩] এ রকম কথার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতা ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়, কথা ব্যতিরেকে কীর্তন হয়ে পড়ে প্রাণহীন ও শ্রুতিহীন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.২. আখর

কীর্তন গানের মাধুর্যের জন্য সংযোজিত অতিরিক্ত পদের নামই 'আখর'।[১৬৪] আখর সাধারণের জন্য সুবোধ্য নয়। এতে পদের মর্ম আরো দুর্বোধ্য। আখর কবিত্বময় ব্যাখ্যা, পদের মর্মের রস ভাবপূর্ণ বিশ্লেষণ। কীর্তনীয়া নিজেরাই পরস্পর আখরের সৃষ্টি এবং পুষ্টি সাধন করে আসছে।[১৬৫] আখর কীর্তনের আসরে শুনে বুঝতে হয়। এটাকে কীর্তনের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা হয়। কীর্তনের মাধুর্য আস্বাদনে আখর প্রধান সহায়। পদকর্তাদের বিনাসুতায় গাঁথামালা রহস্য গ্রন্থি উন্মোচনে আখর-ই একমাত্র উপায়। তার কয়েকটি উদাহারণ নীচে দেওয়া হলো :

ক. পুনর্জন্মে দিয়ে বান লভিয়াছি বুদ্ধজ্ঞান
সংস্কার বিনষ্ট মমসহ অনুশয়
সর্ব্বতৃষ্ণা পরিহারি বুদ্ধনাম আমি ধরি
পুনর্জন্ম ভব মোর হইয়াছে ক্ষয়।

(কীর্তনীয়া আখর দেয়) পূনর্জন্ম মোর হবে নারে
সর্ব্বতুষ্ণা মুক্ত আমি ,, ,, ,, ,,
সব্ব সংস্কার মুক্ত আমি ,, ,, ,, ,,
ত্রিজগতে মুক্ত আমি ,, ,, ,, ,,
অমরত্ব লভি আমি ,, ,, ,, ,,।[১৬৬]

খ. পুষ্পরথ চলে ধীরে মনোরম শোভা ধরে
সংগে চলে রাজ্যবাসীগণ
বাজিল বিবিধ বাদ্য নর্ত্তকেরা করে নৃত্য
গায়ে গীতি আনন্দ পরাণে

(কীর্তনীয়া আখর দেয়) হুলুর ধ্বনি করেরে
কুলবালা নারীগণে ,, ,, ,,
মধুর সুরে বারে বারে ,, ,, ,,।[১৬৭]

এ 'আখর' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, কীর্তনের আখর কথার তান।[১৬৮] 'আখর' হচ্ছে কীর্তনকে শ্রুতিমধুর করার এক বিশেষ অভিনব পদ্ধতি। আখর সংযোজনে বৌদ্ধ কীর্তনকে অপরাপর কীর্তন থেকে আলাদা করা হয়। আখর কীর্তনীয়ার চিন্তার ফসল। বলা হয়নি এমন অনেকবাক্য আখরে প্রকাশ পায়। এ অর্থে আখর হচ্ছে একধরনের পদ ব্যঞ্জনা। কীর্তনে আখরের ভূমিকা অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে বেশী। আখর প্রসঙ্গে শিবরতন মিত্র-এর উক্তি নিম্নরূপ ; মূলপদের ভাবের পরিপোষকরূপে শ্রোতাদেরকে তার ভাবগ্রহণে আস্বাদন ও অনুভব করার পক্ষে সহায়তা করে।[১৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৩. তুক

তুক সম্পূর্ণ পদ্য নয়, পদের অংশও নয়। এটা কবি ও কীর্তনীয়াদের সৃষ্টি। এটা অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক গাথা।[১৭০] একটি পদের অংশবিশেষের সাথে অন্যপদের অংশবিশেষ নিয়ে যে বাক্যদ্বয় গঠন করা হয়, তাই তুক বা তুক্ক নামে পরিচিত। কোনো কোনো বিশেষ পদের নামে তুক বা তুক্ক গান গাওয়ায় নিয়ম আছে। কুমার সিদ্ধার্থ অশোকভাণ্ড বিতরণোৎসবে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন গোপার দিকে। মনে হলো যেন জন্ম জন্মান্তরের চেনা এ নারী। নিজেকে সংযত করে নিয়ে অশোকভাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সব শূন্য ; সেখানে আর কিছুই নেই। তখন দেওয়ার মতো কিছুই না পেয়ে সিদ্ধার্থ নিজ হাত থেকে মহামূল্য অঙ্গুরী খুলে নিয়ে গোপার হাতে পরিয়ে দিলেন। তখন কীর্তনীয়া তুকগান ধরলেন এ ভাবে ;

কোমল অঙ্গে কোমল অঙ্গ যখন পরশ হল
আত্মহারা দোঁহে পৃথিবী ভুলিল।[১৭১]

চম্পক নগরের রাজা সম্ভুমিত্র তার ছোট ভাই অসম্ভমিত্র এর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য সপরিবারে পালাতে গিয়ে স্ত্রী পুত্রদ্বয় সবাইকে হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘদিন পর তার দুই পুত্র জয়সেন এবং জয়দত্তকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন কীর্তনীয়া তুক ধরলেন এভাবে ;

জড়ায়ে ধরিল বুকে পুত্র দুইজন
আদরে তাদের মুখে করিল চুম্বন।[১৭২]

৩.১.৪. ছুট

সম্পূর্ণ পদ না গেয়ে সহজ ও সরল তালে পদের অংশবিশেষ গানকে 'ছুট' বলে। বড় তালের বা গানের মাঝে তাল ফেরতায় ছোট তালের গান ছুট গান নামে অভিহিত।[১৭৩] 'ছুট' এর শাব্দিক অর্থ অবসর। কীর্তনীয়া গান করতে করতে যখন ক্লান্তবোধ করে তখন তারা একটু বিশ্রাম নেয়। এ সময় তারা পরিবেশন করে হালকা রসময় বিভিন্ন গান। এ রকম গানে তাল-লয় তেমন ঠিক থাকে না বিধায় এটা গাম্ভীর্যপূর্ণ নয়। কীর্তন গানের সাথে ছুট গানের কোনো মিলকরণ নেই। দোঁহারীর যে কেউ অথবা কীর্তনীয়া নিজেও ছুট গান করে।[১৭৪]

৩.১.৫. ঝুমুর

কীর্তন ও আদিবাসীদের সুরের মিশ্রণে এক ধরনের বাংলা ঝুমুর গান শোনা যায়।[১৭৫] ঝুমুর গান মূলত লোকসংগীত প্রধান ; আদিবাসীদের উৎসবের গান। সে হিসেবে আঞ্চলিক ঝুমুরের ছড়াছড়ি দেখা যায় লোকসংগীতে। ঝুমুরের অন্যনাম ঝুমুরী। যা একটি সুর বিশেষার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ;

প্রায়ঃ শৃঙ্গার বহুলা মাধ্বীক

Dhaka University Institutional Repository

মধুরা মৃদ
ঐকেব ঝুমরী লৌকেক বর্ণাদি
নিয়মোজঝিভা[১৭৬]

অর্থাৎ শৃঙ্গার রসবহুল, মধুজাত সুরার মত, মধুর ও মৃদু, বর্ণাদি নিয়মরহিত সঙ্গীতই ঝুমরী।

কীর্তনে 'ঝুমুর' অন্য অর্থে ব্যবহৃত। কীর্তনীয়া একা পালা শেষ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে ঝুমুর গেয়ে পালা রাখার নিয়ম-নীতি আছে।[১৭৭] অন্যভাবে বলা যায়, গান শেষে "কথা" আরম্ভের আগে সাধারণত কীর্তনীয়া যেই সুরে মিল বা আখ্যান শেষ করে তাকে ঝুমুর বলে। ঝুমুর এবং ঝুমরী ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিশেষ। ঝুমুরী ছন্দেবদ্ধগীতি আর ঝুমুর কীর্তনে পালা রাখার বিশেষ উপায়। বৌদ্ধকীর্তনে এ ঝুমুরের মাধ্যমে শ্রোতাকে কীর্তনাভিমুখী করা হয়। এ সময় দোঁহারীরা দীর্ঘ বা উচ্চস্বরে গান ধরে এবং বাদ্য বাদকেরা তাদের যন্ত্রগুলোকে উচ্চস্কেলে বাজায়। যেমন ;

ক. উদ্ধার করিল[১৭৮]

কত পাপী, তাপী, দীন, দুঃখী
রাজা, প্রজা, ধনী, মানী ,, ,,
ঝুমুর---কত জীবে উদ্ধারিলে সংখ্যা কভু নাহি মিলে, (২ বার)
হা-হা-হা, হা-হা-হা ,, ,, ,, ,,

খ. মনের দুঃখ রইল মনে[১৭৯]

পুত্র মুখ না হেরিলাম
ভবে কেন জন্মনিলাম ,, ,, ,, ,,
কি করিবে রাজ্য ধনে ,, ,, ,, ,,
ঝুমুর--- বংশে বাতিজ্বলবে না আটকুড়ো নাম ঘুচবে না (২ বার)
হা-হা-হা-হা, হা-হা-হা-হা ,, ,, ,, ,,

গ. তোরা কেহ বুঝবি না সই[১৮০]

অভাগিনীর মনের ব্যাথা
বাড়বানল জ্বলছে হৃদে ,, ,, ,, ,, ,,
মনের বেদনা আমার ,, ,, ,, ,, ,,
ঝুমুর--- ব্যাথার ব্যথী না হইলে বুঝবি না সই কোন কালে (২ বার)
হা-হা-হা-হা, হা-হা-হা-হা ,, ,, ,,

### ৩.১.৬. দোঁহারী

কীর্তন দলীয় সংগীত। কীর্তনকে রসোত্তীর্ণ করার কাজে দোঁহারীর ভূমিকা কীর্তনীয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দোঁহা হচ্ছে তিন বা চার চরণ যুক্ত ছন্দ। দোঁহার কথা উৎপত্তি প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মখোপধ্যায় বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

> বৌদ্ধ রচিত হাজার বছরের পুরানা দোঁহকোষ পাওয়া গিয়াছে। দোঁহা হতে দোঁহাকথার উৎপত্তি কিনা কে বলবে? অনেকে বলেন, মূল গায়কের গাহিবার পর গান দুই হার-দুইবার গাহে বলিয়া ইহাদের নাম দোঁহার। দোঁহা শব্দে উভয় বুঝায়, দুই পাশ্বেও গাহিবার সঙ্গী, হয়তো এইজন্য বলে দোঁহার। ইহাদের গান দোহারী। সঙ্গীতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের উপর রেশ জমাইয়া রাখা দোঁহারের কাজ[১৮১]।

দোঁহারীর তাল-লয় এবং সুরের মাধুর্যতার উপর নির্ভর করে কীর্তন। সুর ও তাল কীর্তনের বহিরাবরণ কিন্তু সুর-তাল বিশুদ্ধ না হলে রসস্ফুর্তি হয় না। 'সুর' ও তাল অবলম্বনে রসমূর্তিমান হয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, কীর্তন শুধু সুর ও তালে ফুটে উঠে না। কীর্তনকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে সুর ও তালের সঙ্গে রস ভাব বিকাশের প্রতিও মন সংযোগ আবশ্যক।[১৮২] সুর ও তাল ঠিক রেখে গান ধরা দোঁহারীর প্রধান কাজ। তাই অভিজ্ঞ দোঁহারী না থাকলে দর্শক শ্রোতার মন জয় করা কঠিন কাজ। অনেক ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র বাদক এবং দোঁহারী একই ব্যক্তি হতে পারে আবার নাও হতে পারে । কীর্তনীয়া আসরের মাঝখানে বসে আর দোঁহরীরা বসে চারপাশে। মোটকথায় কীর্তনে দোঁহারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২. বৌদ্ধ কীর্তনের শ্রেণী বিভাজন : মোটামুটি ভাবে বৌদ্ধ কীর্তন দু'ভাগে বিভাজন[১৮৩] করা যায়।

৩.২.১. পালা কীর্তন

কীর্তনীয়া বুদ্ধ ও তার শ্রাবকসংঘের জীবনেতিহাসের যশোখ্যাতি পালায় গাঁথিয়া যে গান পরিবেশন করেন, তাকেই পালা কীর্তন বলে।[১৮৪] যিনি ঐ কীর্তন পরিবেশন করবেন তাঁর অবশ্যই এ পালা বিষয়ে সম্যকজ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে সুমন কান্তি বড়ুয়া বলেন, পালা কীর্তনের মাধ্যমে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের জীবন কাহিনীর বর্ণনা করে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সবাই এ গান থেকে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারে।[১৮৫] বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো যে সমস্ত পালা কীর্তনের প্রচলন বিরাজমান, তা হলো ; অবতার লীলা, সিদ্ধার্থের জন্ম ও বালা লীলা, বুদ্ধসন্ন্যাস, মার বিজয়, দানবীর বেশান্তর, দুস্য অঙ্গুলিমাল, সীবলী চরিত, সম্রাট অশোক, শ্যামাবতী, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ইত্যাদি।

৩.২.২. পাল্টা কীর্তন

অতি আকর্ষণীয় একটি গানের নাম পাল্টা কীর্তন'। পাল্টাকারে গাওয়া হয় বলে এটি পাল্টা গান নামে অভিহিত। কীর্তন গানই ছিল সামাজিক গান, সকলের গান তথা বাঙালির গান, গৃহস্থ বাড়ীর অনুষ্ঠানেই যে কীর্তন করা হয় সবক্ষেত্রে তা নাম কীর্তন বা পালা কীর্তন নয়। অনেকক্ষেত্রে পাল্টাগান বা জবাবী গানও হয়।[১৮৬] এ গান হচ্ছে তর্ক-বিতর্কের লড়াই। কবি গানের মতো কীর্তনীয়াদের লড়াই। কীর্তন উপলব্ধিকারী বিবেকবান শ্রোতা এ কীর্তন

Dhaka University Institutional Repository

ধৈর্যের সাথে উপভোগ করে। কীর্তনীয়ার এ রকম সবিশেষ কীর্তনে দর্শক শ্রোতারা বেশী আনন্দ উপভোগ করে। এধরনের কীর্তনে দু'টা পক্ষ থাকে। প্রত্যেক পক্ষে একজন মূল কীর্তনীয়া এবং তাদের স্ব-স্ব দোঁহারী থাকে। দু'জনে দু'টি আলাদা বিষয় বা চরিত্র নিয়ে কীর্তন পরিবেশন করে। চরিত্র দু'টি সম্পর্কযুক্ত আবার তাদের মধ্যে বৈপরীত্যও থাকবে বেশী। তবে বেশীর ভাগ উপস্থিত সমঝদারদর্শক শ্রোতাই নিবার্চন করে দেয় তারা কোনোবিষয় বা চরিত্রের উপর কীর্তনগান পরিবেশন করবে।[১৮৭] এ বিষয় নির্বাচন করে দেওয়ার অর্থ, আসলে তাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের গভীরতা আছে কিনা যাচাই করা। এ কীর্তন শ্রবণের সময় দর্শক শ্রোতার মধ্যে বিরাজ করে একধরনের টান টান উত্তেজতা, এক চরিত্রের কীর্তনীয়া অপর কীর্তনীয়াকে বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন করে নিজের অসাধারণ জ্ঞান প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চায়। এভাবে চলে তর্ক-বির্তক ; দুই কীর্তনীয়ার মধ্যে পরস্পর কীর্তনের মধ্য দিয়ে যুক্তি উপস্থাপন ও খণ্ডন প্রক্রিয়া।

পাল্টা কীর্তনের তাল-লয় সবই পাল কীর্তনের ন্যায়। তবে পাল্টা কীর্তনে উভয়ে জোটক[১৮৮] হয় এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত চলে।[১৮৯] এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, পাল্টা কীর্তনে জোটক অবশ্যই সর্বজন নন্দিত। এতে উভয়ের একদিকে শাস্ত্র-জ্ঞান পরখ এবং অন্যদিকে জয়-পরাজয়ের জন্য এ জোটক বদ্ধ হওয়ার নিয়ম পাল্টা কীর্তনের স্বভাবসিদ্ধ একটি প্রথা। এখানেই তাদের ধর্মীয়-তত্ত্বীয় প্রখরজ্ঞানের ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতি পরিচিতজন রাঙ্গুনীয়া থানা নিবাসী বিশিষ্ট পাল্টা কীর্তনীয়া যিনি আবার পালা কীর্তনেও সমপারদর্শী রতন বড়ুয়া মাদল এক সাক্ষ্যকারের পাল্টা কীর্তন প্রসঙ্গে বলেন, পাল্টা কীর্তনের জন্য দরকার অসাধ্য জ্ঞান। যেখানে জ্ঞানের তীব্রতা থাকবে সমুদ্রের গভীর তলদেশের মতো। তাছাড়া এখানে দরকার সামাজিক ঐতিহাস, তথ্য ও তত্ত্বের প্রজ্ঞাময় জ্ঞান। এ সমস্ত জ্ঞান ছাড়া পাল্টা কীর্তন করা অনুচিত।[১৯০] আরেক সাক্ষ্যৎকারে বিশিষ্ট কীর্তন অনুরাগী অনিল কান্তি বড়ুয়া বলেন, শুধু পাল্টা কীর্তন নয় ; পালা কীর্তনের জন্যও কীর্তনীয়ার ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকা দরকার। এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপিত না হলে কীর্তনে ইতিহাস বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে।[১৯১] সুতরাং দেখা যায়, কীর্তনগানে ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা থাকা বাঞ্চনীয়। উভয় কীর্তনে তথ্য-তত্ত্ব, ইতিহাস-ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পর্কে জানার জন্য কীর্তনীয়াকে অধিক পরিমাণে শাস্ত্রীয় বই পড়তে হবে এবং অজানা বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য তাদের অবশ্যই প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যে যেতে হবে। যদি তা সম্ভব হয়, তবে তাদের দ্বারা কখনো ইতিহাস বিকৃতির সম্ভবপর হবে না। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পাল্টা কীর্তন হয়। যেমন : বুদ্ধ ও দেবদত্ত, বুদ্ধ ও আনন্দ, সিদ্ধার্থ ও গোপা, বুদ্ধ ও অঙ্গুলিমাল, নাগসেন ও মিলিন্দ রাজা, বুদ্ধ ও রাহুল, সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

### ৩.৩. কীর্তনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব

অন্যান্য সংগীতের ন্যায় কীর্তনকে মাধুর্য্যময় করে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্রেও ব্যবহার করা হয়। কীর্তনে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় তা নিম্নরূপ ;[১৯২] হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, কাঁসা, মুরালিবাঁশী প্রভৃতি। বর্তমানে কীর্তনকে আকর্ষনীয় করার জন্য ক্ল্যারিওনেট ও মুড়ালিবাঁশী পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রও তালিকাভুক্ত করা হয়। ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র সুর নিহিত আছে। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন তাল। এ সমস্ত তালের আবার সঙ্গম, লয়, লহর, মাতান, তেহাই, ফাঁক এবং তার পৃথক পৃথক বোল আছে। কীর্তনে যেমন আখর আছে, খোলেও তেমনি কাটান আছে। গায়ক যেমন আখরের পর আখর দিয়ে অথবা সুরের বিভিন্ন ভঙ্গীতে আখরের পুনরাবৃত্তি করে শ্রোতাদের হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দলোকের রস তরঙ্গ সৃষ্টি করে। বাদক তেমনি কাটানে সুরের অনুরূপ বাজনায় ঢেউ তুলে আসরে ধ্বনির অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে।[১৯৩] উক্তিটি এ বৌদ্ধ কীর্তনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একথা স্বীকার্য বৌদ্ধকীর্তনে কোনরূপ স্বরলিপি নেই। গুরু পরম্পরায় কীর্তনের সুরকে আপন কণ্ঠে তুলে নেন কীর্তনীয়া। স্বরলিপি না থাকায় কীর্তনীয়া উন্নত প্রযুক্তিগত কারণে বিভিন্ন সময় সুর-তাল-লয় পরিবর্তন করে নতুন তাল-লয় সংযোজন করে নিজে সুর দেয়। ফলে নতুন সুরের প্রভাবে মূল সুরের নান্দনিকতার বিলোপ সাধিত হয়। তারপরও মূল কীর্তনীয়াকে সুরের বিশুদ্ধতার দিকে নজর দেয়া উচিত।

### ৩.৪. চিত্তবিনোদনে কীর্তন

সংগীতের বিভিন্ন শাখার মতো মূলত গ্রাম নির্ভর সমবেত বৌদ্ধ কীর্তনেও আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগে। প্রায় সত্তর দশকে কীর্তনকে ক্যাসেট আকারে বের করা হয়। প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এখন এসব ক্যাসেট এর কীর্তন বাজানো হয়।[১৯৪] এতে একদিকে কীর্তন গ্রাম ছেড়ে শহরে তার অবস্থান শক্ত করে নিয়েছে, অন্যদিকে কীর্তনীয়ার কীর্তনে অনাগ্রহ প্রকাশ পায়। তবে ধারণা করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এ অডিও ক্যাসেটই বৌদ্ধ কীর্তনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে।

সামাজিক ধর্মীয় তথ্য ও তত্ত্বকথা সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় তাল ও লয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সুরালা কণ্ঠে উপস্থাপনের ফলে সাতিশয় সাধারণ্যে কীর্তনের (পালা ও পাল্টা) সর্বজনীন আবেদন বেশী। সাধারণ জনগোষ্ঠী কীর্তনের মাধ্যমে ধর্মীয় বা মিশ্রিত এক অনাবিল শান্তি ও অমিয়ায় অবগাহন করে। পরিণত হয় একজন পরিশীলিত মানুষে। কীর্তন সংস্কৃতির এক অনন্য উপাদান। তাই কীর্তনের আসরকে লোকশিক্ষা, লোকঐতিহ্য, লোককথা ও লোকসংস্কৃতির আসর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে উক্ত আছে--

Dhaka University Institutional Repository

> কীর্তনের পরিব্যপ্তি জনজীবনের সর্বত্র। কেবল ধর্মীয় আচরণ বলে সীমিত রাখলে যেমন কীর্তনকে সংকীর্ণ করা হয় তেমনি কেবল গানেরধারা বললে কীর্তনের প্রকৃত পরিচয় দেয়া হয় না। কীর্তন হল বাঙালীর উদার মানসিকতার পরিচয়বাহী উন্নতমনের সংগীত। যার উপর ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।[১৯৫]

কীর্তন উন্নতমনের উৎকর্ষময় সংগীত সন্দেহ নেই। তবে ধর্মীয় তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর বড়ুয়া জনগোষ্ঠির কীর্তন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ধর্মীয়ভাব আছে বলেই কীর্তনের এত কদরও আদর। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রাম বাংলার সাধারণ লোকজন ঘন্টার পর ঘন্টা কীর্তনের আসরে বসে থাকে কিছু শোনা এবং জানার জন্য। একান্ত এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, কীর্তন গানে এমন কিছু বোঝা যায় জানা যায়, যা পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা সম্ভব নয়।[১৯৬] আগেই বলেছি কীর্তন বাংলার লোক ঐতিহ্যের এক অনুপম সম্পদ। কীর্তন শ্রবণ করার জন্য জড়ো হয় এলাকার আবালবৃদ্ধবণিতা। এতে একতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। সর্বোপরি কীর্তন নিয়ে আসে গ্রামীণসমাজের চিত্ত বিনোদনের এক পসলা বৃষ্টি।

কীর্তন লোকসংস্কৃতির এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক উপাদান। কীর্তনের আসরকে সামাজিক সংগঠন বললে ভুল হয় না। আগের ন্যায় পৃষ্টপোষক গ্রামে বসবাস না করায় কীর্তনের আসর তেমন জমে ওঠে না। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে উক্ত হয়েছে ; আধুনিকতার ছোঁয়া এখন প্রতিটি গ্রামে। অধিকাংশ সময় তারা গণমাধ্যমের বিনোদন উপভোগ করে। তাই কীর্তনের প্রতি তাদের (সাধারণ লোকজন) আর আগের ন্যায় আগ্রহ নেই।[১৯৭] বর্তমান সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের অভিনব স্পর্শে গ্রাম সমাজেও পরিবর্তন এসেছে। তথাপি অত্যুৎসাহী এবং গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ সহজ-সরল লোকজন ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কীর্তনের মাধ্যমে অবিদিত বিষয় জ্ঞাত হয় এবং রসপিপাসা নিবৃত করে। এটা ধ্রুব সত্য যে, কীর্তন ধর্মীয় সংগীত। সুতরাং যত আকাশ ছোঁয়া নান্দনিক সংস্কৃতি থাকুক না কেন ; খেটে খাওয়া অতিশয় সহজ সরল স্বভাবের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কীর্তন শোনার জন্য সমবেত হয়।

৩.৫.

বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর কীর্তন চিরশাশ্বত বাঙালির এক অনন্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে বৌদ্ধ (আদিবাসী ও সমতলীয়) পল্লীতে প্রায় সকল ধর্মীয় ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কীর্তনের আয়োজন করে। যেমন : পূজা পার্বণে, সন্তান-সন্ততি লাভে, প্রব্রজ্যা গ্রহণে, সংঘদানে, মৃতবাসরে, শবদাহ উপলক্ষে বাড়ীতে-শশ্মানে কীর্তন, কঠিনচীবর দানোৎসবে, বুদ্ধপুর্ণিমায়, ভাদ্রপুর্ণিমায় (মধুপুর্ণিমা), প্রবারণা পূর্ণিমায়, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আগের দিন কীর্তন আসর হয়। বাংলাদেশের সংগীতজগতে এক বৈচিত্র ও অভাবনীয় অভিনবত্ব আনয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল এ কীর্তন। সংগীতের আভিজাত্যের হিমালয় ত্যাগ করে জাহ্নবীধারার মতো কীর্তন জনসাধারণের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আধুনিক (সধংং সঁংরপ) এ কীর্তনে তেমন দেখা যায় না। এতে কীর্তনের কথার আবেদনে হৃদয়ের অর্ন্তনিহিত ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী দেখা যায়। যা পৃথিবীর অন্যকোনো সংগীতে দেখা যায় কিনা সন্দেহ আছে। গায়কের বৈশিষ্ট্য, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও প্রতিভা কীর্তনের অলংকার ; যা আখরে প্রকাশ পায়। সচরাচর আর অন্যকানো সংগীতে এগুলোর প্রচলন নেই। সুতরাং এ কীর্তন সংগীত জগতের এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ।

## ৪. পরিসমাপ্তি

পরিশেষে বলা যায়, উল্লেখিত মেয়েলিগীত, প্রবাদ এবং কীর্তন বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির, বাককেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের অধীন। এ জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের অনবগত সামগ্রিক উপাদানগুলো এখানে জ্ঞাত হওয়া যায়। লোকসংস্কৃতিতে তাঁদের সৃষ্টিমনের নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে, যা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটি অভিনব সংযোজন। এ প্রসঙ্গে উক্ত আছে, বাককেন্দ্রিক ফোকলোর-এর জন্ম যেমন মুখে, মুখে, পূর্ববতী সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে, একদেশ বা সমাজ থেকে অন্যদেশ ও সমাজে, তার প্রচারও তেমনি মুখে মুখে হয়ে থাকে।[১৯৮]

## প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *লোকসাহিত্যে ছড়া* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ. প্রসঙ্গকথা

২. Edited by Tristram P. coffin III, American Folklore (U.S.A. : voice of American forum lectures, 1968) p. 07

৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ প্রবচন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ০৭

৪. সুশীল কুমার ভট্টাচার্য, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৭০, পৃ. ০৯

৫. মুস্তাফা মাসুদ, *যশোরের লোকসাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ০২-০৩

৬. পল্লীর সমাজজীবন যে সংগীত মুখে মুখে রচিত হয়ে আবার মুখে মুখে প্রচার-প্রসার লাভ করে, তাই লোকসংগীত।

৭. Alexander Huggerty Krappe, *The Seience of Folklore* (U.S.A. : Methuen & Co: Ltd. 1962), P. 156

৮. শিপ্রা দত্ত, *চট্টগ্রামের লোকসংগীত* (কলিকাতা : ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৭৫), পৃ. ১৮

৯. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *নরসিংদী গাজীপুরের লোক ঐতিহ্য বিবাহ ও মেয়েলি ছড়া গীত* (নরসিংদী : গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশন, ২০০০) পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

১০. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২৮১

১১. এ কারণেই মেয়েলীগীতকে Functional Song বলা হয়।

১২. মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসাহিত্যের নানাদিক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৮১

১৩. সুশীল কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

১৪. মুহাম্মদ আবদুল জলিল, পুর্বোক্ত, পৃ. ৮১

১৫. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

১৬. সাক্ষাৎকার : শাক্যবালা বড়ুয়া, বয়স-৭৫, গ্রাম : পাইট্টালির কুল, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম, ০২.০৬.২০০৬

১৭. খাদেজা খাতুন, *বগুড়ার লোকসাহিত্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০), পৃ. ০১

১৮. সাক্ষাৎকার : মল্লিকা বড়ুয়া, বয়স-৬৫, গ্রাম : পশিচম আধার মানিক, ডাক: অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

১৯. সাক্ষাৎকার : শশাঙ্ক বড়ুয়া, বয়স-৮০, গ্রাম : মধ্যমবিনাজুরী, ডাক : বিনাজুরী, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৪.১২.২০০৬

২০. সুশীল কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

২১. সানু বড়ুয়া, বয়স-৬৫, গ্রাম : শ্রীপুর, ডাক : খরন্দ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

২২. বিরলা বড়ুয়া, বয়স-৯০, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

২৩. তটিনী বালা বড়ুয়া, বয়স-৭৫, গ্রাম+ডাক : ধর্মপুর, থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.১০.২০০৬

২৪. মল্লিকা বড়ুয়া, বয়স-৬৭, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

২৫. গীতা বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : পাইট্টালির কুল, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.০৬.২০০৬

২৬. বাঁশী বড়ুয়া, বয়স-৫৫, উত্তর নলবিলা, মহেশখালী, কক্সবাজার, ২১.১০.২০০৬

২৭. অপরাজিতা বড়ুয়া, বয়স-৭০,, গ্রাম : ফতেনগর, ডাক : জোয়ারা, থানা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৯.১২.২০০৬

২৮. সোহাগী বড়ুয়া, বয়স-৬০, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০১.১০.২০০৬

২৯. লাকী বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : গুমার্মদন, থানা : হাট হাজারী, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৭.১০.২০০৬

৩০. সানু বড়ুয়া, পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

৩১. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সংকলিত, *লোকসাহিত্য ধাঁধাঁ ও প্রবাদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ. ৭৭ ; বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য যেমন নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়েছিল, প্রবাদেরও প্রথম উদ্ভব *হয়েছিল নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে। মুহম্মদ আব্দুল খালেক*, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপদান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৪৬

৩২. মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ০৭

৩৩. সুশীল কুমার দে, *বাংলা প্রবাদ* (কলিকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, ১৩৫২ বাংলা), পৃ. ৭৬-৭৭ ; দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রবাদগুলোতে প্রতিফলিত হয়। মানুষ তার নিজস্ব পরিচিতি অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ প্রবাদের মাধ্যমে লাভ করে। তাই প্রবাদকে সহজেই গ্রহণ করে। প্রবাদ যেহেতু লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তাই এগুলো ব্যষ্টি রচিত হয়েও সংহত সমাজেরই সম্পত্তিতে রূপান্ত রিত হয়। ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস* (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯), পৃ. ১৭

৩৪. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *লোকসাহিত্যে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৩৫. সুশীল কুমার দে, পূর্বোক্ত, পৃ.

৩৬. পবিত্র সরকার, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* (কলিকাতা : চিরায়ত প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ৪৮

৩৭. Edited by Jerzy Gluski, *Proverbs* (Amasterdam: Elsevier Publishing Company, 1971), P. 07

৩৮. Ibid. P. VII

৩৯. Edited by Tristram P. Coffin III And Hennig Cohen, *Folklore in America* (New york : Doubleday & Company, 1960), P. 14

৪০. দ্রষ্টব্য. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ সম্পাদিত, *লোকসাহিত্যে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ. ৭৬

৪১. দ্রষ্টব্য. ওয়াকিল আহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ প্রবচন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪৫. Edited by Tristram Coffin III, *American Folklore*, op.cit., P. 217

৪৬. মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পাঠ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৪৭. সুশীল কুমার দে, *বাংলা প্রবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০১-০২

৪৮. বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* (কলিকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্টেবিউটার্স, ১৯১৫), পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পাঠ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ০২ (ভূমিকা)

৫০. কমল কান্তি বড়ুয়া, বয়স-৭৩, গ্রাম : ধুমারপাড়া, ডাক : গুজরা নোয়াপাড়া, থানা : রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম, ১৮.০৭.২০০৬

৫১. বাসন্তী বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : পশ্চিম আঁধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০১.১০.২০০৬

৫২. সুজাতা বড়ুয়া, বয়স-৬৭, গ্রাম : ধুমারপাড়া, ডাক : গুজবা নোয়াপাড়া, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৮.০৭.২০০৬

৫৩. গোপাল বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : পদুয়া, থানা : সাতকানিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০১.০৬.২০০৬

৫৪. সাধন বড়ুয়া, বয়স-৪৭, গ্রাম : কোঠের পাড়, থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.১০.২০০৬

৫৫. গীতা বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : পাইট্টালির কুল, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম, ০২.০৬.২০০৬

৫৬. সোনাই বালা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৫৭. বাঁশী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৫৮. লোকানন্দ বড়ুয়া, বয়স-৪৫, গ্রাম : উত্তর নলবিলা, থানা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, ২১.১০.২০০৬

৫৯. সোহাগী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৬০. তটিনী বালা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৬১. কমল কান্তি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত,

৬২. পংকজ বড়ুয়া, বয়স-৬৫, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

৬৩. রূপায়ণ বড়ুয়া, বয়স-৪০, গ্রাম : কদল পুর, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.০৬.২০০৬

৬৪. পতি বড়ুয়া, বয়স-৩৫, গ্রাম : রূমপা, ডাক+থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, ২৩.১০.০৬

৬৫. লোকপ্রিয় বড়ুয়া, বয়স-৩০, গ্রাম : উত্তর নলবিলা, থানা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার, ২১.১০.০৬

৬৬. হৃদয় মোহন বড়ুয়া, বয়স-৬০, উত্তর নলবিলা, থানা : মহেশখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ২২.১০.২০০৬

৬৭. সুকুমার বড়ুয়া, বয়স-৬০, গ্রাম : বেলখাইন, থানা : পটিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৩.০৬.২০০৬

৬৮. মুনিন্দ্র বড়ুয়া, বয়স-৮৭, গ্রাম : মেরুংলোয়া, থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, ২৫.১০.২০০৬

৬৯. সোহাগী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৭০. গোপাল বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৭১. বাসন্তী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৭২. বাসন্তী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৭৩. নিপুর মা, বয়স-৬০, গ্রাম + ডাক : ধর্মপুর, ডাক + থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৬.১০.০৬

৭৪. সোহাগী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. এমেলি বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : দক্ষিণ ঘটচেক, থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৬.১০.২০০৬

৭৬. সুজাতা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৭৭. সুজাতা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৭৮. নিরোধ বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : আমুচিয়া, ডাক : কানুগোপাড়া, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

৭৯. আনন্দ মোহন বড়ুয়া, বয়স-৭৫, গ্রাম : পাইট্টালিরকুল, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

৮০. অলক বড়ুয়া, বয়স-৩৫, গ্রাম: হাইদচকিয়, ডাক: বৃন্দাবন হাট, থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৬.১০.২০০৬

৮১. অশোক বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : মধ্যম ইদিলপুর, ডাক : কাগতিয়া, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৪.১২.২০০৬

৮২. অপরাজিতা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৮৩. পুলিন বিহারী বড়ুয়া, বয়স : ৭০, গ্রাম : ঢেমশা, থানা : সাতকানিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৪.০৬.২০০৬

৮৪. মৈত্রী বড়ুয়া, টুকু, বয়স : ২৭, গ্রাম : মেরুংলোয়া, থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, ২৫.১০.২০০৬

৮৫. পূর্বোক্ত

৮৬. দীপংকর বড়ুয়া, বয়স-৫৪, গ্রাম : শ্রীপুর, ডাক : খরন্দীপ, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

৮৭. শীলা বড়ুয়া, বয়স : ২৫, গ্রাম : গুমার্মমদ্দন, থানা : হাট হাজারী, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৮.১০.২০০৬

৮৮. শোভা বড়ুয়া (১), বয়স : ৬০, গ্রাম : দক্ষিণ জ্যৈষ্ঠপুরা, ডাক : জ্যৈষ্ঠপুরা, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৮.১২.২০০৬

৮৯. সুদত্ত বড়ুয়া, বয়স : ৬০, গ্রাম : ঢেমশা, থানা : সাতকানিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৪.০৬.২০০৬

৯০. ভূষণ বড়ুয়া, বয়স : ৫৫, গ্রাম : নারিচ্ছা, থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.০৬.২০০৬

৯১. শশাঙ্ক বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৯২. রাখাল বড়ুয়া, বয়স : ৫৫, গ্রাম : ফতেনগর, ডাক : জোয়ারা, থানা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম, ২০.১২.২০০৬

৯৩. শোভা বড়ুয়া (২), বয়স : ৬০, গ্রাম : ফতেনগর, ডাক : জোয়ারা, থানা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম, ২০.১২.২০০৬

৯৪. প্রশান্ত বড়ুয়া, বয়স : ৪৭, গ্রাম : কোট বাজার, থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, ২০.১২.২০০৬

৯৫. স্বপন বড়ুয়া, বয়স-৪৪, গ্রাম : দক্ষিণ জ্যেষ্টপুরা, ডাক : জ্যেষ্টপুরা, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ২৪.১০.২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. সবুজ বড়ুয়া চৌধুরী, গ্রাম : ডাবুয়া (লাঠিছড়ি). থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৭.০৬.২০০৬

৯৭. শেলু বড়ুয়া, বয়স-৩৫, কোট বাজার, থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, ২০.১০.২০০৬

৯৮. নির্মল কান্তি বড়ুয়া, বয়স-৫৩, গ্রাম : আবুরখীল, ডাক : গুজরা শাখা-বিও, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৯.০৬.২০০৬

৯৯. নির্মল বড়ুয়া, বয়স-৪০, গ্রাম : মাইজবিলা, থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.০৬.২০০৬

১০০. দোলন বড়ুয়া, বয়স-৬০, গ্রাম : গুমার্মদ্দন, থানা : হাটহাজীর, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৮.১০.২০০৬

১০১. টিংকু বড়ুয়া, বয়স-৪০, গ্রাম : দক্ষিণ পোমরা, থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.০৬.২০০৬

১০২. শোভা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১০৩. সুনীল কান্তি বড়ুয়া, বয়স-৬৩, গ্রাম : লুসাংগের পাড়া, থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ৫.৬.০৬

১০৪. তেজেন্দ্র বড়ুয়া, বয়স-৬০, গ্রাম : রত্না পালং, থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, ২১.১০.০৬

১০৫. অপরাজিতা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১০৬. পারুল বড়ুয়া, বয়স : ৭৪, গ্রাম : হাজারীর চর, ডাক : পশ্চিম গোমদণ্ডী, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৭.১২.০৬

১০৭. নন্দিতা চৌধুরী, গ্রাম : ডাবুয়া (লাঠিছড়ি), থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৭.০৬.২০০৬

১০৮. এমেলি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১০৯. পূর্নিমা বড়ুয়া, বয়স-৫৭, গ্রাম : সুখবিলাস, থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ২১.১২.২০০৬

১১০. সোনাই বালা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১১১. বীনা রানী বড়ুয়া, গ্রাম : আবুরখীল, ডাক : গুজরা বি.ও., থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৯.০৬.০৬

১১২. সাজু বড়ুয়া, বয়স-৪৫, গ্রাম : শ্রীপুর, ডাক : খরন্দীপ,থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৮.১২.০৬

১১৩. সুবোধ বড়ুয়া, বয়স-৬৮, গ্রাম : কাজরদিঘীর পাড়, ডাক : গুজরা, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

১১৪. ধীরেন্দ্র বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : রেজুরকুল, থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার, ২৪.১০.২০০৬

১১৫. রাজীব বড়ুয়া, বয়স-৩৫, গ্রাম : নারিচ্ছা, থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.০৬.২০০৬

১১৬. অপরাজিতা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১১৭. প্রিয়নাথ বড়ুয়া, বয়স-৭০, গ্রাম : মধ্যম ইদিলপুর, ডাক : কাগতিয়া, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৪.১২.২০০৬

১১৮. তপন বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : পদুয়া, থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ২১.১২.২০০৬

১১৯. দীপংকর বড়ুয়া, বয়স : ৫০, গ্রাম : খরন্দীপ, ডাক : খরন্দীপ, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৮.১২.২০০৬

১২০. হিরন্যবালা বড়ুয়া, বয়স-৭০, গ্রাম : মধ্যম বিনাজুরি, থানা : কাগতিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৪.১২.২০০৬

*Dhaka University Institutional Repository*

১২১. পুলিন বিহারী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১২২. তেজেন্দ্র বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১২৩. সানু বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১২৪. পারুল বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১২৫. সাধন বড়ুয়া, বয়স-৪০, গ্রাম : হাইদচকিয়া, ডাক : বৃন্দাবন, থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৬.১২.২০০৬

১২৬. টিংকু বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১২৭. বেলু বড়ুয়া, বয়স-৪১, গ্রাম : দক্ষিণ জ্যেষ্টপুরা, ডাক : জ্যেষ্টপুরা, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

১২৮. বাবুল বড়ুয়া, বয়স-৫৫, গ্রাম : আধার মানিক, ডাক : আধার মানিক, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

১২৯. ত্রিশংকর বড়ুয়া, বয়স-৭৫, গ্রাম : শ্রীপুর, ডাক : খরন্দীপ, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

১৩০. ভূষণ বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৩১. দোলন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৩২. সোহাগী বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৩৩. হিরন্যবালা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৩৪. প্রিয় রঞ্জুন বড়ুয়া, বয়স-৪৭, গ্রাম : বড় হাতিয়া, থানা : সাতকানিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৪.০৬.০৬

১৩৫. এমেলি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৩৬. বাবুল বড়ুয়া, বয়স-৫০, গ্রাম : চেদিরপুর, থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.০৬.২০০৬

১৩৭. সংঘদাস বড়ুয়া, বয়স-৫০, গ্রাম : রামু বাজার, থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, ২৫.১২.২০০৬

১৩৮. রীটন কান্তি বড়ুয়া, বয়স-৩৫, গ্রাম : শ্রীপুর, ডাক : খরন্দীপ, থানা : বোয়ালখালি, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৭.১২.২০০৬

১৩৯. এমেলি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৪০. সুশান্ত বড়ুয়া, বয়স-৬০, গ্রাম : রামু বাজার, থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার, ২৫.১২.২০০৬

১৪১. নারায়ণ চৌধুরী, *বাংলা গানের জগৎ* (কলিকাতা : ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লি. ১৯৯১), পৃ. ০২

১৪২. পূর্বোক্ত

১৪৩. বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত, *ভারতবর্ষ* (কলিকাতা : নাথ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃ. ৪০৩

১৪৪. নিজস্ব সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫. মহামহোপধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *বৌদ্ধ গান ও দোহা* (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩), পৃ. ০৪

১৪৬. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৪১

১৪৭. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, *কীর্তন পদাবলী* (কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, ১৩৪৫), পৃ. ৪১

১৪৮. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, বুদ্ধ *সন্ন্যাস* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৬) পৃ. ০৫

১৪৯. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৮), পৃ. ১৫

১৫০. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৫২. রবীন্দ্রনাথ (সংগীত চিন্তা), উদ্বৃত, নারায়ণ চৌধুরী, *বাংলা গানের জগৎ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০২

১৫৩. তিনি একজন সৃজনশীল বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব। চট্টগ্রামস্থ রাউজান থানার অর্ন্তগত পাহাড়তলী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে কীর্তনের মাধ্যমে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টিকরণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তার রচিত ১২ বইয়ের মধ্যে ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত ৪টি (অবতার লীলা, সিদ্ধার্থের জন্ম ও বাল্যলীলা, বুদ্ধসন্ন্যাস ও মার বিজয়) বাকী পাণ্ডুলিপি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হারিয়ে যায়।

১৫৪. সাক্ষাৎকার : জীবনানন্দ বড়ুয়া, বয়স-৬২, গ্রাম : মহামুনি, ডাক : পাহাড়তলী, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১২.২০০৬

১৫৫. হিন্দু কীর্তনের প্রভাবের কারণে বুদ্ধকে অবতার হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে।

১৫৬. 'ঢপ' কীর্তন হলো পোষাক পরিহিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের কীর্তনের মাধ্যমে কথোপকথন, অনেকটা গীতি নাট্যের মতো ;

১৫৭. সাক্ষাৎকার : জীবনানন্দ বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৫৮. কীর্তনের অঙ্গ ছয়টি। যথা : ক) কথা, খ) দোঁহা, গ) আখর, ঘ) তুর্ক, ঙ) ছুট এবং চ) ঝুমুর। সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণ দেবী, *কীর্তন পদাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫৩

১৫৯. সাক্ষাৎকার : রতন বড়ুয়া মাদল, বয়স-৬১, গ্রাম : কুলকুরমাই, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৬.০৬.২০০৬

সাক্ষাৎকার : প্রদীপ বড়ুয়া, বয়স-৫০, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

১৬০. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৬১. শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত স্থবির, *ধম্মচক্র প্রবর্তন সুত্র*, (রেঙ্গুন : ১৯৬০), পৃ. ২৯

১৬২. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, *বুদ্ধসন্ন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৬৩. *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* ( ঢাকা : বাংলা একাডেমী, তৃতীয় পুনমুদ্রন, ২০০২), পৃ. ৪০

১৬৪. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, *শভুমিত্র* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৭), পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

১৬৫. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২

১৬৬. শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত স্থবির, *ধম্মচক্র প্রবর্তন সুত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৬৭. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, *শম্ভুমিত্র* ( চট্টগ্রাম : দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ৩১

১৬৮. দ্রষ্টব্য, হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৭১), পৃ. ১০৭

১৬৯. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, *ভারত বর্ষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭

১৭০. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৭১. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, *বুদ্ধসন্ন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৭২. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, *শম্ভুমিত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৭৩. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণ দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৭৪. সাক্ষাৎকার : প্রদীপ বড়ুয়া, বয়স-৬০, সুখ বিলাস, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম, ২১.১২.২০০৬
কঠিনচীবর দ্যানোমের পূতবাসরে, প্রব্রজ্যা প্রদান উপলক্ষে মহা সংঘদানে মহতীভিক্ষুসংঘকে এগিয়ে নিয়ে নানা আসার সময় এ ছুট গান গাওয়া হয়।

১৭৫. বুদ্ধদেব রায়, *বাংলাগানের স্বরূপ* (কলিকাতা : ফার্মা কে.এল.এম.প্রা.লি. ১৯৯০), পৃ. ৬৫

১৭৬. দ্রষ্টব্য, হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *গৌরবঙ্গ সংস্কৃতি* (কলিকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯), পৃ. ১০৭

১৭৭. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৭৮. ভিক্ষ প্রিয়দর্শী, *সীবলী চরিত্র* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৮), পৃ. ১১

১৭৯. মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, *বুদ্ধসন্ন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১৮০. সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, *মার বিজয়* (পার্বত্য চট্টগ্রাম : ১৯৬৬), পৃ. ০৭

১৮১. হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ. ৫৪
হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *বাঙ্গালীর কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৮২. সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১৮৩. সাক্ষাৎকার : রতন বড়ুয়া মাদল, পূর্বোক্ত

১৮৪. সাক্ষাৎকার সুমন কান্তি বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত

১৮৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন ; লৌকিক কাহিনী কাব্যের (Narrative poetry) এক একটি পরিচ্ছেদ কিংবা লোকগীতিকার আনুপার্বিক বিষয়টিকে পালা গান বলে। *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য* (কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা.লি., ১৯৭৩), পৃ. ১৬৩

১৮৬. ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলা কীর্তন গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮

১৮৭. সাক্ষাৎকার : অনিল কান্তি বড়ুয়া, বয়স-৬৭, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়া হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৮. আসরে দাঁড়িয়ে উভয় কীর্তনীয়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একজনের পালার পর আরেকজন তার উত্থাপিত প্রশ্নোত্তর প্রদান করে। এটাকে পালা কীর্তনে জোটক বলে।

১৮৯. সাক্ষাৎকার : তপন বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৯০. সাক্ষাৎকার : রতন বড়ুয়া মাদল, পূর্বোক্ত

১৯১. সাক্ষাৎকার : অতীন্দ্র লাল বড়ুয়া, বয়স-৮৬, গ্রাম : ঘাটচেক, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম, ০৬.০৬.২০০৬

১৯২. সাক্ষাৎকার : সুনীতি কুমার বড়ুয়া, বয়স-৬১, গ্রাম : সৈয়দবাড়ি, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৩.০৬.২০০৬

১৯৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

১৯৪. সাক্ষাৎকার : অতীন্দ্র লাল বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

১৯৫. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলা কীর্তন গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৮

১৯৬. পলাশ মুৎসুদ্দী, শিক্ষক, আলাওল ডিগ্রী কলেজ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, পূর্বোক্ত

১৯৭. রতন বড়ুয়া, মাদল, পূর্বোক্ত,

১৯৮. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ১৫

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

# জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণ : ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম

## জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণ

সমাজব্যবস্থায় জীবনধারণের উপকরণের তালিকা কোনো কালেই পরিপূর্ণ হয় না। বৈচিত্রময় জীবনে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে প্রতিনিয়ত স্ব-স্ব স্বকীয়তায় মানুষ সংগ্রাম করে। এমতাবস্থায় একেক সম্প্রদায় বা জাতির গৃহনির্মাণ শৈলী যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় বা জাতি থেকে আলাদা তেমনি তার আলাদা খাদ্যাভাস ও পানীয় ; খাদ্যের পরিবেশন রীতিনীতি এবং খাদ্যসংক্রান্ত আচার-বিচার। তাছাড়া অবসরের ফাঁকে ক্লান্তি নিরসনে চিত্তোবিনোদন তথা হৈ উল্লাস করাও স্বাভাবিক। যা সমঝদার ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করে। উল্লিখিত বিষয়গুলো বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য।

### ১. খাদ্যাভাস, খাদ্য পরিবেশন রীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, পেশা, লোকসংখ্যা ও অন্যান্য

#### ১.১. খাদ্যাভাস

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাস এ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মতোই। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। এগুলো ছাড়া হরেকরকম শাকসব্জি এ জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে খাদ্যের প্রধান তালিকা থেকে আস্তে আস্তে মাছ নামক প্রিয় নিম্ন আয় স্তরের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর কাছে খাবার উঠে যাচ্ছে। অনেক সময় তারা কতকগুলো নিজস্ব খাদ্যাদি গ্রহণ করে। খাদ্যগুলো নিম্নরূপ[১] ; কাঁকড়ার মাংস, শামুক-ঝিনুকের মাংস, শুকরের মাংস প্রভৃতি। তাছাড়া এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রাণী হত্যা করে খেতে অভ্যস্ত নয়। তারা বুদ্ধ প্রবর্তিত গৃহীবিনয় পঞ্চশীল (Five Precept) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এহেন বিরতি পালন করে[২]। এমন কি মাসের প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমীতে কেউ কোনোরূপ মাংস খাদ্য তালিকায় রাখে না। অনেকে এ সময় ডিমও খাদ্যের তালিকায় রাখে না। শুটকি মাছ অন্যতম প্রিয় খাবার। তাছাড়া মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন একেবারে নাই বললেও চলে। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায় এ জনগোষ্ঠীও পান-সুপারী খায়। অনেকে আবার পানের সাথে জর্দ্দা এবং আদাপাতা খেতে অভ্যস্থ। তাছাড়া দেশীয় তামাক এবং বিড়িও তারা সেবন করে। এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ১লা বৈশাখের আগে কাঁচা আম খায় না। বিশ্বাস, কাঁচা আম খেলে কুকুর কামড় দিলে সহজে বিষ নামে না।

Dhaka University Institutional Repository

## ১.২. খাদ্য পরিবেশন রীতি

বড়ুয়া জনগোষ্ঠী অতিথি পরায়ণ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সামথ্যানুযায়ী অতিথিকে আপ্যায়ন করে। অতিথি আগমনে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। অতিথি আগমনের পর পরই ঋতু অনুযায়ী চা অথবা শরবতের পাশাপাশি সাধ্যমত নাস্তা এবং সামর্থ্যানুযায়ী ভুরিভোজের ব্যবস্থা করে। বিয়ের নিমন্ত্রিতদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে ভাত প্রদানের প্রথাসিদ্ধ নিয়ম এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান। এ সারিবদ্ধতা ঐক্য এবং সংহতির প্রতীক। তাছাড়া এ সারিবদ্ধতা সুন্দরভাবে আহার গ্রহণে সহায়তা করে। অতিথি এবং বিয়ের নিমন্ত্রণে দেশী বিড়ি এবং পান-সুপারী দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; এগুলো না করলে ভোজন পুরোপুরি হয় না, অর্থাৎ অর্ধভোজন হয়।

## ১.৩. পোষাক-পরিচ্ছেদ

এদেশে বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা পোষাক সচেতন। তাদের পোষাকেও বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে তারা একেকসময় একেকরকম পোষাক পরিধান করে। সচরাচর নয়/দশ বছর পযর্ন্ত ছেলেরা হাফ প্যান্ট এবং গেঞ্জি এবং মেয়েরাও হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরিধান করে। মেয়েরা অনেকসময় হাফ প্যান্ট এবং জামাও পরিধান করে। প্রাপ্ত বয়স্কর পুরুষরা বাড়িতে লুঙ্গি শার্ট বা গেঞ্জি পরিধান করে একং অবিবাহিত মেয়েরা পরিধান করে সালোয়ার কামিজ ও পায়জামা। বিবাহিত মহিলারা পরিধান করে পেটিকোটসহ শাড়ী ব্লাউজ এবং তারা সিঁথিতে আংশিক লম্বা করে সিঁদুর এবং কপালে সিঁদুরের লাল তিলক দেয়। সিঁদুর সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ; এটা মাঙ্গলিক চিহ্নের প্রতীক। যা পরিধানে স্বামীরা দীর্ঘায়ু এবং সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়[৩]। বৃদ্ধ পুরুষরা সচরাচর এক রংয়ের লুঙ্গি, গেঞ্জি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ধূতি পরিধান করে। তাছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর কাপড় নিম্নরূপ --

নবজাত শিশুর পোষাক : বিভিন্ন নক্শা চিত্রায়নের মাধ্যমে তাদের জন্য একধরনের লেংটি তৈরী করা হয়। তাছাড়া ছোট ছোট কাঁথাও তাদের জন্য তৈরী করা হয়।

বিবাহের পোষাক : বরের জন্য ধূতি, পাঞ্জাবী এবং মুকুট আর কনের জন্য নতুন শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং উভয়ের জন্য চাঁদর ও মাথার তাজ বা শেয়ারা পরিধান করে। উভয়ে নতুন জুতা এবং স্যাণ্ডেল ব্যবহার করে।

মৃত্যুব্যক্তির পোষাক : নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সাদা থানকাপড় ব্যবহৃত হয়। তবে যুবতী মেয়ের জন্য লালপাড়ের শাড়ী ও সিদুঁর ব্যবহার করে।

প্রব্রজ্যালাভীর পোষাক : এ সময় তারা নতুন আসক্তহীন সাদা কাপড় পরিধান করে।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধভিক্ষুর পোষাক : তারা অনাগারিক বিধায় সারাজীবন লোভ-দ্বেষ-মোহ বিদূরক আসক্তহীন লালচে কাপড় পরিধান করে ; যাকে চীবর[৪] বলা হয়।

সাধুমা'র পোষাক : সাদা শাড়ী অথবা হালকা লালচে শাড়ীসহ ব্লাউজ ও পেটিকোট পরিধান করে।

১.৪. পেশা

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পেশা বহুবিধ। দিন মজুর ও কৃষিকার্যেই তাদের অধিকাংশই নিয়োজিত। দিন মজুরদের মধ্যে অন্যের জমিতে কাজ করা, গাছ কাটা, রাজমিস্ত্রী, সুতার মিস্ত্রি ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া ড্রাইভার, টেইলার্স, বাবুর্চি, ক্ষুদ্রব্যবসায়ীও অন্যতম। এগুলো ছাড়াও এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি। তবে প্রাণী-ব্যবসার সাথে এ জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের সম্পৃক্ত করতে না চাইলেও বেঁচে থাকার তাগিদে অনেকেই এ পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে[৫]। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা হাঁস-মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পরিপালনের মাধ্যমে পরিবারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করে। তাছাড়া তারা বাড়ির আঙ্গিনায় বা বাস্তুভিটায় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নরকম শাক-সবজির চাষ করে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বচ্ছল, অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল এবং বিত্তবান পরিবার রয়েছে।

১.৫. গৃহ ও জালানী

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণশৈলী বা গৃহবিন্যাস বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর মতো। এ জনগোষ্ঠীর নিম্ন আয় স্তরের মানুষের গৃহ বাঁশ ও শন পাতা দিয়ে নির্মিত, নিম্নমধ্যবিত্ত আয়স্তরের মানুষের গৃহ বাঁশ ও টিন দিয়ে নির্মিত, মধ্যবিত্তরা আধা পাকা এবং বিত্তবানরা পাকা বাড়ির নির্মাণ করে। তারা রান্নায় বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী ব্যবহার করলেও বুদ্ধের বোধিলাভের কথা চিন্তা করে অশ্বত্থ গাছের ডালপালা এবং বুদ্ধ পূজায় ব্যবহৃত ফুল (Flowers) গাছের কোনো ডালপালা ও পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে না। তাছাড়া বটবৃক্ষের ডালপালাও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে না। বিশ্বাস, এ ডালপালা এবং পাতা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করলে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভকে অশ্রদ্ধা করা হয়। এতে অমঙ্গলোর আশংঙ্খা থাকে। তাই আজো বাংলাদেশে বসবাসরত এ জনগোষ্ঠী প্রায় সর্বত্রে এটাকে ধর্মীয়সংস্কার হিসেবে পালন করে।

১.৬. লোক খেলা

জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত বিরামহীনভাবে স্ব-স্ব কার্য সম্পাদন করে অনন্ত অসীম উদ্দীপনায়। এ রকম প্রেরণায় প্রোৎসাহিত করতে দরকার কাজের ফাঁকে অবসর। চিত্তবিনোদন বা এ হর্ষময়মুহূর্ত

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিধ উপায়ের মধ্যে খেলাধূলা অন্যতম। খেলাধূলার ভিতর দিয়ে মানবজীবনের দুটো[৬] প্রধান উপকার সাধিত হয়। যেমন :

ক. দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিতকতার মধ্যে আবিষ্টমনের মুক্তি ; এ মুক্তি সাময়িক হলেও জীবনযাত্রার পথে নবশক্তির সঞ্চর করে।

খ. শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ; কায়িক শ্রম সাপেক্ষে খেলাধূলায় শরীরের সুস্থতা ও সবলতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে।

সুস্থ সুন্দর-জীবনযাপনের জন্য উভয়বিধ খেলাধূলার প্রয়োজন। অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শরীর চর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দবিধানের জন্য হরেকরকম খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদির সৃষ্টি করেছে। এ গুলোর কিছু সংখ্যক হয়তো শুধু অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিক কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নিয়মকানুনসহ বহু খেলার উদ্ভাবন হয়েছে ; যা এখনো দেশে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত[৭]। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর খেলাধূলা মূলত দেশজ খেলাধূলার অর্ন্তগত। সামীয়ূল ইসলাম তাঁর 'বাংলাদেশের লৌকিক খেলাধূলা' গ্রন্থে বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধূলাকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন[৮]। যেমন : ক. ঘরের খেলা এবং খ. বাইরের খেলা। বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এদেশেরই একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ; যারা বাঙালিপনায় বিশ্বাসী। তাই এ জনগোষ্ঠীর লৌকিক খেলাধূলা সম্পর্কিত আলোচনায় উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাজনকে অনুসরণ করে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর খেলাধূলাকে নিম্নলিখিতভাবে বিভাজন করা যায়। যেমন --

ঘরের খেলা : কড়ই খেলা, বাঘবন্দি খেলা, ষোলগুটি খেলা, হাতগুটি খেলা, রান্নাবান্না খেলা, বউ খেলা ইত্যাদি।

বাহিরের খেলা : লুকোচরি খেলা, কানামাছি খেলা, ছি খেলা, ডাংগুটি খেলা, রুমালচুরি খেলা, ব্যাঙ খেলা, মরিচ খেলা (পানিতে), বলি খেলা, হা-ডু-ডু খেলা, সাতপাতা খেলা, সাত চাড়া খেলা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত খেলাধূলাগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্নভিন্ন নামে প্রচলিত। এ সমস্ত খেলাধূলা একদিকে আনন্দ বর্ধন করে অন্যদিকে জাতির অফুরন্ত প্রাণস্পন্দনও বটে। এগুলোর মধ্য দিয়ে জাতির বা সম্প্রদায়ের দৃঢ় আস্থা নীতিকথা এবং জাতির চরিত্রের সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভাবমূর্তি সুপ্রকাশন লাভ করে। এটা অপ্রিয় সত্য যে, তথ্যপ্রযুক্তি তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে শুধু বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নয় বরং সমগ্র জনগোষ্ঠী এখন এগুলোর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। তারপরও যাদের চিত্তবিনোদনের কিছুই নেই তারা উল্লিখিত খেলাধূলা করে আনন্দ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬. মেলা

মেলা অর্থাৎ বিশেষ কোনো উপলক্ষে বিকিকিনি তৎসহ আমোদ-প্রমোদ এবং সামাজিক সম্মেলনের এক উদার অস্থায়ী ব্যবস্থা। সচরাচর বছরের বিশেষ কোনো দিনে বিশেষ দিনগুলোতে মেলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আবালবৃদ্ধবণিতার যে সম্মিলন তার নাম মেলা। মেলা ক্রয়-বিক্রয়ের সমাবেশস্থল হলেও মেলার আনন্দ উপভোগের উপকরণের কারণে মেলা পরিণত হয় উৎসবে এবং সমাবেশে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় এ জনগোষ্ঠীর সকল মেলাই ধর্মাশ্রিত। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়, ধর্মাশ্রিত লোকিক মেলার বহিরঙ্গে আছে ধর্মীয় উপলক্ষ ও প্রেরণা কিন্তু অন্তিত্বে মিশে আছে বিনোদন ও ব্যবসায়ের ধারা। প্রায় সব গ্রামীণ মেলারই উৎস, উপলক্ষ আর্থ-সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত[৯]। এ মেলা লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ; যা আচার ব্যবহার কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির অর্ন্তগত। এ জাতীয় সংস্কৃতি মূলত অনুকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বংশ পরম্পরার প্রচার লাভ করে[১০]।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বৌদ্ধরাজাদের পৃষ্টপোষকতায় বৌদ্ধমেলা অনুষ্ঠিত হতো[১১]। বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মেলার ঐতিহ্য স্মরণাতীতকালের। তার উৎপত্তি, প্রসার এবং প্রচার অজ্ঞাত এবং এ বিষয়ে ইতিহাসের ধারাও নীরব। এ জনগোষ্ঠীর মেলায় আদ্যন্ত জানা না গেলেও ধারণা করা হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এ জনগোষ্ঠীর মেলার আর্বিভাব। মেলায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। উপলক্ষ যাই থাকুক না কেনো মেলার একটা সর্বজনীন রূপ আছে মেলায় অংশগ্রহণে সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিন্নতা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। মেলায় ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের আনাগোনা মৈত্রী সম্প্রীতির এক উদার মিলন ক্ষেত্র[১২]। এ জনগোষ্ঠীর মেলা বিভিন্ন পূর্ণিমা দিবসে হয়ে থাকে। যা পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর 'চট্টগ্রামে ইতিহাস' নামক গ্রন্থে আমরা দেখে থাকি[১৩]। তাছাড়া এ জনগোষ্ঠীর প্রথিতযশা মহাপুরুষদের জন্ম কিংবা মৃত্যু দিবসকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার ক্রয়-বিক্রয়টা একমাত্র ব্যাপার থাকে না। সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক অনেক কিছু মেলার উল্লেখযোগ্য অংশ। এতে বৈচিত্রহীন একঘেয়ে গ্রামজীবনবাসীরা বৈচিত্রের স্বাদ পায়। নাচ-গান-যাত্রা-পুতুল নাচ; ও কুস্তি ইত্যাদি শুধু গ্রামবাসীদেরকে প্রতিবছর বহু অপেক্ষিত বিনোদনের ব্যবস্থা করে তা নয় বরং এগুলো স্থানীয় সংস্কৃতিতেও যথেষ্ঠ উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে। এ মেলায় অশালীন কোন নাচ-গান হতো না কখনো। মেলায় যে সমস্ত দ্রব্যাদি বিকিকিনি হতো তন্মধ্যে কাঠের পুতুল, শুকনা লাউ এর খোসার বেলা, হরেকরকম

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশের বাঁশী, বাঁশের শানার, ছাতা, হাত পাখা, দড়ি, নানারকম পোড়ামাটির খেলনা, তৈজস পত্র, হরেকরকম পাটজাতীয় দ্রব্য মেয়েদের প্রসাধনী, বিভিন্নরকম মুখরোচক খাবার এবং মিষ্টি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন উৎসব ও পার্বন উপলক্ষে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সব মেলার আয়োজন করা হয় তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো[১৪] :

চৈত্র সংক্রান্তি মেলা

| মেলার নাম | মেলার স্থান |
|---|---|
| মহামুনি মেলা | পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম |
| ফরাচিন মেলা | বাগোয়ান, রাউজান, চট্টগ্রাম |
| চক্রশাল মেলা | পটিয়া, চট্টগ্রাম |
| মহামুনি মেলা | সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম |
| চৈত্য মেলা | চেঁদির পুকুর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম |
| শাক্যমুনি মেলা | রাজানগর, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম |
| মহামুনি মেলা | হাইদ চকিয়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম |
| রামকোট মেলা | রামকোট, রামু কক্সবাজার |
| মানিকপুর পরিনির্বাণ মেলা | মানিকপুর, চকরিয়া, কক্সবাজার |

মাঘী পূর্ণিমার মেলা

| মেলার নাম | মেলার স্থান |
|---|---|
| চৈত্য মেলা | মছদিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম |
| ব্যুহচক্র মেলা | পশ্চিম বিনাজুরি, রাউজান, চট্টগ্রাম |
| পরিনির্বাণ মেলা | রাউজান, চট্টগ্রাম |
| সূর্যবৈদ্যর মেলা | আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম |
| মহামুনি মেলা | আবদুল্লাহপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম |
| পরিনির্বাণ মেলা | শীলঘাটা, সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম |
| বুড়া গোঁসাই মেলা | ঠেগরপুনি, পটিয়া, চট্টগ্রাম |
| গোবিন্দঠাকুরের মেলা | ইদিলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম |
| চুলামনি মেলা | ভাবুয়া (লাঠিছড়ি), রাউজান |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| মাঘী পূর্ণিমার মেলা | চিৎনরং, পটিয়া, চট্টগ্রাম |

ফাল্গুনী পূর্ণিমা মেলা

| মেলার নাম | মেলার স্থান |
|---|---|
| ধাতুচৈত্য মেলা | ইছামতি, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম |
| ধাতু মেলা | বরিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম |
| আচরিয়া মেলা | ঊনাইনপুরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম |
| বোধি মেলা | ফতেনগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম |

বৈশাখী পূর্ণিমা মেলা

| মেলার নাম | মেলার স্থান |
|---|---|
| বোধিদ্রুম মেলা | বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম |
| বুদ্ধ পূর্ণিমা মেলা | করৈয়া নগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম |
| অমিভাভ মেলা | মেরুংলোয়া, রামু, কক্সবাজার |
| শাক্যমুনি মেলা | ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম |
| বৈশাখী পূর্ণিমা মেলা | কোটবাজার, উখিয়া, কক্সবাজার |

লোকঐতিহ্য এবং লোকসাংস্কৃতিক এ মেলায় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তবে উদোক্তা আর পৃষ্টপোষকতার অভাবে গ্রামীণ এ মেলা আর আগের মতো সবাইকে আকর্ষণ করে না। মেলা আমাদের শেখড়। সুতরাং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রয়োজনে এ লোকমেলাকে ধরে রাখা অত্যাবশ্যক। কেননা এতে আছে নাড়ীর টান-আত্ম পরিচয় সর্বোপরি অস্তিত্বের শেখড়।

## ১.৭. বাদ্য যন্ত্র

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবন এবং চিত্তবিনোদন দুই-ই বিদ্যমান। এ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির আদৌলেই পরিবেশিত হয়। তাদের কীর্তনগানে মৃদঙ্গ, কাঁসা এবং মন্দিরার ব্যবহার অত্যাবশকীয়। আধুনিক সভ্যতার নান্দনিত ছোঁয়া সাংস্কৃতিক অঙ্গন দখল করলেও এখনে এ জনগোষ্ঠীর কীর্তনগানে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কমে যায়নি এখনো। এগুলো বাজানোর জন্য এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাই

Dhaka University Institutional Repository

পেশাধারী বাদকদল। সুর ব্যঞ্জনাকে মাধুর্য্যময় এবং শ্রুতিমধুর করে তোলার জন্য তারা বংশ পরম্পরায় বা উৎসাহীজন বাদ্যযন্ত্রের তাললয় আয়ত্ব করে।

## ১.৮. আবাস ও আবাসিক এলাকা

বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বাঙালি জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী। এদের কোনো স্বতন্ত্র আবাসিক এলাকা নেই। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও বৃহত্তর চট্টগ্রামে তাদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তারা দীর্ঘদিন সৌহার্দ সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। নিরাপত্তা ও সামাজিক কারণে আদিবাসী বৌদ্ধদেরকে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে দেখা গেলেও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা একেবারে নেই বললেও চলে।

## ১.৯. বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধেরা বিভিন্ন নৃ'গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন – চাকমা, মারমা, তনচঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, রাখাইন, সিংহ ও বড়ুয়া। তারা বিভিন্ন উপভাষায় ভাব আদান প্রদান করে এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার-সংস্কৃতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বাঙালি আচার-আচরণে ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এদেশের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নাম বড়ুয়া জনগোষ্ঠী । যারা সবাই থেরবাদী বৌদ্ধ ভাবধারায় বিশ্বাসী। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব (South-estern) বৃহত্তর চট্টগ্রামে তারা বসবাস করে। বাংলাদেশের মোট ১৩০.৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যার ০.৭% জন বৌদ্ধ এদেশে বসবাস করে[১৫]। এ রিপোর্টে ১৯০৩ থেকে ১৯৪১ ইং এদেশে মোট জনসংখ্যার কতজন বৌদ্ধ বসবাস করতো তার কোনো হিসেব নেই। তবে ১৯৫১ সাল থেকে পরিসংখ্যানে বৌদ্ধদের শতকরা হার পাওয়া যায়। যেসব গ্রামে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এ সর্ম্পকিত বিস্তৃত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত সারণিগুলো দৃষ্টনীয়।

সারণি–১

থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| রাউজান | ৩২০ | ২২০০ |
| জামুয়াইন | ৪০ | ২৫০ |
| হিঙ্গলা | ৬৩ | ৫২০ |
| কদলপুর | ১২০ | ৭৪০ |
| পাহাড়তলী | ৫৮০ | ৩৯৪০ |
| সুরঙ্গা | ৪০ | ২৭৫ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| পূর্ব আধার মানিক | ১৪০ | ১০৫০ |
| মধ্য আধার মানিক | ১৬০ | ১০৭০ |
| পশ্চিম আধার মানিক | ২১০ | ১৪০০ |
| উত্তর গুজরা | ১১০ | ৬৮০ |
| কদলপুর | ২০ | ১২৭ |
| পূর্ব বিনাজুরী | ৬৫ | ৪৪৫ |
| মধ্যম বিনাজুরী | ১৩০ | ৮৫০ |
| পশ্চিম বিনাজুরী | ২৬০ | ২০০০ |
| পূর্ব ইদিলপুর | ১৩০ | ৯৫০ |
| ইদিলপুর | ৪০ | ২৯০ |
| মধ্যম ইদিলপুর | ৫০ | ৩৬০ |
| খৈয়াখালী | ৮৫ | ৭৪০ |
| হোয়ারাপাড়া | ৪৩০ | ৩৪২৫ |
| ছাদাংগরখীল | ৭০ | ৪৮০ |
| পূর্বগুজরা | ৩৫ | ২৪০ |
| হলুদিয়া | ৭০ | ৫১০ |
| অদাবুর খীল | ১১০ | ৭৫০ |
| উত্তর ঢাকাখালী | ১২০ | ৮৩৫ |
| দক্ষিণ ঢাকাখালী | ১৬৫ | ১১২৫ |
| ডোম খালী | ৬৫ | ৫২৫ |
| পশ্চিম আবুরখীল | ১৩৫ | ১০২০ |
| পাঁচখাইন | ৮০ | ৫৮০ |
| বাগোয়ান | ৫০ | ৪৩০ |
| নোয়াপাড়া বৈদ্যপাড়া | ১২০ | ৭৫০ |
| ফতেনগর | ৫০ | ৩৫০ |
| লাঠিছড়ি | ১০০ | ৭০০ |
| উত্তর জয়নগর | ৬০ | ৪২৫ |
| দক্ষিণ জয়নগর | ৫০ | ৩৮০ |
| গহিরা | ৭০ | ৫০০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি – ২

থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| সৈয়দবাড়ি | ১২০ | ৭৮০ |
| ইছামতি | ১৭০ | ১২৫০ |
| ঘাটচেক | ১২৫ | ১০৭০ |
| কুলকুরমাই | ২০০ | ১৩৭০ |
| নজরের টিলা | ১৫০ | ১০৪০ |
| শিলক | ২৭০ | ১৬০০ |
| পাইট্যালির কুল | ৭০ | ৪৫০ |
| রাজানগর | ১৫০ | ৯৮০ |
| ত্রিপুরা সুন্দরী | ৪০ | ২৭৫ |
| পোমরা | ৫৫ | ৪২০ |
| বেতাগী | ২১০ | ১৪৮০ |
| ফিরিঙ্গীর খিল | ৩২৫ | ২১৫০ |
| পদুয়া | ৪০০ | ২৮৭০ |
| সুখবিলাস | ২৫০ | ১৭৪০ |
| হরিহর | ২০০ | ১৪৮০ |
| ধামাইর | ১৫০ | ১০১০ |

তথ্য উৎস : সম্যক ২০০৫

সারণি – ৩

থানা : ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| সুন্দরপুর | ২০ | ১২৫ |
| ভূজপুর | ৬৫ | ৪৭০ |
| আমতলী | ১০ | ৮০ |
| হাইদচকিয়া | ২৫০ | ১৭৫০ |
| জানারখিল (চিলোনিয়া) | ৬০ | ৩৯০ |
| সুন্দরপুর (চেউঙ্গার পাড়) | ২৫ | ১৬৫ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| নানুপুর | ২৭৫ | ১৮৮০ |
| কোঠের পাড় (জাহানপুর) | ১০০ | ৭২৫ |
| নিশ্চিন্তাপুর | ২৫ | ১৫৫ |
| হারুয়ালছড়ি | ৫০ | ৩৪০ |
| আবদুল্লাহপুর | ৩০০ | ২১০০ |
| ধর্মপুর | ৪০ | ২৮৫ |
| চন্দ্রাখীল | ৭৫ | ৫১০ |
| ফরাঙ্গীর খীল | ৬৫ | ৪২০ |

তথ্য উৎস : সম্যক ২০০৫

সারণি – ৪

থানা : হাট হাজারী, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| মির্জাপুর | ৬৩ | ৩৭৫ |
| গুমানমর্দন | ৫৫ | ৩১০ |
| রুদ্রপুর | ৩০ | ২০০ |
| জোবরা | ১৫ | ১৩০০ |
| মিরেরখিল | ৩৫ | ২২৫ |
| উদালিয়া | ৪০ | ২৫০ |
| বালু খালি | ৩৩ | ২১৫ |
| মাদার্শা | ১০০ | ৭২০ |
| চ.বি. (বিশ্বশাণ্ড প্যাগোডা) | ৫ | ৩৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ৫

থানা : পটিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| পাঁচরিয়া | ১৩৫ | ১০৮০ |
| চরকোনাই | ৬০ | ৪২০ |
| কোলাগাঁও | ৩০ | ২১০ |
| লাখেরা | ১৩০ | ১১০০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| পিঙ্গলা | ১২৫ | ৮৯৫ |
| বেলখাইন | ১০০ | ৭২০ |
| কর্তালা | ২১০ | ১৪৫০ |
| মেহের আঁটি | ২৫ | ১৩০ |
| তেকোটা | ১২০ | ৮২০ |
| মৈতলা | ৫৫ | ৩৮০ |
| মুকুটনাইট | ১৫০ | ১১০০ |
| পায়রোল | ৪০ | ২৬০ |
| ঊনাইনপুরা | ১৫০ | ১১২০ |
| নাইনখান | ১০৫ | ৭২০ |
| নাগধর | ১২ | ৮০ |
| করল | ১২০ | ৮০০ |
| ঠেগরপুনি | ১২৫ | ৮২৫ |
| বাকখালি | ৫০ | ৩৩০ |
| বরিয়া | ৬৫ | ৪২৫ |
| বাথুয়া | ১৩০ | ৮১০ |
| ছুতরপটিয়া | ৬০ | ৪০০ |
| জোয়ারা (খানখানাবাদ) | ৬৫ | ৪১০ |
| ভাণ্ডার গাঁও | ১১০ | ৭২৫ |
| শাহ মিরপুর | ৪৫ | ২৮৫ |
| পটিয়া (সদর) | ৭০ | ৩৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ৬

থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| শাকপুরা | ১৫০ | ১১০০ |
| পশ্চিম শাকপুরা | ৪৫ | ৩১০ |
| গোমদণ্ডী | ৫০ | ৩২৫ |
| হাজারীর চর | ১২৫ | ৮৬০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| কদুর খীল | ৯০ | ৬২৫ |
| খরনদ্বীপ | ৫০ | ৩৪০ |
| চরনদীপ | ৫০ | ৩৪৫ |
| জৈষ্ঠ্যপুরা | ১৩০ | ৯০ |
| শ্রীপুর | ১০০ | ৬৭০ |
| বৈদ্যপাড়া | ২০০ | ১৪২০ |
| সরোয়াতলী | ২৫ | ১৭০ |
| পশ্চিম আমুচিয়া | ২৫ | ১৮০ |
| পূর্ব আমুচিয়া | ৩৪ | ২৮০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ৭

থানা : আনোয়ারা, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| রুদুরী | ৭০ | ৫৬৫ |
| তালসরী | ৪৫ | ৪২৫ |
| মুছুদ্দিপাড়া | ১২ | ১৩০ |
| কেয়াঁগড় | ৪০ | ২৭০ |
| তিশরী | ৪২ | ৩৩০ |
| ওযখাইন | ২৮ | ১৯৫ |
| চেনামতি | ৭০ | ৫১০ |
| বটতলী | ২৫ | ১৭৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ৮

থানা : সাতকানিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| পুরানগড় | ১১ | ৭৩ |
| উত্তর পুরানগড় | ৩৬ | ২৩৮ |
| বাকরআলি বিল | ৯৩ | ৫৭০ |
| বড় হাতিয়া | ১২৯ | ৭৯০ |
| বড় দুয়ারী | ৮০ | ৫৪০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| শীলঘাটা | ১৬৫ | ১৫০০ |
| ঢেমশা | ১৭৫ | ১৫৪০ |
| কড়িয়ানগর | ১৫০ | ১১২৫ |
| রূপনগর | ৪৫ | ৩০০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ৯

থানা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| ফাতেনগর | ১৭০ | ১০০০ |
| কাঞ্চননগর | ৪০ | ২২৫ |
| কানইমদারী | ১৬০ | ১১০০ |
| সুচিয়া | ৮০ | ৭০০ |
| মধ্যম জোবরা | ৭০ | ৪৫ |
| পূর্ব জোবরা | ৮০ | ৭০০ |
| দক্ষিণ জোবরা | ৪৫ | ৪০০ |
| সাতবাড়িয়া (বেপরী পাড়া) | ১১৫ | ৬০০ |
| সাত বাড়িয়া (দেওয়ানজী পাড়া) | ১০০ | ৫৫০ |
| ধুয়াঁর পাড়া | ২৫ | ১৪০ |
| বৈলতলী | ১৫ | ৮০ |
| পশ্চিম ধোপা ছড়ি | ১২ | ৬৫ |
| নাইক্ষং ছড়ি | ১৬ | ১৩৫ |
| পূর্ব ধোপাছড়ি (চেরিরমুখ) | ২৮ | ১৭০ |
| হাসিমপুর | ৩৫ | ২০০ |
| উত্তর হাসিমপুর | ৩৩ | ২০০ |
| দক্ষিণ হাসিমপুর | ২৮ | ১৭০ |
| পূর্ব হাসিমপুর | ২০ | ১১৫ |
| বরমা | ১৫ | ১০০ |
| চর বরমা | ৩৫ | ২২০ |
| দিয়ার কুল | ৩৫ | ২১৫ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| জামির জুরি | ১০০ | ৬১০ |
| গাছবাড়িয়া | ২৫ | ১৫০ |
| মহানগর | ০৫ | ৩২০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১০

থানা : বাশঁখালী, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| জলদী | ৪৭০ | ৪৭০০ |
| শীলকুপ | ৪৫০ | ৪০০০ |
| দক্ষিণ জলদী | ৭০ | ৫০০ |
| মিজ্রিতলা (কাহারঘোনা) | ৬০ | ৪০০ |
| পুই ছড়ি | ১০ | ৭৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১১

থানা : লোহাগাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| মছদিয়া | ২৭৫ | ২০০০ |
| খুস্যাংগের পাড়া | ৫১ | ২৬০ |
| আধুনগর | ৬০ | ৫০০ |
| ডলুকুল | ৫৫ | ৩০০ |
| চেঁদিরপুনি | ২১ | ৮২৭ |
| পুটিবিলা | ৮৫ | ৩১৫ |
| নারিচ্ছা | ৬২ | ৪৬২ |
| কলাউজান | ৩২ | ২০২ |
| পহরচাঁদা | ৩০ | ১৮০ |
| লক্ষণের খিল | ১০৫ | ১২৫০ |
| বিবির বিলা | ৫১ | ৪৫৬ |
| মাইজ বিলা | ১১ | ৮৫ |
| আদার চর | ৩২ | ২১৮ |
| পদুয়া | ৪৪ | ২৮৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি – ১২

থানা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| মানিকপুর | ১৪৫ | ১০২৫ |
| ঘুনিয়া | ৪৫ | ৩১০ |
| বিনিমারা (নিজপান খালী) | ১৪০ | ১০০০ |
| হারবাং | ৪৫ | ২৭৫ |
| বিন্দানীর খিল | ৪৫ | ৩০০ |
| মধুখালী | ৪৫ | ৩১০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৩

থানা : মহেশখালী, জেলা : কক্সবাজার

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| উত্তর নলবিলা | ৩০০ | ২২১৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৪

থানা : রামু, জেলা : কক্সবাজার

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| মেরুংলোয়া | ৫০০ | ৩৫০০ |
| পূর্ব মেরুংলোয়া | ২০০ | ১৪৮০ |
| উত্তর মিঠাছড়ি | ১১৫ | ৮৯০ |
| চাকমার কুল | ৩৫ | ২২০ |
| হাজারী কুল | ১০০ | ৮২০ |
| রাজার কুল | ৩০০ | ২১০০ |
| শ্রীকুল | ১০০ | ৭২০ |
| নাসীকুল | ২০০ | ১৪৫০ |
| ফারীকুল | ১০০ | ৭৩০ |
| জাদী পাহাড় | ১০০ | ৭১৫ |
| উখিয়াঘোনা | ৪০ | ৩০০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| রামকোট | | |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৫

থানা : কক্সবাজার (সদর) জেলা

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| ঝিলংঝা | ৫২ | ৩৭০ |
| পূর্ব ঝিলংঝা | ৫০ | ৩৬৫ |
| বল্লী পাড়া | ৪৫ | ৩১০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৬

থানা : উখিয়া, জেলা : কক্সবাজার

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| রাজাপালং | ৩৫ | ২৪০ |
| হলদিয়াপালং (বড়বিল) | ২০ | ১৫০ |
| রুমখাঁ পালং | ১৫০ | ১০০০ |
| পুরাতন রুমখাঁ পালং | ২১০ | ১৪০০ |
| রুমখা পালং (চৌধুরী পাড়া) | ১০০ | ৭৫০ |
| নলবুনিয়া (পাতাবাড়ি হলদিয়া) | ১৩০ | ৮০০ |
| তেল খোলা | ৪৫ | ৪০০ |
| মরিচ্যা পালং (সজনীর পাড়া) | ৬৫ | ৪০০ |
| পাতাবাড়ি | ২৬০ | ১৮০০ |
| কুতুপালং | ৮৫ | ৫৩০ |
| কুতুপালং-২ | ২০০ | ১৪০০ |
| শৈলার ঢেবা | ৯৫ | ৬৭৬ |
| মধ্যম রত্না | ১৩৫ | ৯৫০ |
| পুর্ব রত্না | ২০ | ১৫০ |
| পুর্ব রত্না-২ | ৬৫ | ৪৫০ |
| পুর্ব রত্না-৩ | ৭০ | ৪৭০ |
| ভালুকিয়া পালং | ১৪০ | ৯৫০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| জালিয়া পালং | ৪০ | ২৫০ |
| রেজার কুল | ৫০ | ৩০০ |
| রেজুর কুল-২ | ৪০ | ২৩৫ |
| কোট বাজার | ১০৫ | ৯৮০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৭

থানা : সীতাকুণ্ড, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| সীতাকুণ্ড | ৪০ | ২৭০ |
| বাড়বকুণ্ড | ৪০ | ২৮০ |
| পান্থশালা | ৮০ | ৫৬০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৮

থানা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| দমদমা | ৪৯০ | ৩৪৭৫ |
| মায়ানী | ৩২০ | ২২২৫ |
| জোরারগঞ্জ | ৩৫ | ২৪৫ |
| তুলা বাড়িয়া | ৫৫ | ৩৮৫ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ১৯

থানা : বান্দরবান, জেলা : বান্দরবান

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| বান্দরবান | ২০০ | ১২৫০ |
| বালাঘাটা | ১৫০ | ৯৭০ |
| বালাঘাটা (সদর) | ৫০ | ৩৪০ |
| লেবুছড়ি | ১০০ | ৭৩০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ২০

থানা : লামা, জেলা : বান্দরবান

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| লামার মুখ | ৫০ | ৩২০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| দরদড়ি | ৪৫ | ২৮০ |
| বাজবাড়ি | ১৫ | ১১০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

সারণি – ২১
থানা : খাগড়াছড়ি, জেলা : খাগড়াছড়ি

| গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
|---|---|---|
| খাগড়াছড়ি (সদর) | ৫০ | ৩২০ |
| মহালছড়ি থানা | ৪০ | ২৮০ |
| বোয়াল খালি (দিঘীনালা থানা) | ১৫০ | ১০৪০ |

তথ্য উৎস : সম্যক, ২০০৫

এদেশে বসবাসরত মোট বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পরিবার সংখ্যা ২৩,৭৭৭[১৬] এবং মোট জনসংখ্যা ১,৭৫,৫০৭ জন। তাছাড়া ঢাকা শহরে ১০,০০০, চট্টগ্রাম সদর ও চান্দগাঁও (চট্টগ্রাম) এলাকায় ৫০,০০০ রাঙ্গামাটি সদরে ৮৪০ জন, রাঙ্গামাটি জেলার রুমা থানায় ৮৫০ জন এবং রামগড়ে ১৮০ জন বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাছাড়া ৫৮৩ জন বড়ুয়া বৌদ্ধভিক্ষু এবং ৬৩১ জন শ্রামণ আছে[১৭]। সুতরাং দেখা যায় এদেশে মোট বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ২,৩৮,৫৯১ জন বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এখানে তথ্যে রামকোট এর পরিবার ও লোকসংখ্যা উল্লেখ হয়নি। উপরিউক্ত তথ্য গবেষণায় নারী-পুরুষের সংখ্যা এবং উভয়ক্ষেত্রে বয়সের কোনো তারতম্য সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শন করা হয়নি। এ ছাড়া কুমিল্লা নোয়াখালী জেলায় ৯৪৩ পরিবার বসবাস করে এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৬,২১৫ জন[১৮]। একসময় কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে বসবাসরত বৌদ্ধরা সিংহ বা সিন্‌হা পদবী লিখলেও সময়ের প্রেক্ষাপটে এখন অনেকেই বড়ুয়া পদবী লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

## ১.১০. উত্তরাধিকার নীতি

বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বসবাস করে। প্রতিটি সম্প্রদায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যর অধিকারী। ধর্ম-সংস্কৃতি ও সামাজিককতায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী স্বকীয় জাতিসত্তায় সমুজ্জ্বল হলেও এদের নেই কোনো নিজস্ব উত্তরাধিকার আইন। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীন এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সমাজ আছে, পরিবার-পরিজন আছে, উত্তরাধিকার আছে, কিন্তু উত্তরাধিকার আইন নেই[১৯]। বাংলাদেশে ও ভারতের বৌদ্ধরা ভারতের ১৯৫৬ সালের সংশোধিত হিন্দু দায়া ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

আইন দ্বারা পরিচালিত[২০]। অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর (১৯৮২) আহবানে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক একটি রূপরেখা উপর বিভিন্ন পেশাজীবি, শিক্ষবিদ, আইনবিদ এর সমন্বয়ে একটি কর্মশালা ২৬ জানুয়ারি ২০০৬ কুমিল্লার বার্ড (BARD) এ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনোরকম সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় নি। তাছাড়া ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম শহরস্থ আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তন কেন্দ্রে অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও পোষ্টমর্টেম-এর যৌথ উদ্যোগে বৌদ্ধ পারিবারিক আইন প্রণয়ন ; সংকট ও উত্তরণ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠির মধ্যে ছেলে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। পিতার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের কোনো অধিকার বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বীকৃতি নয়। কোনোব্যক্তির পুত্র সন্তান যদি না থাকে তবে মৃত্যুর পূর্বে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি তার মেয়ের নামে উইল করে দিলেই কন্যাসন্তান পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়। তা না হলে ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি তার ভাই কিংবা ভাইয়ের ছেলের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনিভাবে যে কোনো পরিস্থিতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতার দিকেই থাকবে – মাতার দিকে না।

### ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুধর্মের সমন্বিতরূপ লক্ষ্য করা যায়। জন্ম-মৃত্যু এবং সন্ন্যাসজীবনকে কেন্দ্র করে তাদের রয়েছে বিস্তৃত আচার-অনুষ্ঠান। এ সব আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থিতি দৃশ্যমান।

## ২. সামাজিক প্রথা ও ধ্যান ধারণা

### ২.১. আদ্য ঋতুমতী

আদ্য ঋতুমতী হওয়া মাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। আদ্য ঋতুই নারীগর্ভের সৃষ্টি শক্তির উন্মেষ ঘটায়। আদ্য ঋতু এবং রজোনিবৃত্তির মধ্যেবর্তীকালে নারীগর্ভ সৃষ্টিশীল থাকে। নিয়মিত রজোদর্শন ও রজোরক্তের স্বাভাবিক গর্ভোৎপত্তির অনুকূল[২১]। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রথম ঋতুমতী হওয়াকে উর্বরতাবাদের বহিঃব্যঞ্জনা বলে মনে করে। এ সময় তাকে আলাদা করে রাখা হয়। তাদের বিশ্বাস, ঋতুচলাকালীন সময়ে সে অপবিত্র থাকে এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। এ সময় তার চলাফেরা বিধিনিষেধ এখনো বর্তমান। আদ্য ঋতুমতী উপলক্ষে অনেকেই পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে মিষ্টি খাইয়ে থাকে। শারিরীক সুস্থতা কামনায় আর্থিক স্বচ্ছলব্যক্তি বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্বারা আপ্যায়ন করত দানীয়সামগ্রী প্রদান দান করে।

Dhaka University Institutional Repository

## ২.২. গর্ভোৎপাদন

স্বামী-স্ত্রীর রতিক্রিয়া ব্যতীত গর্ভোৎপাদন অসম্ভব। তাছাড়া সুস্থ নীরোগ সন্তানই সকলদম্পতির একান্ত কাম্য। শুভাশুভ তিথি ছাড়াও দিনক্ষণ মেনে সহবাস করলে কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করা যায় এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস। বিষ্ণু সংহিতার বিধান অনুযায়ী দাম্পত্য রতিক্রিয়ার বিধিনিষেধ নিম্নরূপ ---- অষ্টমী, চর্তুদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে স্ত্রীসম্ভোগ করবে না। শ্রদ্ধীয়ান ভোজন করে শ্রাদ্ধ করে, শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, কাম্যস্নান বা কাম্যহোম করে, ব্রতাবলম্বী হইয়া, উপবাস করে স্ত্রী সম্ভোগ করা না। দেবায়তন, শ্মশান ও শূন্য গৃহে স্ত্রীসম্ভোগ করবে না। মলযুক্তাকে বা স্বয়ং মলযুক্ত হইয়া উপগমন করবে না। রোগাতাকে বা স্বয়ং রোগার্ত হইয়া উপগমন করবে না। দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে ইচ্ছা পোষণ করিলে হীনাঙ্গী অধিকাঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ গর্ভবর্তী নারীতে উপগত হবে না[২২]। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে স্থানীয় এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবে সদৃশ বিধিবিধানের প্রচলন এখনো বর্তমান। তাছাড়া রতিক্রিয়ায় নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুলো এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যেমন [২৩]:

ক. বুদ্ধের ছবির দিকে পা দিয়ে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ।

খ. উপোসথ দিবসে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ;

গ. মাতা-পিতার ছবির দিকে পা দিয়ে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ;

ঘ. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ;

গর্ভোৎপাদনকালীন সময়ে তারা গরমচূলা লেপন করে না। বিশ্বাস ; এতে সন্তান সন্ততি ভূমিষ্ট হবার পর তারা অস্থির প্রকৃতির হয়। ইদুরের গর্ত ভরাট করে না। বিশ্বাস ; এতে গর্ভে সন্তান মৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। বোয়াল মাছ এবং হাঁসের ডিম খায় না, বিশ্বাস ; এতে বোয়াল মাছের মতো চোখ বড় হয়। তাছাড়া গর্ভবতীকালীন সময়ে কচুরলতি খেতে দেয় না, বিশ্বাস ; এতে নবজাতকে শ্লেষা বৃদ্ধি পায়। ইলিশ মাছ এবং খাসীর মাংস খায় না, বিশ্বাস ; নবজাতকেরা চর্মরোগ বৃদ্ধি পায়।

## ২.৩. সাধভক্ষণ

সাধভক্ষণ একটি লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'হাদি' নামে পরিচিত। গর্ভের পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম মাসের যে কোনো একটি দিনে গর্ভবর্তী রমনীকে ঘটা করে সাধ খাওয়ানো হয়[২৪]। তবে গর্ভের নবম মাসে এ জনগোষ্ঠীরা সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান করে[২৫]। এটি একটি লোকাচারিক আচার ; যা শুভ দিনক্ষণ দেখে সম্পন্ন করা হয়। এদিন সন্তান সম্ভাবার জন্য তার পিত্রালয় থেকে সুস্বাদু-পুষ্টিকর মুখরোচক খাবার তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এক সাক্ষাৎকারান্তে জানা যায়, অনেকে আবার পঞ্চম বা সপ্তম মাসেও এ সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান করে[২৬]। এ সময় গর্ভবর্তী রমনী নতুন শাড়ী পরিধান করে। অনেকেই অখণ্ড লাল পাড়ের শাড়ীও পরিধান করে।

Dhaka University Institutional Repository

মা এবং সন্তানের মঙ্গলকামনায় অনেকে এ সময় বাড়ীতে বৌদ্ধভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য দ্বারা আপ্যায়ন করে সূত্রপাঠ[২৭] শ্রবণ করে। স্ত্রীলোক গর্ভবর্তী হলে বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ। তাই পঞ্চ আয়স্তীসহ এ সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার প্রথাসিদ্ধ নিয়ম বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো বহুল বিস্তৃত।

২.৪. নিঃসন্তানদের সন্তান কামনা

বিবাহের উদ্দেশ্য পরিবারের উত্তরাধিকার সৃষ্টি। প্রায় সকলধর্ম বা সমাজে বিশ্বাসটি প্রচলিত। তাই বিবাহের তিন/চার বছরের মধ্যে পরিবারে নতুন অতিথি আসবে সেটাই স্বাভাবিক। বন্ধ্যা নারী ও আঁট কুড়ে পুরুষ প্রায়শ সমাজে নিন্দার ভাগী হয়। তাই বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ করা আবশ্যক। একে Unnatural birth motif বা অলৌকিক জন্ম মটিফ বলা হয়। এ বিষয়ে প্রদ্যোত কুমার মাইতি বলেন ; একদিকে নারীত্বের চরম বিকাশের আকাঙ্খা ও ধর্মীয়সংস্কার অন্যদিকে সামাজিক অবজ্ঞার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আশা থেকেই নিঃসন্তান স্ত্রী-পুরুষ সন্তান লাভের জন্য নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে[২৮]। প্রায় সকল জনগোষ্ঠীতে জন্ম মটিফের নমুনাচিত্র প্রায় একইরকম। যেমন : তাবিজ নেওয়া, বিভিন্ন মাজারে ও বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে গমন, বৌদ্ধ ভিক্ষুর বা সাধুর পানি পড়া ইত্যাদি নেওয়া। সন্তান কামনায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অনেকেই তিন মাস (আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত) আবার কেউ কেউ অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ পালন করে। ধর্মীয় পর্বে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে লোক পরম্পরায় তারা দেখে শেখেও এগুলো সচারাচর পালন করে।

৩. জন্ম ও জন্ম পরবর্তী সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান

৩.১. প্রসব ও প্রসবোত্তর আচার

সুস্থ মা মানেই সুস্থ সন্তান। সন্তান প্রসবকারী রমনী এ সময় কর্মের মধ্যে দিয়ে শারিরীকভাবে সুস্থ থাকতে চায়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুর পিতৃগৃহেই সন্তান প্রসব করার নিয়ম আছে। অনেক সময় এ সন্তান প্রসব মেয়ের পৈতৃক বাড়িতেও হয় ; তা অত্যন্ত কম। সন্তান ভূমিষ্ট সমাসন্ন হলে তাকে আলাদা ঘরে রাখা হয়। যথাসময়ে সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ট হলে একটি বাঁশের আঁশ বা ব্লেড দিয়ে গর্ভফুল থেকে নাভি কর্তন করে কালো সুতা দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ সময় নাভিতে আগুনের তাপ দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। নাভি ঝড়ে পড়ে গেলে তা অতি যত্নসহকারে তুলে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে তাদের বিশ্বাস, নবজাতকের পেট কামড়ালে ঐ নাভি ধৌত করে পানি পান করালে নবজাতকের পেট কামড়ানো বন্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুত্র সন্তান লাভে পাঁচবার এবং কন্যাসন্তান লাভে তিনবার উলুধ্বনি দেওয়া হয়। এগুলো সন্তান লাভের সাংকেতিক চিহ্নস্বরূপ। উলুধ্বনির মাধ্যমে পাড়া প্রতিবেশী বুঝতে পারে পুত্র সন্তান নাকি কন্যাসন্তান জন্ম হলো। ভূমিষ্ট হবার পর পরই সদ্যজাত শিশুকে মধু খাওয়ানো হয়। বিশ্বাস, মধু খাওয়ালে শিশু সারাজীবন মিষ্টভাষী ও আচার-আচরণে ভালো হয়। জীবনে প্রথম সন্তান লাভ হলে প্রসূতির পৈতৃক গৃহে নাপিতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হয়। এ জনগোষ্ঠির মধ্যে নাপিতকে তার (প্রসুতি) মাতাপিতা যথাসম্ভব সম্মানি দেয়। নাপিত পাঠানো সর্ম্পকে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; এতে সদ্যজাত শিশু দীর্ঘজীবন লাভ হয়। এ সময় প্রসূতিকে মরিচযুক্ত তরিতরকারী খেতে দেওয়া হয় বিধায় তাদের আর কোনো ঔষধপত্র তেমন দরকার হয় না বলে অনেকে মনে করলেও অনেকেই ডাক্তার শরণাপন্ন হয়। সাতদিন কিংবা পাঁচদিন পর প্রসূতি সমস্ত ঘর নিজ হাতে লেপনী দিয়ে স্নানের মাধ্যমে পুত-পবিত্র হয়ে স্বাভাবিককর্ম সম্পাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

### ৩.২. নামকরণ অনুষ্ঠান

পাঁচ দিন কিংবা সাতদিনের মধ্যে প্রসূতি পরিশুদ্ধ হয়। এদিনেই শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান করা হয়। এ উপলক্ষে প্রসূতির বাবার বাড়ির লোকজন এবং তাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নবজাতকের জন্য নতুন কাপড়, দোলনা ইত্যাদি নিয়ে শিশুর পিতৃগৃহে আসে। এদিন শিশুর পিতৃগৃহে বৌদ্ধভিক্ষুকে পিণ্ডদান করা হয় এবং পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সামর্থ্যানুযায়ী নিমন্ত্রন করে খাওয়ানো হয়। এ সম্পর্কে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; এ দিনে অন্যদেরকে অন্নদান করলে শিশু ভবিষ্যতে কোনোরকম অন্নের (Fooding) অভাববোধের সম্মুখীন হয় না।

এদিনেই নবজাতককে দোলনায় তোলা হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীরা শুক্লপক্ষে শিশুকে দোলনায় তোলে। এ সময় উপস্থিত নারীরা আনন্দেয় বহিঃপ্রকাশ হিসেবে একধরনের গীতগান[২৯] গায়। দোলনা তোলার সময় নীচে মামা, দিদিমা কিংবা দাদুকে শুয়ে থাকতে হয়। বিশ্বাস ; মাতুল পরিবারের এদের যেকোনো একজন দোলনার নীচে শুয়ে থাকলে শিশুর ভালো ঘুম হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে। এ সময় দোলনায় বই-খাতা-কলম, বোধিবৃক্ষ পাতা, লজ্জাবতী পাতা, নিদ্রালী পাতা, একটি পাথর, মনকাঁটা এবং একটি লৌহদণ্ড রাখা হয়। এক্ষেত্রে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস নিম্নরূপ[৩০] :

বই-খাতা-কলম : শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতীক ;

বোধিবৃক্ষের পাতা : বীর্য ও প্রজ্ঞার প্রতীক ;

লজ্জাবতী পাতা : লজ্জার প্রতীক ;

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দ্রালী পাতা : অধিক নিদ্রার প্রতীক ;

পাথর : গাম্ভীর্যের প্রতীক ;

মনকাঁটা : স্মরণ শক্তির প্রতীক ;

লৌহ দণ্ড : শক্তি ও সাহসের প্রতীক।

নামকরণ অনুষ্ঠানকে অনেকেই হাইটখোলা[৩১] নামে অভিহিত করে। চিরাচরিত লোকায়াত বিশ্বাস যাই থাকুক না কেন এগুলো বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে হিন্দুধর্মীয় আচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে। শিশুকে দোলনায় তোলার আগেই নামকরণ করা হয়। সচরাচর পিতামহ কিংবা মামা নবজাতকের নামকরণ করে তবে অনেকক্ষেত্রে শিশুর মা-বাবাও তার নামকরণ করে। এটি নিতান্তই লৌকিক একটা অনুষ্ঠান। তাই লৌকিকতার আড়ম্বরতাই এখানে সর্বাধিক দৃষ্টনীয়।

৩.৪. অন্নপ্রাশন

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুত্র সন্তান হলে চার মাস কিংবা ছয় মাস এবং কন্যাসন্তান হলে পাঁচ মাস কিংবা সাত মাসে অন্নপ্রাশন করার নিয়ম এখনো বিদ্যমান। যার অন্য নাম ভাত ছোঁয়ানি। এ উপলক্ষে চাউলের গুড়া, দুধ, কিচমিচ, নারিকেল, বাদাম ইত্যাদিযোগে একধরনের মুখরোচক পায়েস তৈরী করা হয়। এ দিন শিশুর মস্তক মুণ্ডিত করা হয়। অতঃপর তাকে মামা বাড়ি থেকে আনা নতুন কাপড় পরিধান করিয়ে নিকটস্থ বৌদ্ধবিহারে[৩২] গিয়ে বিহারাধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শিশুর মুখে একটি চামচ বা পয়সা দিয়ে তিনবার কিংবা পাঁচবার পায়েস দেওয়া হয়। পিতামহ বা পিতামহী কিংবা মাতামহ বা মাতামহী অথবা মামা কিংবা মামা সম্পর্কীয় যে কেউ এ কার্যটি সম্পন্ন করে। এ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মাতুল বাড়ি থেকে আনা নতুন থালা, গামছা এবং কাপড় তাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কিত তাদের বিশ্বাস[৩৩] ;

নতুন থালা : অন্নের প্রতীক ; যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ তার অন্নের অভাববোধ না করাকে বোঝায়।

গামছা : দীর্ঘায়ুর প্রতীক ; এ গামছার মতো তার দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়।

কাপড় : লজ্জা নিবারণের ; এর মাধ্যমে তার কাপড়ের অভাববোধ না করাকে বোঝায়।

৩.৫. দন্তোৎগম

প্রায় সকল জাতি বা সম্প্রদায়ে শিশুর দন্তোৎগম নিয়ে নানাবিধ জল্পনা ও বৈচিত্রময় সংস্কারের উপস্থিতি লক্ষণীয়। পঞ্জিকা অনুসারে[৩৪] শিশুর দন্তোৎগমের ফলাফল নিম্নরূপ ----

প্রথম মাসে শিশুর দন্তোৎগম হলে পিতার মৃত্যু হয় ;

Dhaka University Institutional Repository

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দ্বিতীয় | ,, | ,, | ,, | ,, | মাতার মৃত্যু হয় ; |
| তৃতীয় | ,, | ,, | ,, | ,, | ভ্রাতার মৃত্যু হয় ; |
| চতুর্থ | ,, | ,, | ,, | ,, | শুভ ; |
| পঞ্চম | ,, | ,, | ,, | ,, | মিষ্টান্নভোজী হয় ; |
| ষষ্ট | ,, | ,, | ,, | ,, | সুখী ও পণ্ডিত হয় ; |
| সপ্তম | ,, | ,, | ,, | ,, | বলবান হয় ; |
| অষ্টম | ,, | ,, | ,, | ,, | ধনহীন ও সুখহীন হয় ; |
| নবম | ,, | ,, | ,, | ,, | প্রতাপশালী হয় ; |
| দশম | ,, | ,, | ,, | ,, | গতায়ু হয় ; |
| একাদশ ও দ্বাদশ | ,, | ,, | ,, | ,, | সুখী ও সুশীল হয়। |

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে উল্লেখিত ফলাফল এর প্রভাব তেমন লক্ষ্য করা না গেলেও অষ্টম ও দশম মাসের শিশুর দন্তোৎগমকে তারা ভালোভাবে গ্রহণ করে না। এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; এ সময় দন্তোগম হলে শিশুর শারিরীক অবস্থা তেমন ভালো যায় না। নানারকম অসুখ-বিসুখে শিশু আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় তার শারিরীক সুস্থতা কামনায় শিশুকে কারো কাছে অল্প টাকায় বিনিময়ে সাময়িকভাবে বিক্রি করার প্রথা আছে। কিয়ৎকাল পরে তাকে আবার ঐ ব্যক্তির কাছে থেকে অনুরূপভাবে কিনে নিতে হয়। এ সময় তাকে (যার কাছে শিশুকে বিক্রি করা হয়) উৎকৃষ্ট খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়[৩৫]। এ বিষয়ে তাদের আরো বিশ্বাস ; দন্তোৎগমের পূর্বে শিশুদের আয়না দেখালে তার সহজেই দাঁত উঠে না[৩৬]। উঠে যাওয়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে ঢুকিয়ে দিলে দাঁত ইঁদুরের ন্যায় চিকন ও সুন্দর হয়[৩৭] এবং উঠে যাওয়া দাঁত ঘরের ছালের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে তাড়াতাড়ি নতুন দাঁত উঠে[৩৮]। এরূপ বিশ্বাস অন্যান ধর্মের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

### ৩.৬. হাতে খড়ি

হাতে খড়ি উপলক্ষে বৌদ্ধভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পঞ্চশীলে (Five Precept) অধিষ্ঠিত হবার পর ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করে সামর্থ্যানুযায়ী অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি দান করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে। অনেকে পাড়া প্রতিবেশী-আত্মীয়, স্বজনদেরকে সাধ্যানুযায়ী আপ্যায়ন করে। অতঃপর সন্ধায় তাকে বৌদ্ধবিহারে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে বুদ্ধও ভিক্ষু-সংঘকে বন্দনা করত বাড়িতে এসে একজন বিদ্বান ব্যক্তি মাধ্যমে তাকে হাতে খড়ি শিক্ষা দেওয়া হয়।

### ৩.৭. কর্ণছেদকরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় সকল জাতি, সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের মধ্যেও এটি একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি একটি বিশেষ সামাজিক উৎসব। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত সাত, নয় এবং এগার এ তিন বিজোড় বছরে মেয়েদের কর্ণছেদন করা হয়। এ উপলক্ষে বাড়িতে স্বজন সমাবেশ ঘটে। তাছাড়া এদিন ভিক্ষুদের পিণ্ডদান করা হয়। যাকে ঘিরে এ উৎসব তার জন্য নতুন জামা কাপড়, পাটি, বালিশ, একটি মাটির প্রদীপ, একটি মঙ্গলঘট প্রস্তুত রাখা হয়। তারপর শুরু হয় সমবেত পঞ্চশীল গ্রহণ পর্ব। এ পঞ্চশীল সমাপনান্তে তাকে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে নির্ধারিত সজ্জিত আসনে বসিয়ে রাখা। অতঃপর হস্তসিদ্ধ একজন পুরুষ কিংবা মহিলা তার কর্ণছেদন করে। এ কর্ম শেষ হলে একে একে সবাই তাকে কোলে নিয়ে জামা-কাপড় আবার অনেকে হাতে নগদ টাকা দিয়ে তার দীর্ঘজীবন কামনা করে। এ সময় একধরনের মেয়েলি গীতগান দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে। তারপর উপস্থিত সবাইকে সাধ্যানুযায়ী খাবার দ্বারা আপ্যায়ণ করা হয়।

### ৪. বৌদ্ধ সন্ন্যাসজীবন পদ্ধতি

পৃথিবীর সকল থেরবাদী বৌদ্ধ মাত্রেই সন্ন্যাসজীবনকে সাদরে গ্রহণ করে। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসজীবনে ভিক্ষুকে 'ভন্তে' বলে সম্বোধন করে। ভিক্ষুরাই বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্তম্ভ ; অতীতকালের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তাদের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল।

প্রাচীন ভারতে অসংখ্য সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় ; যারা শুধু কঠোর তপস্যা, অনাহার, শারিরীক ক্লেশদ্বারা মুক্তি সম্ভব বলে মনে করত। খৃ. পূর্ব ৬ষ্ট শতাব্দীতে ভারতে এ ধরনের বিভিন্ন সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তারা ছিল একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। কোনোরকম যোগাযোগই তাদের মধ্যে ছিল না। তাই তাঁদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল না। বুদ্ধই সর্ব প্রথম সংঘশক্তির উদ্ভাবন করেন। বৌদ্ধধর্মে যেটি 'সংঘ' নামে পরিচিত। ত্রিরত্নের তৃতীয় রত্ন এই 'সংঘ'। যেটাকে বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধ স্বয়ং নিজেই বারণসীতে 'সংঘ' এর উৎপত্তি করে। যারা সর্বপ্রথম সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে সংঘশক্তির বহিঃপ্রকাশ করলেন ; তারা বৌদ্ধধর্মে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য[৩৯] নামে পরিচিত। পুরো জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। মানবসমাজ প্রতিনিয়ত দুঃখের সাথে সংগ্রামরত। অবিদ্যাজনিত তৃষ্ণাই সেই দুঃখের মূলহেতু। বুদ্ধ প্রদর্শিত

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত আর্যমার্গই সে-ই তৃষ্ণা পরিহারের একমাত্র উপায়। এরূপ বিশ্বাস থেকেও উক্ত সংঘের উৎপত্তি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ দাশ গুপ্ত বলেন ; জগতে বৌদ্ধসংঘের এক অসাধারণ প্রভাব ঘটিয়াছিল। সংঘের শ্রামণগণ শুদ্ধচিত্ত, নৈতিক বলে বলীয়ান ও প্রজ্ঞায় দীপ্তিমান হইয়া অবিদ্যায় ও দুঃখে জর্জরিত ভ্রান্ত মানুষকে তাঁদের স্বীয় পবিত্র অমলধবল, স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া মুক্তির পথে লইয়া যাইতেন, সেই পবিত্র আলোকে জগতের নর-নারী উদ্বোধিত, জাগরিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিত[৪০]। এ ভিক্ষুসংঘ বৌদ্ধবিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রণ করে। বহুজনের মঙ্গল ও সুখের জন্য বুদ্ধের ধর্ম। এক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা সংঘজীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যও বটে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ভিক্ষুজীবন লাভ করতে পারে। কেননা বুদ্ধ নিজেই বর্ণ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন --- গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী প্রভৃতি মহানদীগুলো মহাসমুদ্রে মিলিত হয়ে পূর্বের নাম পরিত্যাগ করে "মহাসমুদ্র" এই নাম প্রাপ্ত হয়[৪১]। তেমনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণে তথাগতের সংঘে প্রবেশ করে পূর্বের নাম গোত্র হারিয়ে ফেলে। সংঘে প্রবেশের যে সবার সমান অধিকার ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রাহ্মণতনয় শারিপুত্র ; মৌদ্‌গল্যায়ন হতে ক্ষৌরকার উপালি। বুদ্ধ এখানে জন্মকে নয়, কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া সবার কর্মের মধ্যে যে সামাজিক মর্যাদা নিহিত তাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বুদ্ধকে অনুসরণ করে পৃথিবীর সকল দেশের ন্যায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে একজন সংঘপ্রধান থাকে এবং একজন উপসংঘপ্রধান থাকে। সচরাচর শীলবান প্রজ্ঞাবান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুই এ পদ বরণ করেন। সংঘপ্রধান আমৃত্যু ঐ পদে সংঘপ্রধান হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মৃত্যুর পর উপ-সংঘপ্রধানকে সংঘপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একাধিক রাজনৈতিক দলের ন্যায় বিভিন্ন বৌদ্ধদেশে একাধিক ভিক্ষুসংঘের নিকায় অস্তিত্ব বর্তমান[৪২]। বাংলাদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে দুইটি সক্রিয় নিকায় বর্তমান। যেমন সংঘরাজ নিকায় এবং মহাস্থবির নিকায়। বর্তমানে সংঘরাজ নিকায়ের প্রধানকে সংঘরাজ উপাধি দেওয়া হয় ; এই নিকায়ের প্রধানের নাম শাসনশ্রী মহাস্থবির আর মহাস্থবির এই নিকায়ের প্রধানকে সংঘনায়ক উপাধি দেওয়া হয় ; এবং এ নিকায়ের প্রধানের নাম এস. ধর্মপাল মহাথেরো। উভয় নিকায়ই থেরবাদী বৌদ্ধভাবধারায় বিশ্বাসী এবং বিনয়ভিত্তিক ভিক্ষুজীবন পদ্ধতি অনুসরণে জীবনযাপন করে।

অন্যান্য থেরাবাদী বৌদ্ধদেশের ভিক্ষুসংঘের ন্যায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পুরুষদের এ সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বিশ্বাস ; এতে বৌদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় এবং পুণ্য সঞ্চয় হয়। পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ সদস্য কমপক্ষে পাঁচদিন/সাতদিনের জন্য এ সদস্যপদ গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট দিন শেষে

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছানুযায়ী সাংসারজীবনে ফিরে যাওয়া যায় আবার শ্রামণ জীবনযাপন করাও চলে। এখানে কোনোরকম শর্তারোপ এবং বিধিনিষেধ নেই। এ জনগোষ্ঠীর আরো বিশ্বাস ; পুত্রকে বৌদ্ধশাসনে দান দেওয়া পিতা মাতার ধর্মীয় করণীয় কর্মের মধ্যে অন্যতম। তা না হলে বৌদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। আদিবাসী বৌদ্ধসমাজেও এ ভিক্ষুজীবন পদ্ধতি প্রথার প্রচলন রয়েছে।

৪.১. প্রব্রজ্যা

প্রব্রজ্যা শুধু বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নয় বরং পৃথিবীর সকল বৌদ্ধদের নিকট অতি পুত ও পবিত্র একটি আচার সমৃদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম। এটা বৌদ্ধশাসনে প্রবেশদ্বার স্বরূপ। থেরবাদী সকল বৌদ্ধদের নিকট এটা সমভাবে প্রযোজ্য। ধর্মীয়ভাব মর্যাদায় অনুষ্ঠিত এ মহতী অনুষ্ঠানের পর প্রব্রজ্যাধারীকে শ্রামণ[৪৩] বলা হয়। তারা একটি বৌদ্ধবিহারে একজন প্রবীণ বৌদ্ধভিক্ষু'র (যিনি তার ধর্মীয় গুরু) অধীনে ৭/৫ দিনা অথবা ৯/১৫ দিন অবস্থান করার প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় এবং সামাজিক নিয়ম আছে। অনেকেই দীর্ঘদিন থাকার দৃঢ় আশাবাদও ব্যক্ত করে।

পালি পব্বজা শব্দের সংস্কৃতরূপ প্রব্রজ্যা ; যা প্র+√ব্রজ+য যোগে গঠিত। 'Dictionary of Pali Language' নামক গ্রন্থে এ প্রব্রজ্যার অর্থ করা হয়েছে এভাবে ; Leaving the world, adapting the ascetic life, state of being a Buddhist frairy taking the yellow robe, ordinating the monastic life[৪৪]. এ বিষয়ে আবার 'Pali English' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ; Ordination or admission into the Buddhas order in Particular, Ascetic or homeless life in genaral[৪৫]. এ বিষয়ে পালি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ধর্মপদে উক্ত আছে, যিনি আত্মপাপমল প্রক্ষালন করেছেন তাকে প্রব্রজিত বলা হয়[৪৬]। তাছাড়া 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, প্রব্রজ্যা দ্বারা বর্তমান দুঃখ নিরুদ্ধ হয়, ভাবী দুঃখ উৎপন্ন হয় না[৪৭]। তাছাড়া 'সুত্তনিপাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, প্রব্রজ্যা মুক্ত আকাশের ন্যায়, এটার মাধ্যমে কায়িক-বাচনিক দুস্কর্ম ত্যাগ করে জীবনকে পরিশোধন করা যায়[৪৮]। উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় ; পরিবার, পরিজন ও গৃহাশ্রম ত্যাগ করে বৈরাগ্যজীবন গ্রহণের নাম প্রব্রজ্যা। এ প্রব্রজ্যা হলো জাগতিক দুঃখ থেকে অন্যতম মুক্তির সোপান। ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রব্রজ্যা স্বরূপে উত্তরাধিকারীর মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান। প্রব্রজ্যাধারীরা ভোগের আশায় উৎসাহবোধ করে না, শোক, দুঃখ, পরিতাপে বিচলিত হয় না। প্রব্রজ্যাই চিরসুখ-চিরশান্তি ও নির্বাণমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিকামীরা অনাগারিক জীবনধারণ করে।

'প্রব্রজ্যা' বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক ধর্মীয়অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। ধর্মীয় ভাবার্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বৌদ্ধশাসনে পুত্রদান উপলক্ষে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা উপলক্ষে প্রব্রজিতের বাড়ীতে ঐ দিন সকল

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী তথা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই সমবেত হয়। যিনি প্রব্রজিত হবে সেদিন তাকে নাপিত দ্বারা মস্তকমুণ্ডিত করা হয়। অতঃপর হালকা আহার্য সমাপনান্তে নতুন শ্বেত-শুভ্র কাপড় পরিধান করে প্রথমে মাতাপিতা এবং অন্যান্য উপস্থিত বয়োবৃদ্ধ তথা আত্মীয়-স্বজনদেরকে যথাযথ অভিনন্দন জানিয়ে দৃঢ়, স্থির এবং সংযমী হয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে[৪৯]। এ সময় তিনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মাথায় ধারণ করে সবার অগ্রভাগে থাকে আর তাকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে চলে অনুষ্ঠানে যোগদানকারী এবং বৌদ্ধকীর্তন বাদক দল। কীর্তন এ মহতী অনুষ্ঠানের ধর্মীয় ভাবধারাকে আরো মনোহর ও মনোময় করে তোলে। তবে ইচ্ছে করলে যে কাউকে প্রব্রজ্যা দেওয়া যায় না। এ সম্পর্কে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ বিনয়ে উল্লিখিত বিধি নিষেধ অনুসরণ করে। যেমন : ক. প্রব্রজ্যা গ্রহীতাকে অবশ্যই কাক তাড়াতে সমর্থ পঞ্চদশ বৎসরের বয়স্ক বালক হতে হবে[৫০];

খ. মাতাপিতার অনুমতি[৫১]।

বিবাহের পূর্বেই বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর পুরুষ প্রব্রজ্যা গ্রহণ। বিবাহ পরবর্তী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হলে স্ত্রীর অনুমতি দরকার। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে না।

ইতো মধ্যে সকলেই বিহারে পৌঁছে বুদ্ধকে বন্দনা করত স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করে। প্রব্রজ্যা লাভকারী মাতাপিতাকে নিয়ে সামনে উপবেশন করে। এ সময় সবার উপবেশন নিশ্চিত এবং পরিবেশ শান্ত এবং উপস্থিত সকলেই মনোযোগী হলে সবাই ত্রিশরণের মাধ্যমে পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে আটটি[৫২] ভিক্ষু-সংঘের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে বিহারাধ্যক্ষ এর নিকট উপস্থিত হয়। এগুলো ছাড়া প্রব্রজ্যা গ্রহীতার ব্যবহারোপযোগী আরো চারটি সামগ্রী দান করা বাধ্যতামূলক। যেমন ---- স্যাণ্ডেল (পাদুকা), লাঠি, ছাতা এবং বিছানা। ত্রিশরণ উচ্চারণে অক্ষম ভিক্ষু প্রব্রজ্যা প্রদানে অনুপোযুক্ত। এ বিষয়ে বুদ্ধের উক্তি নিম্নরূপ ; ত্রিশরণ গতি দ্বারা প্রব্রজ্যা প্রদান অত্যাবশ্যক[৫৩]। শুধু তাই নয় ; প্রব্রজ্যা গ্রহীতারও উচ্চরণ প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট হতে হয়। চির প্রচলিত প্রথায় এভাবেই পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রব্রজ্যা প্রদান উপলক্ষে দু'ধরনের[৫৪] আসন সুবিন্যস্ত থাকে। যথা : ক. ভিক্ষু সংঘের আসন এবং খ. দায়ক-দায়িকা বা উপাসক-উপাসিকার আসন। সবার আসন গ্রহণ নিশ্চিত হলে মুল প্রব্রজ্যানুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রথমে প্রব্রজ্যা প্রার্থী ত্রিচীবর[৫৫] হাতে নতজানু হয়ে বসে বিনয়ের সাথে নিম্নোক্তভাবে[৫৬] প্রব্রজ্যা যাচঞা করে।

ওকাস অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচামি (৩ বার) অর্থাৎ ভন্তে অবকাস করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

এটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে প্রব্রজ্যাগ্রহীতা আবার দীক্ষাদানকারীকে উপলক্ষ করে বলেন ----

Dhaka University Institutional Repository

সব্ব দুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছি করণত্থায়

ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বজেথ মং ভন্তে ,

অনুকম্পং উপাদায। (তিন বার)

অর্থাৎ ভন্তে ! সর্ব দুঃখহীন নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্যে অনুগ্রহ করে এ কাসায় বস্ত্র গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন

অতঃপর প্রব্রজ্যা গ্রহীতার মুণ্ডিত মস্তকে দীক্ষাগুরু ক্ষুর স্পর্শ করে বলেন ;

কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। তচো, দন্তা, নখা, লোমা, কেসা। কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো[৫১]।

এরূপ প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর কর্মস্থান গ্রহণ শেষ হলে তাঁকে ভিতরে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে কর্মস্থান গ্রহণের পর চীবর প্রত্যাবেক্ষণ বলতে বলতে অর্ন্তবাস পরিধান করে। উত্তরাসঙ্গ গায়ে দিয়ে এবং অপর উত্তরাসঙ্গের একাংশ স্কন্ধে স্থাপন করে। চীবর পরিধান হলে তিনি আস্তে আস্তে ধীর-স্থির গতিতে সৌম্যতার প্রতীক হিসেবে উপস্থিত সবার অগ্রভাগে এসে তাঁর জন্য রক্ষিতাসনে উপবেশন করেন। তারপর তিনি প্রব্রজ্যাশীল প্রার্থনা করেন ;

ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সদ্ধিং পব্বজ্জং সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে[৫৮]। (তিন বার)

অর্থাৎ ভন্তে ! আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা শ্রামণের দশশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। আমাকে অনুগ্রহপূর্বক দশশীল প্রদান করুন।

অতঃপর উপাধ্যায় গাম্ভীর্যপূর্ণ বচনে উচ্চারণ করেন ;

যমহং বদামি তং বদেথ অর্থাৎ আমি যা বলি তুমিও তা বলো।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী : আম ভন্তে ; হ্যাঁ ভন্তে

এ বাক্য বলার পর পর তিনি গুরুর মুখে মুখে বলেন ;

নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স (তিন বার)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি (তিন বার)

উপাধ্যায় : তিসরণং গমনং সম্পন্নং অর্থাৎ (ত্রিশরণ গ্রহণ শেষ)

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী : আম ভন্তে অর্থাৎ হ্যাঁ ভন্তে

Dhaka University Institutional Repository

তৎপর উপাধ্যায় তাঁকে প্রব্রজ্যা দশশীল প্রদান করেন। দশশীল গুলো নিম্নরূপ ;

ক. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি

খ. অদিন্নাদানা বেরমণী ,, ,,

গ. অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী ,, ,,

ঘ. মুসাবাদা বেরমণী ,, ,,

ঙ. সুরামেরেয় মজ্জপমাদট্ঠানা ,, ,,

চ. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি

ছ. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সনো বেরমণী সিক্খপদং

জ. মালাগন্ধা বিলোপন ধারণমণ্ডন বিভুস্সট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

ঝ. উচ্চ সয়না মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ;

ঞ. জাতরূপং রজতং পটিগগ্হনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

এরূপে তাঁর (প্রব্রজিতের) দশশীল গ্রহণ করা শেষ হলে উপাধ্যায় তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন ; তিসরণেনসহ পব্বজ্জা সামনের দসশীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেহি।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী : আম ভান্তে হ্যাঁ ভন্তে

শীল গ্রহণাদি সম্পন্ন হলে নব প্রব্রজিত বন্দনার মাধ্যমে উপাধ্যায়[৫৯] গ্রহণ করে থাকেন। তারপর তিনি উপাধ্যায়ের কাছ থেকে একে একে চীবরের প্রায়োগিক ব্যবহার, আহার সম্পর্কিত ধারণা, শয়নাসনের ধারণা, গিলান প্রত্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান অর্জন করে।

প্রব্রজ্যানুষ্ঠানকে অবলম্বন করে অসংখ্য ভিক্ষু-সংঘের উপস্থিতি দৃষ্টনীয়। এ সময় সমাগত ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু নতুন প্রব্রজিতের নতুন নামকরণ করে[৬০]। উল্লেখ থাকে যে, প্রব্রজিতজীবনে তাঁর পূর্বনাম হারিয়ে নতুন নামে আর্বিভূত হন। সমবেত সবার সামনে তাঁর প্রদেয় নতুন নাম ধরে ডাকলে তিনি হ্যাঁ ভান্তে বলে এ আহবানে সাড়া দেয়।

নামকরণের পর তাঁর মা-বাবা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি স্যাণ্ডেল, লাঠি, ছাতা, বিছানা ও বিছানার চাঁদর ইত্যাদি দানীয়সামগ্রী দান করত করজোড়ে অবনত চিত্তে বন্দনা জ্ঞাপন করে। এ সময় উপস্থিত পূণ্যকামী আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁর ভিক্ষাপাত্রে মোমবাতি, টাকা, পয়সা দান করে পুণ্য সঞ্চর করে। প্রব্রজ্যার গুণাগুণ সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন ;

Dhaka University Institutional Repository

গৃহাবাস সম্বাধপূর্ণ প্রব্রজ্যাজীবন মুক্ত আকাশের ন্যায় ; প্রব্রজ্যাগ্রহণে কায়িকপাপ বর্জন এবং বাচনিক দুষ্কর্ম ত্যাগ করা যায় ; এবং নিজের জীবনকে পরিশোধন করা যায়[৬১]।

বুদ্ধ এ প্রব্রজ্যাকে দুঃসাধ্য ও দুরভিরম্য (নিরানন্দময়) বলে অভিহিত করেছেন[৬২]। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন ; সম্বোধি অঙ্গে[৬৩] যাদের চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ; যারা গ্রহণে অনাসক্ত তারা বৈরাগ্যপূর্ণ পুণ্যময় প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক দূরম্য নির্বাণের সুখময় বিষয়ে চিন্তা করেন[৬৪]। প্রব্রজ্যা গ্রহণ নিয়ে এ জনগোষ্ঠীর রয়েছে বৈচিত্র্যময় বিশ্বাস। যেমন[৬৫] :

ক. দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় ;

খ. সাম্যভাব সৃষ্টি হয় ;

গ. লোভ-দ্বেষ-মোহ থেকে দূরে অবস্থান করা যায় ;

ঘ. আত্মশুদ্ধিতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় ;

ঙ. বৌদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা যায় ;

চ. নির্বাণ লাভে নিজেকে সহায়ক হয়।

প্রব্রজ্যা হলো বুদ্ধশাসনে পুত্রদান করে বৌদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া। এটি একটি সর্বমহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘামিত্রাকে বৌদ্ধশাসনে সংঘভুক্ত করে শাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বুদ্ধের সংসার ত্যাগ মানবজাতির ইতিহাসে বিরল ঘটনার একটি। বুদ্ধের পদানুসরণ করে অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ কুলপুত্র সংসারধর্ম ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়ে দুঃখমুক্তির জন্য ত্যাগের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনো সারাজীবন বিহারে কাটিয়ে নৈর্বাণিক সুখ উপলব্ধি করেছেন। যারা সাময়িকভাবে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন তারা বুদ্ধের ত্যাগের আদর্শকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে মাতা পিতার অনুমতি সাপেক্ষে অল্পদিনের জন্য প্রব্রজ্যা লাভ করে থাকেন। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রব্রজ্যার গ্রহণ অনুষ্ঠান স্বমহিমায় অত্যুজ্জ্বল। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। মা-বাবা অক্ষম হলে তাদের সন্তানকে আত্মীয়-স্বজন কিংবা পাড়া প্রতিবেশী প্রব্রজ্যাগ্রহণে সাহায্য করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; প্রব্রজ্যা গ্রহণ ছাড়া সমাজে কেউ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না।

৪.২. উপসম্পদা

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ভিক্ষুত্বপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ভিক্ষুর জন্য উপসম্পদা নামক অনুষ্ঠান পালিত হয়। সংসারধর্ম ত্যাগ শ্রামণধর্ম অতঃপর ভিক্ষুধর্মে প্রবেশের জন্য যে বিনয়সম্মত অনুষ্ঠান দরকার তার নাম উপসম্পদা। এ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের উক্ত আছে ; Taking up the bhikkhuship, higher ordination, admission, to the Previleges recognized bhikkhus[৬৬]. উপম্পদা হলে তিনি সকলপ্রকার বৌদ্ধধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করে। এই উপসম্পন্ন ভিক্ষু সর্ম্পকে আরো দেখা যায় ; Upasampada is the fullest possible admission to the Previleges of the Buddhist Priesthood[৬৭].

উপসম্পদা সুন্দরকর্ম ও কুশলকর্ম। বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন তখনই তার উপসম্পদা লাভ হয়। অন্যের প্রদত্ত উপসম্পদা বুদ্ধের ছিল না[৬৮]। উপসম্পদা বলতে গ্রহণ, অর্জন ; বিশেষার্থে ভিক্ষুপদ গ্রহণ করাকেই বোঝায়। এ উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকেই সকল প্রকার অকুশলকর্ম বর্জন এবং কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হয়। তাই সুপ্রসিদ্ধ 'ধর্মপদ' নামক গ্রন্থে দেখা যায়[৬৯] ;

সব্ব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা

সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং

অর্থাৎ সকল পাপকাজ থেকে বিরতি, কুশলধর্মের অনুষ্ঠান এবং আপন চিত্ত শুদ্ধি এই হলো বুদ্ধের অনুশাসন।

উপসম্পদা অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি ভিক্ষুসংঘ অত্যাবশ্যক। ভিক্ষুসংঘ বলতে কমপক্ষে চারজন ভিক্ষুর উপস্থিতিকে বোঝায়। যে জায়গায় উক্ত সাংঘিক অনুষ্ঠানটি হয় ; সেটি সীমাঘর নামে পরিচিত। সীমাঘর সাধারণত দুই প্রকার। যেমন : বুদ্ধসীমা এবং উদকসীমা[৭০]। 'বুদ্ধসীমা' বিহারের একটি নিদির্ষ্ট জায়গায় পাথরের ১৬টি ছোট ছোট পিলার দিয়ে তৈরী করা হয়। আর 'উদক সীমা' হল জোয়ার ভাটা আছে এমন নদী বা সমুদ্রে পাশাপাশি দুটো নৌকা বা সাম্পান বেঁধে সাময়িকভাবে তৈরী করা হয়[৭১]। যে বিহারে বুদ্ধসীমা ঘর নেই সেই বিহারের উপসম্পদা অনুষ্ঠান উদকসীমায় করা হয়[৭২]।

উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছু প্রার্থী কোনো ভিক্ষুকে উপাধ্যায়রূপে নির্বাচিত করে। একজন প্রবীণ ভিক্ষু উপসম্পদা প্রার্থীকে ভিক্ষু-সংঘের নিকট পরিচয় করে দেন। অতঃপর উপাধ্যায় তাঁর যোগ্যতা যাচাই করার নির্মিত্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন[৭৩] ;

এই তোমার অষ্ট পরিষ্কার ? হা প্রভু।

তোমার কি কোনো ব্যাধি আছে ? (যেমন কুষ্ট, গণ্ড, শ্বেতকুষ্ট, যক্ষা ইত্যাদি) না প্রভু।

তুমি কি মানব ? হ্যাঁ প্রভু।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কি পুরুষ ? হ্যাঁ প্রভু।

তুমি কি স্বাধীন ? হ্যাঁ প্রভু।

তুমি কি অঋণী ? হ্যাঁ প্রভু।

তুমি কি রাজভৃত্য ? না প্রভু।

তুমি কি মাতৃহন্ত? না প্রভু।

তুমি কি নংপুংসক ? না প্রভু।

মাতা পিতার অনুমতি আছে কি ? হ্যাঁ প্রভু।

তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হয়েছে কি ? হ্যাঁ প্রভু।

উপাধ্যায় প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে তাঁকে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেন ; তিনি উপসম্পদা লাভেচ্ছু হয়েছে। অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি ভিক্ষুসংঘ সমীপে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে সকল ভিক্ষুকে পাদবন্দনা করে, পদাগ্রে ভর দিয়ে উপবেশন করে হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উপসম্পদা যাচ্ঞা করেন এভাবে[৭৪] ;

আমি মাননীয় ভিক্ষু-সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন। (তিন বার)

তদন্তর পূর্বোক্ত প্রণালীতে সকলের সামনেই প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে তাকে উপসম্পদা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে নতুন ভিক্ষু তাঁর উপাধ্যায় নির্বাচন করে। এ নতুন ভিক্ষুর শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য কমপক্ষে দশবৎসর কিংবা ততোধিক ভিক্ষু জীবনযাপন করা আবশ্যক। শ্রামণের ন্যায় ভিক্ষুর একটি নতুন নাম ঠিক করা হয়। তবে শ্রামণ এবং ভিক্ষুর নামের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উপসম্পদা গ্রহণের সময় শ্রামণজীবনযাপন করা অপরিহার্য। এ শ্রামণজীবনযাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনয়বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর উপসম্পদা গ্রহণের দিন থেকে ভিক্ষুকর্ম গণনা বা লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর নতুন ভিক্ষুকে চারটি অবলম্বন এবং চারটি অকরণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। চারটি অবলম্বন[৭৫]। যেমন ----

ক. ভিক্ষালব্ধ অন্নই আপনার জীবিকা ;

খ. আসক্তিহীন গেরুয়া কাপড় আপনার পরিধেয় ;

Dhaka University Institutional Repository

গ. বৃক্ষমূলই আপনার একমাত্র বাসস্থান ;

ঘ. গো মূত্রই আপনার ঔষধ।

আবার চারটি অকরণীয় বিষয় নিম্নরূপ[৭৬] ----

ক. মৈথুন সেবন চিরতরে নিষিদ্ধ ;

খ. অদত্তবস্তু পরিহার ;

গ. জীবহত্যা নিষিদ্ধ ;

ঝ. স্বীয় অলৌকিক ঋদ্ধি প্রচার নিষিদ্ধ।

আজীবন ভিক্ষুব্রত পালনের জন্যই উপসম্পদা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংঘের কোনোরূপ আপত্তি না থাকলে তিনি সাদরে গৃহীত হতেন। তাঁর প্রাতিমোক্ষ অবশ্যপালনীয় ; তবে বোবা, বধির, অন্ধ, নামকরা ডাকাত ইত্যাদি উপসম্পদা লাভে অনুপোযুক্ত। যে কোনো ভিক্ষু যে কোনো সময় বিহারের যাবতীয় আসবাবপত্র, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুর নিকট হস্তান্তর করে গাহর্স্থজীবনে ফিরে যেতে পারে। তাঁর ভিক্ষুত্বপদ বাতিলের অধিকার যেমন আছে তেমনি আছে আবার বহিঃস্কারাদেশেরও নিয়ম। একজন উপসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুন, চুরি, হত্যা এবং অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য সাংঘিকবিধানে সর্বসম্মতিভাবে বহিঃস্কার হয়। বহিঃস্কার স্বল্প হবে নাকি দীর্ঘ হবে তা নির্ভর করবে সম্পাদিত অপরাধের উপর।

### ৪.৩. শ্রামণ-ভিক্ষুদের আহার প্রণালী

ভিক্ষালব্ধ অন্নই শ্রামণ ও ভিক্ষুজীবনের একমাত্র আহার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন বৌদ্ধরাষ্ট্রে ভিক্ষুরা সারিবদ্ধভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। বাংলাদেশে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধভাবধারায় উৎসাহিত হয়ে রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর নামক গ্রামে ভিক্ষুপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভিক্ষা করে অন্ন সংগ্রহ করে। তবে এটা উল্লেখ থাকে যে, বুদ্ধের সন্ন্যাসজীবনকে মানসপটে চিরদিন জাগরুক করার নিমিত্তে প্রব্রজ্যালাভী শ্রামণ-ভিক্ষুদের প্রব্রজ্যাব্রত ত্যাগের আগের দিন ভিক্ষা দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করে আহার করার নিয়ম আছে।

পারিপার্শ্বিক তথা ঋতুগত কারণে সব জায়গায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে ভিক্ষু জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী একটি নতুন পদ্ধতির প্রচলন করে। এই নিয়ম অনুযায়ী গ্রামে বড়ুয়া বৌদ্ধ পল্লীর প্রত্যেক পরিবারের দায়কের উপস্থিতিতে একটি তালিকা তৈরী করা হয়। উক্ত তালিকা মোতাবেক কোনো পরিবার কোনো দিন ভিক্ষুকে আহার দান করবে তা উল্লেখ থাকে। আদিবাসী বৌদ্ধসমাজেও এ প্রথার প্রচলন বিদ্যমান। তবে এটা স্বীকার্য যে, আর্থিক সামর্থহীন পরিবারকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সচরাচর মানুষের ন্যায় ভিক্ষুরা ইচ্ছে অনুযায়ী অন্নগ্রহণ করে না। বিনয় বিধানুসারে ভিক্ষুরা বেলা বারোটার পূর্বে পিণ্ড গ্রহণ করে। মধ্যাহ্নের পর আহার গ্রহণ অনুউচিত। তবে রোগাগ্রস্থ ভিক্ষুর জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। অপরাহ্নে শুধু তরল, লেহ্য এবং চুষ্য জাতীয় খাবার খাওয়া যেতে পারে। ভিক্ষুদের খাবারের মধ্যে কোনোরকম বিধিনিষেধ নেই। ত্রিদোষ বর্জিত[৭৭] হলে যে কোনো দ্রব্য যা মানুষের উপযোগী তা খাওয়া যায়। এখানে ভিক্ষুদের খাদ্যগ্রহণে স্বাধীনতা দেখা যায়। তবে আহার গ্রহণে ভিক্ষু কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। যেমন --

ক. আহারে সংযমী হওয়া ;

খ. মৌনব্রত অবলম্বন করা ;

গ. ধ্যানযোগে আহার গ্রহণ করা।

উপরি উল্লিখিত নিয়মগুলো উন্নতরুচির পরিচায়ক। তাছাড়া শারিরীক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি আত্মসংযম করণে, প্রজ্ঞার উন্মেষ সাধনে বৌদ্ধ শ্রামণ ও ভিক্ষুদের আহার প্রণালী যুগান্তসৃষ্টিকারী এক ঐতিহাসিক উদ্ভাবন।

৫. সাধুমা

যে সমস্ত মহিলা মস্তকমুণ্ডিত হয়ে পীতবস্ত্র বা সাদাবস্ত্র পরিধান করে বৌদ্ধ বিহারের সেবা কার্যে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকে সাধুমা বলা হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ রকম সাধুমা তেমন চোখে পড়ে না। তবে, পাড়ার এবং বিহারের দায়ক-দায়িকারাই বিহারের সেবাকার্য সম্পাদন করে।

পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম

সকলদেশে সভ্যসমাজে মৃতব্যক্তিকে ঘিরে রয়েছে নানারকম ক্রিয়া-কর্ম ; যাকে পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম বলা হয়। যা এ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রথাগত অনুসারে দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় আচরিত হয়ে আসছে। এ জনগোষ্ঠীর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিকরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে ; এমনটি আশা করা যায়।

৬. মৃত্যুজনিত আচার-অনুষ্ঠান

বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মৃত্যুর দিন অথবা পরবর্তী দিবসে মৃতব্যক্তিকে দাহ করে। এ সম্পর্কিত কোনোরকম আইন নেই, নেই কোনোরকম আপত্তি। মৃত্যুর পর পরই ঐ ব্যক্তির শিয়রে প্রদীপ এবং সুগন্ধি জ্বালিয়ে দেয়। মৃতদেহ চাঁদর দিয়ে ঢেকে দেয়। এ সময় একক বা সমস্বরে বুদ্ধবাণী পাঠ করা হয়। এ বুদ্ধবাণী পাঠ সর্ম্পকে তাদের বিশ্বাস ; প্রথমত : এ সময় বুদ্ধবাণী পাঠ করলে কোনো অপদেবতা ঐ বাড়িতে আশ্রয় নেয় না। দ্বিতীয়ত :

Dhaka University Institutional Repository

সমাগত সকল দেবতারা বুদ্ধবাণী শ্রবণ করে আত্মপ্রীতিসুখ উপলব্ধি করে। এ সময় মৃত্যুর খবর শুনে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই একত্রিত হয় এ মৃত বাড়িতে। মৃত্যুর পরপরই সকল আত্মীয়-স্বজনকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করে। সকলধর্মে এ সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একই রকম। সচরাচর এ জনগোষ্ঠীর শব সৎকার অনুষ্ঠান অপরাহ্নে সম্পন্ন করে। তার অন্যতম কারণ হিসেবে এক পর্যালোচনায় দেখা যায় ; দূর দূরান্ত থেকে আগত আত্মীয়-স্বজনের জন্যই মূলত এই অনুষ্ঠান অপরাহ্নে করা হয়। শোকসন্তপ্ত এ পরিবারে এদিন উনানে কোনো পাতিল সচরাচর চড়ে না।

### ৬.১. শবদেহ ধৌত করা[৭৮]

মরদেহ ধৌত করা বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রথম এবং প্রধান কাজ। গর্ভবতী মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তার গর্ভস্থ সন্তান শল্যকর্ম দ্বারা খালাস করার পর তাকে ধৌত করে। মৃতদেহ ধৌত করার সময় কাপড় দিয়ে পর্দা টাঙানো হয়। এক হাত অন্তর অন্তর তিন টুকরো কলা গাছ রেখে তার উপর বাঁশের বেড়া দেয়। অতঃপর তার উপর শবদেহ রাখা হয়। পুরুষরা পুরুষকে এবং মেয়ে মৃতদেহকে মেয়েরা ধৌত করে। এ প্রক্রিয়ায় শবদেহ ধৌত করার নিয়ম বৌদ্ধধর্মের কোথাও উল্লেখ নেই। এটা হিন্দু এবং মুসলিম আচার দ্বারা অনুসমর্থিত।

### ৬.২. লোকাচার

বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মৃত্যুবিষয়ক আচার-অনুষ্ঠানও লোকাচারে সমৃদ্ধ। মৃতব্যক্তিকে স্নান করানোর পর দর্শন করার নিমিত্তে উঠানের মধ্যে একটি খাটে নতুন পাটি, বালিশ, চাঁদর দিয়ে সজ্জিত বিছানায় রাখা হয়[৭৯]। এ সময় দৌহিতরা মৃত ঠাকুর দাদু-ঠাকুর দিদি কিংবা দিদিমা-দাদুর মাথার উপর ছাতা খুলে দিয়ে ছায়া দান করে[৮০]। মৃতব্যক্তিকে মাথায় তৈল দেয় এবং অবশিষ্ট তৈল উপস্থিত আবালবৃদ্ধবণিতা সবার মাথায় দেয়। এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ; এ তৈল মাথায় দিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। তাই এটাকে আয়ু বিতরণও বলা হয়। তাছাড়া একবিগত লম্বা কলার ডগায় নারিকেল গাছের পাতার শলা দ্বারা চিরুনী তৈরী করে তা দিয়ে মৃতব্যক্তির মাথার চুল আঁচরিয়ে দেয়। মৃতদেহের উপর সদ্য ভাজা খই[৮১] ছিটিয়ে দেয় এবং কিছু খই খাট-এর নীচে রক্ষিত রাখে। শবদর্শনার্থীরা সবাই ঐ খই মৃতব্যক্তির শরীরের উপর ছিটিয়ে দিয়ে শেষ বারের মতো পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তাছাড়া তার শিয়রে মোমবাতি এবং সুগন্ধিদ্রব্য জ্বেলে দেয়। ধর্মপূজা হিসেবে পাঁচপোয়া চাউল এবং পান-সুপারি পাশে একটি পাত্রের মধ্যে রাখে। যা পরবর্তীকালে ভিক্ষুদেরকে দান করে। যুবতী মেয়ে এবং যুবতী স্ত্রী মারা গেলে তাকে কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অতঃপর অখণ্ড লাল পাড় এর শাড়ী পরিধান করিয়ে থাকে। মৃত স্বামীর ধৌতকর্ম পরিসমাপ্তির পর স্ত্রীকে স্নান করিয়ে অন্যান্য বিধবা রমনীরা মৃত স্বামীর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সিঁথির সিঁদুর মুছে নেয়। এ সময় তার হাতের শঙ্খ এবং অন্যান্য চুড়ি খুলে তাকে সাদা পাড়যুক্ত সাদা শাড়ী পরানো হয়। এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; এগুলো সবই বিধবার লক্ষণ। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর বহুবিধ লোকাচারিক কর্ম সম্পাদন করা হয়। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর তেমন কোনো লোককর্ম দেখা যায় না। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের এ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাও কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ধারণা করা হয় এগুলো অতীতে কোনো কাল থেকে শুরু হয়ে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এখনো তা এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

৬.৩. অনিত্য সভা

দুপুর হতে না হতেই এ বাড়িতে অনিত্যমূলক বৌদ্ধধর্মীয় কীর্তন পরিবেশিত হয়। তারপর আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী এবং পাড়া প্রতিবেশীর আগমন নিশ্চিত হলে এ অনিত্য সভা শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সর্বজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে সভার সভাপতিত্ব করে। তিনিই সভার কাজ পরিচালনা করে। মৃতব্যক্তির সন্তান প্রথম সারিতে বসে। প্রথমেই উপস্থিত সকলে ত্রিশরণ এবং পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সমবেত সকল ভিক্ষু পবিত্র ত্রিপিটক থেকে সমস্বরে অনিত্য সম্পর্কীয় গাথা উচ্চারণ করেন। গাথাটি নিম্নরূপ[৮২] :

অনিচ্চা বত সঙ্খারা উপ্পাদবযধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখোতি।

অর্থাৎ সংস্কার মাত্রই অনিত্য, যা উৎপন্ন হয় তা ব্যয়শীল। সেই সংস্কার সমূহের উপশম, অসংস্কৃত নির্বাণই পরমসুখ।

তারপর ভিক্ষু এবং সমাজের সুধীজন তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। এখানে সকলেই স্ব-স্ব আলোচনায় বুদ্ধের অনিত্য এবং অনাত্মা তত্ত্বকে তুলে ধরে। অংশগ্রহণকারী সকলেই তা অতি মনোযোগসহকারে শ্রবণ করে। এ সম্পর্কে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; এ ধরনের অনিত্যমূলক তত্ত্ব শ্রবণে জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি করা যায়, যা নির্বাণ লাভে সহায়ক হয়[৮৩]।

৭. শ্মশানকেন্দ্রিক ক্রিয়া-কর্ম

আমগাছ দিয়েই বড়ুয়া জনগোষ্ঠী শবদেহ দাহ করে। দু'কারণে আমগাছ এ দাহ ক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। যেমন : প্রথমত : কাঁচা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং দ্বিতীয়ত : আমগাছের প্রজ্জ্বলিত আগুনে শবদেহ তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। মৃতদেহকে স্থানীয় যুবকরা কাঁধে করে শ্মশানাভিমুখী হলে আগে আগে খই ছিটিয়ে দিয়ে রাস্তাকে পবিত্র করে তোলে। মৃতদেহকে শ্মশানে তুলে দেবার পূর্বে বড় সন্তান[৮৪] শেষবারের মতো মুখে ভাত দেয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

আগুনের দীপ্তিময় মশাল দ্বারা পাঁচবার শ্মশান প্রদক্ষিণ করে শ্মশানে মুখাগ্নি করে। তবে প্রতিবারই হাঁটু ভাঙ্গিয়ে পায়ের দিকে গিয়ে প্রণাম করতে হয়। এ শবদেহকে নিয়ে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে নানারকম লোকবিশ্বাস। যেমন[৮৫] --

উল্টা হাতে স্নানের পানি তোলা ;

উল্টা হাতে চূলায় পানি বসিয়ে দেওয়া ;

উল্টা হাতে আমগাছে কুড়াল ধরা ;

উল্টা হাতে শ্মশানে মৃতদেহের মুখে ভাত তুলে দেওয়া ;

উল্টা হাতে শ্মশানে পানি দিয়ে তার মুখ পরিস্কার করা ;

উল্টা হাতে মুখাগ্নি করা ;

উল্টাভাবে সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে দেওয়া।

মৃতব্যক্তির সকল কাজই উল্টা হওয়া প্রসঙ্গে রাঙ্গুনীয়া থানার অর্ন্তগত পাইট্টালিরকুল নাম্নী গ্রামের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সাথে এক আলোচনায় জানা যায় ; পরিবারের অন্যকারো যেন তার মতো তাড়াতাড়ি মৃত্যু না হয়, তাই সকল ক্রিয়া-কর্ম উল্টাভাবে করে। এগুলোর কোনো প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তি নেই। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর এ সমস্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। যারা শব সৎকারে ব্যাপৃত থাকে তারা নিজেদের অপবিত্র বিবেচনা করে। শ্মশানে কর্ম সমাপনান্তেবাড়ি প্রবেশের পূর্বে স্নান করে।

## ৮. শ্মশান পরবর্তী পারিবারিক লোকাচার

শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পরপরই অমঙ্গলের আশাঙ্খায় মৃতব্যক্তিকে রাখা খাট পুকুরে উল্টা করে ফেলে দেওয়া হয়। অনেকেই পুকুরে না ফেলে খালি জায়গায় উল্টা করে রাখে। তাকে (মৃতদেহকে) ধৌত করার জায়গাটি কেউ যেন পদদলিত করতে না পারে সে জন্য স্নানের জায়গাটি ঘিরে রাখে। এদিন সন্ধ্যায় স্নানের জায়গাটিতে চালের গুড়া দিয়ে আলতো করে ঢেকে দেয়। তাদের বিশ্বাস ; তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করবে তার পায়ের চিহ্ন এ চালের গুড়ার উপর দেখা যায়। শ্রাদ্ধ না হওয়া পযর্ন্ত এখানে সকালে ফুল ও পানি এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তার প্রতি পরিবারে সদস্যরা সম্মান ও শ্রদ্ধা জানায়।

### ৮.১. শবসৎকার পরবর্তী দিবসের আচার-অনুষ্ঠান

শবসৎকার পরবর্তী দিবসে স্নানের আগে পরিবারের সন্তান রক্তের সম্পর্কীয়রা দুধ, ভাত, পানি এবং একটি দা (লৌহদণ্ড) নিয়ে শ্মশানে গিয়ে ভস্মগুলো জড়ো করে দেয়। অনেক জায়গায় আবার সমাজের সবাই এ কাজটি

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্পন্ন করে। এদিন মৃতদেহ বহনকারী এবং দাহকারীদেরকে নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা করে। এটাকে পোড়াইল্য ভাত বা পুড়িয়ে ভাত খাবার অনুষ্ঠান বলা হয়। শ্রাদ্ধ না হওয়া পযর্ন্ত এ গৃহে নিরামিষ রান্না হয়। কেউ উচুঁ পিড়া এবং চেয়ারে বসে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভিক্ষুর মাধ্যমে বুদ্ধবাণী পাঠ করা হয়। বুদ্ধবাণী পাঠ সম্পর্কে এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; বুদ্ধবাণী পাঠ করার মাধ্যমে তাকে মৈত্রী দান করা হয়। যার প্রভাবে তিনি জন্মান্তরে উচুঁ বংশে জন্মলাভ হয় এবং নৈর্বাণিক সুখ লাভ করে।

৯. শ্রাদ্ধ

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দানই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান[৮৬]। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে এ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে। কুমিল্লা এবং নোয়াখালী অঞ্চলের বৌদ্ধরা মৃত্যু দিবসের তিন দিনের দিন মেয়ে পক্ষ (বিবাহিত হলে) এবং এগার দিনের মধ্যে ছেলেরা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। এ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তাকে সংঘদান বলা হয়। এ দিন শ্মশান ভরট করত সন্তানরা মাথা ন্যাড়া করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এ সংঘদানের মাধ্যমে তার নির্বাণ ও সদগতি কামনা করে। বুদ্ধ কর্তৃক এ সংঘদান প্রশংসিত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি (বুদ্ধ) বলেন ; এ দান দ্বারা জাতিধর্ম প্রদর্শন করা হলো ; প্রেতদের পূজা করা হলো ; ভিক্ষু সংঘের শক্তি বর্ধন করা হলো[৮৭]। মাতা পিতা পাঁচটি সংকল্প [৮৮] নিয়ে সংসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী মৃত মাতাপিতার বা জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে যে পুণ্যাদি দানাদি এবং সংঘদান সম্পন্ন করে তা উপরোক্ত পঞ্চম ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে এ সংঘদানে। বুদ্ধ এ বিষয়ে আরো বলেন ; মাতাপিতা এবং জ্ঞাতিবর্গ জীবিত থাকতে আমাকে কতো দিয়েছিলো, আমার জীবন্নোতিতে সাহায্য করেছিলো, তারাই আমার প্রকৃত জ্ঞাতি মিত্র এবং মহোপকারী[৮৯]।

মৃতব্যক্তিকে (পরম আত্মীয়কে) অন্তরে চির জাগরুক করে রাখার জন্যই মূলত এ দানানুষ্ঠানের আয়োজন। তাছাড়া এ উদ্দেশ্যে মৃতের পরিবার পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। প্রতিবারই সাধ্য এবং সামর্থানুসারে পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভোজনের ব্যবস্থা করে।

৯.১. মোচা ভাত

এটি লৌকিক ক্রিয়া। শ্রাদ্ধের দিন মৃত ব্যক্তির উঠানের এক প্রান্তে অথবা সামনের রাস্তার এক প্রান্তে বাঁশের চারটি খুঁটির উপর ৪/৫ ফুট উচুতে একটি মাচাং তৈরী করা হয়। সচরাচর ভিক্ষুসংঘের পিণ্ডদান গ্রহণের পরপর বড় থালায় সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় সুন্দর করে সজ্জিত করে মৃতের উদ্দেশে দেয়[৯০]। মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে মোচার মধ্যে খাবার দেওয়া হয় বলেই একে মোচা ভাত বলে। ধারণা করা হয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বী পৈচা ভাতের অনুসরণে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মোচা ভাতের প্রর্বতন করে। মোচা ভাতে উৎসর্গটি নিম্নরূপ[৯১] ;

Dhaka University Institutional Repository

গন্ধং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ পানীযং ভোজনম্পি চ

পটিগণ্হন্তু সন্তট্ঠা ঞাতি পেতা ইদং বলি

ইদম্পে ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঞাতযো।

অর্থাৎ সুগন্ধিদ্রব্য, ধূপ, দীপ ও পানীয় দ্বারা সুসজ্জিত এ ভোজন পূজা জ্ঞাতিরা সন্তুষ্ঠচিত্তে গ্রহণ করুন। আমার এ দান দ্বারা পরলোকগত জ্ঞাতিরা সুখী হোক।

বৌদ্ধধর্মের কোথাও এ মোচা ভাতের বিধিবিধান সম্পর্কে জানা যায় না। এ বিষয়ে প্রবীন কেউ বিশদ কিছু বলতে পারে না। উপরিউক্ত যে গাথাটি দ্বারা মোচা ভাত উৎসর্গ করা হয় তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বললেও চলে। ধারণা করা হয় ; জন্মাবধি থেকে অপরিমেয় স্নেহ-ভালবাসা-মমতা প্রদর্শনকারী মাতাপিতা তথা জ্ঞাতিবর্গকে 'স্মরণ' করার উৎসর্গ গাথাটি রচনা করা হয় বিংশ শতাব্দীতে। এখানে হিন্দুধর্মীয় প্রভাবে এ মোচা ভাতের প্রর্বতন করে।

### ৯.২. বাতি প্রজ্বলন

চেরাগ অর্থাৎ সলিতা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বাতি। মৃতদেহকে যেখানে স্নান করা হয় সেখানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিন পযর্ন্ত বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বাতি প্রজ্জ্বলন করে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পরদিন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করত এ বাতি প্রজ্জ্বলন থেকে বিরত থাকে। এটি এ জনগোষ্ঠীর অন্যতম লোকাচারিক কর্ম। কালের যতই বিবর্তন হোক না কেহ কেউ এগুলো অবজ্ঞা করে না, অশ্রদ্ধায় অসম্মান করে না।

## ১০. বৌদ্ধভিক্ষু ও শিশুর শবদাহ

### ১০.১. বৌদ্ধভিক্ষুর শবদাহ অনুষ্ঠান

সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ভিক্ষু কুলগৌরব, শীলবান এবং প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর সৎকার কার্যের সাথে একটি বৌদ্ধ ঐতিহ্য একই সূত্রে গ্রোথিত। তাই সহজেই এ জনগোষ্ঠীরা প্রথিতবশা ভিক্ষুর মরদেহ দাহক্রিয়া করে না। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে উল্লেখ আছে ; রাজচক্রবর্তীর দেহ সৎকার যেভাবে করে ; বুদ্ধের সৎকারও একই প্রক্রিয়ায় করা হবে[৯২]। প্রয়াত ভিক্ষুর মরদেহে মৃত্যুর পর পরই রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা রেখে দেয়। পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে পেটিকাবদ্ধ করা হয়। এদিন একটি সংঘদান করে ; এ সময় তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে, স্মৃতিচারণ করে এবং অথিতিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে আহবায়ক কমিটির আহবানে সভায় শবদাহ অনুষ্ঠানের দিন তারিখ নির্ধারণ করে। অতঃপর একদিন কিংবা দু'দিন ব্যাপী দেশী ও বিদেশী সম্মানিত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শবদাহ ক্রিয়া অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। সুগন্ধি জাতীয় কাঠ এবং আমগাছ দ্বারা তাঁর শ্মশান সুসজ্জিত করে। তারপর রথের মাধ্যমে তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহক্রিয়া শেষ করে।

এদিন প্রয়াত ভিক্ষুর জীবনকর্ম নিয়ে প্রকাশ করে একটি বিশেষ ম্যাগাজিন। যেখানে বিভিন্ন বৌদ্ধরাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্র'র রাষ্ট্রদূতরা এ সময় শোকবার্তার জ্ঞাপনের মাধ্যমে সমবেদনা জানায়। এ দিন এলাকার প্রতিটি গৃহে স্বজন সমাবেশ ঘটে। তাই এটাকে জ্ঞাতি সম্মেলনও বলা হয়।

### ১০.২. শিশুর শবদাহ

শিশুর মৃত্যুকে প্রাধান্য বা বিবেচনা করা হয় না। এদের আনুষ্ঠানিকতা সংক্ষিপ্ত হয়। এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; শিশুরা নিষ্পাপ। এই লোকভূমিতে তারা পাপ কাজ করার পূর্বেই যেহেতু অকাল মৃত্যু হয়েছে, তাই তাদের সকল আনুষ্ঠানিকতা সংক্ষিপ্ত হয়।

### ১০. জ্ঞাতিপূজা ও পুণ্যদান

জ্ঞাতিপূজা ও পুণ্যদান উভয়েই একই সূত্রে গ্রোথিত। প্রায় সকল ধর্মের মধ্যে এটা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যেও[৯৩] এ পূজার প্রায়োগিক ব্যবহার দেখা যায়। এ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ; অনেকে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। তারা পুণ্যলাভের আশায় নিকটে অবস্থান করে। বিশেষত মাতাপিতা এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকে উপলক্ষে করে, তাদের অতীতের অবদানের কথা স্মরণ করে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এ পূজার আয়োজন করে। সচরাচর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ তাদের সুগতি লাভের নিমিত্তে জ্ঞাতিপূজা করে। এদিন ভিক্ষু-সংঘকে নিমন্ত্রণ করে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করে এবং সাধ্যমত দক্ষিণা প্রদান করে। আপ্যায়ন শেষে গৃহস্থরা একটি ধর্মপূজা প্রতিস্থাপন করত পাশে একটি থালা/গামলা এবং জগ/গ্লাস নিয়ে ভিক্ষুসংঘের সামনে হাটু ভেঙ্গে বসে। ত্রিশরণসহ পক্ষশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরলোকগত জ্ঞাতিদের সুগতিলাভের উদ্দেশ্যে পূণ্যদান উৎসর্গ করে। গাথাটি নিম্নরূপ[৯৪] ;

ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্ত ঞাতয়ো (তিনবার)

অর্থাৎ এ দানের দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য আমাদের জ্ঞাতিদের হোক। এতে আমার জ্ঞাতিরা সুখী হোক।

উন্নমে উদকং বুট্ঠিং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এব্বমেন ঞতো দিন্নং পেতাং উপকপ্পতি।

অর্থাৎ পানি যেমন উচ্চস্থান হতে গড়িয়ে নীচের দিকে যায়, সেরূপ এই মনুষ্যলোক হতে জ্ঞাতিদের প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতদের উপকার করে।

*Dhaka University Institutional Repository*

যথা বারিবহা পূরাপরিপুরেন্তি সাগরং

এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

অর্থাৎ বারিবহা নদীগুলো যেমন ক্রমে সাগর পরিপূর্ণ করে, তেমনিভাবে এখান হতে জ্ঞাতির প্রদত্ত দানময় পুণ্যও পরলোকগত প্রেতদের উপকার করে।

ঞত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,

সব্বে দেবা অনুমোদন্ত সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

অর্থাৎ এ যাবৎ আমরা যে পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করলাম তা সমস্ত সম্পত্তি সিদ্ধির জন্য দেবতারা অনুমোদন করুন।

ঞত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,

সব্বে ভূতা অনুমোদন্ত সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিযা।

এ যাবত আমরা যে পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করলাম তা সমস্ত সম্পত্তি সিদ্ধির জন্য সকলভূত অনুমোদন করুন।

আকাস্টঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,

পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্ত সাসনং।

অর্থাৎ আকাশবাসী ভূমিবাসী মহাঋদ্ধি সম্পন্ন দেবতা ও নাগরা এই পুণ্যসম্পদ অনুমোদন করে চিরকাল বুদ্ধের শাসন রক্ষা করুন।

আকাস্টঠা চ ভুম্মটঠা দেব নাগা মহিদ্ধিকা,

পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু দেসনং।

অর্থাৎ আকাশবাসী, ভূমিবাসী, মহাঋদ্ধি সম্পন্ন যেকল দেব ও নাগ এই পুণ্য সম্পদ অনুমোদন করে চিরকাল বুদ্ধের ধর্ম দেশনা রক্ষা করুন।

আকাস্টঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগ মহিদ্ধিকা,

পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং চিরং রক্খন্তু মং পরং

অর্থাৎ আকাশবাসী ভূমিবাসী মহাঋদ্ধি সম্পন্ন সকল দেব ও নাগ এই পুণ্য সম্পদ অনুমোদন করে চিরকাল আমাকে এবং পরকে (সর্ববিধ প্রাণিকে) সমস্ত রকম উপদ্রব হতে রক্ষা করুন।

ইমিনা পুঞ্ঞ কম্মেন মা মে বালা সমাগমো,

সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বাণপত্তিযা ;

অর্থাৎ এই পুণ্যকর্মের দ্বারা আমি যতদিন না পযর্ন্ত নির্বাণ লাভ না করি ততদিন পযর্ন্ত মূখ লোকের সাথে আমার বসবাস না হোক এবং সৎলোকের সাথে বসবাস করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

ইমিনা বন্দনা মানেন পূজা পটিপত্যানুভাবেন,

আসব্কখায় বহং হোতু, সব্ব দুক্খা বিনাস্সন্তু।

অর্থাৎ এই বন্দনা মান্যতা ও পূজা প্রতিপত্তির অনুভাবে আমার সকল আসর ক্ষয় হোক। সর্ববিধ দুঃখ বিনষ্ট হোক। এ জ্ঞাতিপূজা সম্পর্কে এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস নিম্নরূপ[৯৫] ;

ক. এ পূজা দ্বারা বুদ্ধকেও স্মরণ করা হয় ;

খ. সুখ-ধন-যশ বৃদ্ধি হয় ;

গ. পারিবারিক কল্যাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;

ঘ. সোহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি ঘটে ;

ঙ. নির্বাণ কামনা করে ;

চ. পরলোকগত জ্ঞাতিদের স্মরণ করে।

১২.

বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বায় বিশ্বাসী হয়ে অতীতের সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশে বসবাস করে আসছে। তারা বাঙালি আচার-আচরণ তথা চিরশ্বাশত বাঙালিপনা ও বাঙালি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। বাঙালিত্ব এ জনগোষ্ঠীর নাড়ীর শেখর। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এদেশে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানগর্ভে তারা উন্নত। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অনেক আচার-আচরণ কালে এজনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সামাজিক আচার-আচারণকে প্রভাবিত করলেও বুদ্ধের মূল শিক্ষা থেকে তারা বিচ্যুত হয়নি কখনো।

## প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তথ্যনির্দেশ

১. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

২. সাক্ষাৎকার : প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, বয়স : ৬১, গ্রাম : ঘাটাচক, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, পূর্বোক্ত

৩. সাক্ষাৎকার : সোনাই বালা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৪. এটা একধরনের লালচে কাপড়। যা ভূমির আইলের মতো খণ্ড খণ্ড করে জোড়া লাগিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু একই রকম একই প্রক্রিয়ায় এ চীবর পরিধান করে।

৫. সাক্ষাৎকার : দুলাল বড়ুয়া, বয়স : ৫৭, গ্রাম : পশ্চিম আধার মানিক, ডাক : অলিমিয়ার হাট, থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম, ০২.১০.২০০৬। সাক্ষাৎকার : নিরোধ বড়ুয়া, বয়স : ৬৬, গ্রাম : আমুচিয়া, ডাক : কানু গোপাড়া, থানা : বোয়ালখালী, জেলা : চট্টগ্রাম, ১৮.১২.২০০৬

৬. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৪১৩

Dhaka University Institutional Repository

৭. ড. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন পাঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ১৬-১৭

৮. সামীয়ুল ইসলাম, *বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধূলা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ১৩

৯. আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫

১০. ড. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন পাঠন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

১১. শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মুখোপধ্যায় অনূদিত, *ফা-হিয়েনের দেখা ভারত* (কলিকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ১৯৮৬), পৃ. ১৮-২১

১২. আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১৩. চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৪), পৃ. ১৫০

১৪. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজজীবন* (চট্টগ্রাম : ২০০৬), পৃ. ৬২ *বাংলাদেশের মেলা, বাংলাদেশ বিপনন সংস্থা* (ঢাকা : ১৩৯০), পৃ. ৩৮। শিমুল বড়ুয়া, বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য : বৌদ্ধমেলা, *অনোমা*, ২২তম সংখ্যা (চট্টগ্রাম : ১৯৯৮), পৃ. ১০০-১২১

১৫. *Popuation Census-2001*, Bangladesh Bureau of Statistics, Planing Division, Ministry of Planing (Dhaka : 2003), P. 13, 66

১৬. *ত্রৈমাসিক সম্যক*, ১০ বর্ষ (চট্টগ্রাম : ২০০৫), পৃ. ১২-১৮

১৭. পূর্বোক্ত

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. *ত্রিরত্ন*, সম্পাদক, বিপুল বড়ুয়া, প্রবন্ধ : *বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মূলনীতিতে বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন* – এ্যাডভোকেট মনোতোষ বড়ুয়া (চট্টগ্রাম : ১৯৯৫), পৃ. ৬০

২০. উদ্ধৃত, *বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মূলনীতিতে বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

Buddhist are not governed by the Hindu Law Succesion to the property of Buddhist ascetic in Bangladesh will be governed in the principle of equity and good conscience as there is no Buddhist Law governing succession. In 1956 Hindu Law in India was amened and the Buddhists of India were through within ambit of Hindu Law. ..... the Buddhists of Bangladesh are governed by Hindu Law with regard to Succession. উদ্ধৃত, *বোধি*, সম্পাদক ; অধ্যাপক অভিজিৎ বড়ুয়া মানু, প্রবন্ধ : বৌদ্ধ পারিবারিক আইন (চট্টগ্রাম : ২০০৩)

২১. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৬০

Menstration is impuere but, if properly contained it is also auspicious as it symbolize and announces in a positive way a womens generative potential.

*There Blanchetse, Meaning and Rituals of birth in Rural Bangladesh* (Dhaka : University press Limited, 1994) pp. 38

Dhaka University Institutional Repository

২২. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

২৪. মোমেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

২৫. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা :

২৬. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

২৭. 'সূত্র' হচ্ছে সূত্রপিটকের অর্ন্তগত কতকগুলো বুদ্ধবাণী যা ছন্দোবদ্ধাকারে ভিক্ষুরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে। এ সময় উপস্থিত সবাই নীরবতা পালন করে

২৮. অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মাইতি, *বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি* (কলকাতা : পূর্বাদ্রি প্রকাশনা, ১৯৮৮), পৃ. ০৭

২৯. এ গীতগান হচ্ছে একধরনের মেয়েলিগীত, যা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় এ সমাজেও বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

৩০. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩১. এ হাইট খোলা হলো ষষ্টির বিকৃতরূপ।

৩২. অনেকে আবার নিরাপদ সন্তান তথা উভয়ের সুস্থতা কামনা করে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে মানত করে। সুতরাং তারা ঐ স্থানে গিয়ে অন্নপ্রাশন করে থাকে। যে বিহারগুলোকে উপলক্ষ করে মানত করে তা নিম্নরূপ ; চিৎমরম বৌদ্ধবিহার, কাপ্তাই পার্বত্য জেলা ; গোবিন্দ ঠাকুরের মন্দির (বিহার) ; রাউজান, চট্টগ্রাম ; মহামুনি বৌদ্ধবিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম ; টেগরপুনি, পটিয়া, চট্টগ্রাম ; রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা ইত্যাদি

৩৩. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৩৪. *লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা* (কলিকাতা : ১৩৮০), পৃ. ২০

৩৫. প্রমোদ বড়ুয়া, বয়স : ৬৮, গ্রাম : কেয়াঁগড়, ডাক : আনোয়ারা, থানা : আনোয়ারা, জেলা : চট্টগ্রাম ২৬.০৬.০৬

৩৬. সোনাই বালা বড়ুয়া, পূর্বোক্ত

৩৭. সূর্যধন বড়ুয়া, বয়স : ৮৫, গ্রাম : পাইট্টালির কুল, ডাক+থানা : রাঙ্গুনীয়া, জেলা : চট্টগ্রাম, ০৫.০৬.২০০৬

৩৮. শান্তি বড়ুয়া, বয়স : ৬০, গ্রাম : বটতলী, ডাক : বটতলী, থানা : আনোয়ারা, জেলা : চট্টগ্রাম,২৬.১০.২০০৬

৩৯. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য : অশ্বজিৎ, মহানাম, বপ্প, ভদ্রিয় এবং কৌণ্ডিন্য

৪০. প্রমথ নাথ দাশ গুপ্ত, *গৌতম বুদ্ধ* (ঢাকা : ১৯২৭), পৃ. ১২৮

৪১. জ্যোতিপাল ভিক্ষু , *উদান* (চট্টগ্রাম : ১৩৩৭), পৃ. ১৩৪

৪২. যেমন : শ্রীলংকায় তিনটি নিকায় ; ক) সীমা নিকায়, খ) অমরাপুর নিকায় এবং গ) রামঞ্ঞ নিকায়। মায়ানমায় তিনটি নিকায় ; ক) সুধম্মা নিকায়, খ) সোয়েজন নিকায় এবং গ) দেবরা নিকায়। তাছাড়া থাইল্যাণ্ডেও দুটি নিকায় রয়েছে।

৪৩. যার সূক্ষ্ম ও স্থূল সকলপ্রকার পাপ সর্বতোভাবে উপশম হয়েছে ; তাকে শ্রামণ বলে অভিহিত করা হয়। ধর্ম্মপদ, *ধমার্থবর্গ*/২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. Robert Casesar Childers, *Dictionary of the Pali Language* (Kyoto : Rinsen Book company, 1987), P. 305

৪৫. Rhys Davids and Williaum Stede, *Pali English Dictionary* (New Deihi : Oriental Book Reprint corporation, 1921) P. 414

৪৬. *ধর্মপদ*, ব্রাহ্মণবর্গ/৩৮৮

৪৭. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ৩২

৪৮. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ১০৪

৪৯. সকাল এবং সন্ধ্যার সময় এ মহতী ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। বাড়ী এবং বিহারে এ অনুষ্ঠানে সম্পন্ন করার নিয়ম থাকলেও সবাই বিহারেই এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে।

৫০. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড), পৃ. ৮৬

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৫২. তি চীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসি সূচী চ বন্ধনং পরিস্সাবনঞ্চ দেমি অট্ঠবিধং পরিক্খারং, ধর্মদীপ্তি স্থবির সংকলিত, বুদ্ধের জীবন ও বাণী (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯), পৃ. ১৫১ ; আট প্রকার উপকরণ নিম্নরূপ : ক) সংঘটি, খ) উত্তরাসঙ্গ, গ) অর্ন্তবাস, ঘ) ভিক্ষাপাত্র, ঙ) ক্ষুর বা ছুরিকা, চ) সুইচ-সুতাপিণ্ড, ছ) কটিবন্ধনী এবং জ) পানি ছাকনী।

৫৩. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৫৪. এখানে ভিক্ষু-সংঘের আসন দায়ক-দায়িকার বা উপাসক-উপাসিকার আসন থেকে আলাদা। প্রায় সময় ভিক্ষুরা উচ্চাসনে আসীন হয়।

৫৫. ত্রিচীবর : ক) সংঘটি, খ) উত্তরাসঙ্গ, এবং গ) অর্ন্তবাস

৫৬. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ; ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬) ; জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৯৬৬) ; ধর্মপাল ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্নমালা* (কলিকাতা : ১৯৮৪) ; ধর্মদীপ্তি স্থবির, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯ বাংলা)

৫৭. প্রব্রজ্যা প্রদানকারীর মুখে মুখে শুদ্ধভাবে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী নিজেও এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করে। তিনি (প্রব্রজ্যাপ্রার্থী) শুদ্ধভাবে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত অন্যান্যকর্ম শুরু করে না।

৫৮. দ্রষ্টব্য : পাদটীকা নং - ১৫

৫৯. নব প্রব্রজিত এর দীক্ষাগুরুকে উপাধ্যায় বলা হয়।

৬০. প্রব্রজিতের নামগুলো নিম্নরূপ ; আনন্দমিত্র, সাধনানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, প্রিয়ানন্দ, সুগতানন্দ, শুদ্ধানন্দ, প্রিয়দর্শী, ধর্মদর্শী, বিজয়ানন্দ, বনশ্রী ইত্যাদি।

৬১. সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

৬২. *ধর্মপদ*, প্রকীর্ণবর্গ/৩০২

৬৩. সম্বোধি অঙ্গ : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি এবং উপেক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. ধর্মপদ, পণ্ডিতবর্গ/৮৭

৬৫. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

৬৬. Rhys David and Williaum Stede *Pali, English Dictionary*, op.cit, P. 147

৬৭. Robert Casesar childers, A *Dictionary of the Pali Language*, op.cit, P. 532

৬৮. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৬৯. *ধম্মপদ*, বুদ্ধবগ্গ/১৮৩

৭০. সাক্ষাৎকার, প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, পূবোক্ত ; ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, পূবোক্ত

৭১. R.B. Barua, *The Upasatha Ceremory of Buddhish Monk*, The Dacca University studies, Vol-XII, part-1 (Dhaka : 1964), P. 36

৭২. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭৩. বংশদ্বীপ মহাস্থবির, *কর্মবাচা সূত্র* (কলিকাতা : ১৯২৯), পৃ. ৪

৭৪. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৭৭. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্কারণ-১৩৯৪), পৃ. ২৮

৭৮. মৃতের সন্তান অথবা রক্তের সম্পর্কীয় যে কেউ একটি নতুন কলসী করে পুকুর কিংবা নদী থেকে ডুব দিয়ে উল্টা হাতে কোমড়ের পিছনে হাত রেখে পানি তুলে আনে। সেই পানি নতুন চুলার আগুনে ঈষৎ গরম করে। প্রথমে তিনবার বাটা হলুদ এবং পরে সাবান দিয়ে তাকে (মৃতদেহকে) ধৌত করে।

৭৯. এ খাটের চার কোণায় চারটি খুঁটি বেঁধে দিয়ে তাতে চাঁদোয়ার মতো এক টুকরা কাপড় টেনে দিয়ে ছায়া দান করে।

৮০. এ উপলক্ষে এ জনগোষ্ঠীর একটি প্রবাদ নিম্নরূপ ;

শিয়রে বসে নাতি
মাথায় দেয় ছাতি।

৮১. খই পুষ্পাঞ্জলীর প্রতীক। অধিক পুষ্পসংগ্রহ এ সময় সম্ভব নয় বিধায় এ পুষ্প-এর পরিবর্তে খই ছিটিয়ে তার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে।

৮২. ধম্মরত্ন মহাস্থবির, *মহাপরিনির্বাণ সুত্ত* (চট্টগ্রাম : ১৯৪১), পৃ. ১৪৭

৮৩. সাক্ষাৎকার : সোনাই বালা বড়ুয়া, পূবোক্ত

৮৪. যার সন্তান নেই, রক্ত সম্পর্কীয় যে কেউ তার অন্তিমযাত্রার ক্রিয়াগুলো সম্পন্নকরে ।

৮৫. বিভিন্ন গ্রামের বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপচারিতায় এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়। তারা আরো মনে করে এগুলো তারা বংশ পরম্পরায় দেখে অনাদিকাল থেকে শিখে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮৬. *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা* অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ৫৩০

৮৭. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৩৬৬), পৃ. ৪৮

৮৮. পাঁচটি ইচ্ছা নিম্নরূপ :

১. আমরা যেরূপ দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা সন্তান লালন-পালন করছি ঠিক পুত্রও আমাদের বৃদ্ধকালে নানা খাদ্যভোজ্য দ্বারা সেবা করবে। ২. পুত্র স্বীয়কর্ম পরিত্যাগ করে রাজকুলাদিতে বা অন্য কোনোপ্রকারে আমাদের কার্য উপস্থিত হলে তা সম্পাদন করবে। ৩. পুত্র স্থাবর-অস্থাবর ধনসম্পদ সব রক্ষা করে কুলবংশ চিরস্থায়ী করবে। ৪. পুত্র আমাদের বংশানুক্রমে আগত ক্রিয়াদি সম্পাদন করে নিজেকে তার উত্তরাধিকারী করবে। ৫. পুত্র আমাদের পরলোকগত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শীলবান ভিক্ষুসংঘকে দান করে পুণ্যদক্ষিণা প্রদান করবে। (*অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত)

৮৯. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৯০. পরিবারে বড়জনের আগে ছোটজন মারা গেলে সে ক্ষেত্রে মোচাভাত মাচাং-এর পরিবর্তে নিচে দেওয়ার প্রথা এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান।

৯১. জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৬), পৃ. ৪৮

৯২. ধম্মরত্ন মহাস্থবির, *মহাপরিনির্বাণ সুত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

৯৩. ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৬৭

৯৪. ধর্মতিলক স্থবির অনূদিত, *সদ্ধর্ম রত্নকার* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ৭২-৭৪। দিলীপ বড়ুয়া দীপু সংকলিত, *দান* (চট্টগ্রাম : ২০০৩), পৃ. ৫৫-৫৭

৯৫. বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত

*Dhaka University Institutional Repository*

# উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি বাংলাদেশ। তন্মধ্যে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীও সুদুর অতীত থেকে বসবাস করে আসছে এদেশে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা খুবই অল্প কিন্তু তারা বিনয়ী স্বভাবজাত। সবাই তাদেরকে শান্তিপ্রিয় মনে করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী এদেশের আদি বাসিন্দা তাতে সন্দেহ নেই। অতীতের কোনো একসময় এ জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত দিকগুলোর আকর্ষণে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। তবে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক লিখিত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কোনোরূপ দলিলাদি নেই। ফলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কেউ নিশ্চিতভাবে তেমন কিছু জানতে পারে না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিমরা ১৮৫৭ পযর্ন্ত অখণ্ড বাংলা শাসন করে। পলাশী যুদ্ধের পরপরই বাংলা বৃটিশ অধিকারে। এদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকচারিক আচার-অনুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক অন্বেষণ অত্যান্ত দুরূহ ও কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন। তাই এই সময়কে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়। এ সময়ে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এদেশে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীসহ সকল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জাতীয় জীবনে জোঁয়ার আসে সিপাহী বিদ্রোহের পর অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের পর। এ সময়েই দূরবর্তী আরাকান থেকে সংঘরাজ সারমিত্র (সারমেধ) মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮২) এক মহান আলোকবর্তিকা হিসেবে এদেশে উপস্থিত হন। তিনিই মূলত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে নব উদ্দীপনায় বৌদ্ধধর্মমুখী করে তোলেন। সংস্কারবাদী বৌদ্ধভিক্ষু হিসেবেও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীতে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এ মহৎ ত্যাগী পুরুষ সারমিত্র (সারমেধ) মহাস্থবিরের আন্তরিকতার ফলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ফিরে পায় আদর্শিক, নৈতিক ও নির্বাণমুখী জীবনযাপন প্রণালী। এ সময় থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী ।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হলো বাংলা হলো দ্বিখণ্ডিত। এ সময় এদেশের কিছু বড়ুয়া জনগোষ্ঠী প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে রইলো আবার কিছু এদেশের মায়ামমতা

Dhaka University Institutional Repository

বিসর্জন দিয়ে চলে গেল ভারতে। তাছাড়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যান্দাবুর (য়্যাগুনো) চুক্তির ফলে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অনেকে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নিজেদের এদেশের ভূমিজ সন্তান বলে দাবী করে।

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতিক দেশ। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশকে করেছে ঋদ্ধ। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি এদেশের অখণ্ড সংস্কৃতির একটি অংশ। এদেশের বড়ুয়া জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ইত্যাদিতে বৌদ্ধক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটলেও জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রবাদ-প্রবচন, মেয়েলীগীত, কীর্তন ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানাঙ্গনে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সমন্বিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর প্রায় সব অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। তাছাড়া কিছু কিছু মুসলিম আচারও এ জনগোষ্ঠী পালন করে। একসময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠী আরাকানী নামগ্রহণে এগিয়ে আসলেও এখন তা আর চোখে পড়ে না। তবে এখনো বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানে আরাকানী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহৃত আরাকানি শব্দগুলো বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মজ্জাগত হয়ে গেছে, তাই এগুলো থেকে তারা আর কখনো নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে পারবে না।

গৌতম বুদ্ধের অনুসায়ী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী বুদ্ধের কর্মবাদ, অনিত্য, অনাত্মা ও দুঃখে যেমন বিশ্বাসী তেমনি আবার 'দান' সম্পর্কিত বিষয়েও তারা খুবই শ্রদ্ধাশীল। বুদ্ধের ধর্ম আধ্যাত্মিকতার কিংবা প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাসের ধর্ম নয়। বুদ্ধের যুক্তি ও সাম্যের আদর্শ বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে আশার আলো জাগিয়েছে। আগেই বলেছি ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল। এসময় এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব তুলে ধরতে তেমন কোনোরকম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেনি। এ সময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠান আচরিত হতো। যেমন : লক্ষ্মীপূজা, মনসা পূজা, কার্তিক পূজা, শনি পূজা ইত্যাদি। তাছাড়া সত্যপীরের সিন্নি প্রদান প্রথাও বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে সারমিত্র (সারমেধ) মহাস্থবির (১৮০০-১৮৮২)-এর মাধ্যমে এ বড়ুয়া জনগোষ্ঠী সংস্কার মুক্ত হয়। এ সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রবাদ নিম্নরূপ ----

আশ্বিইন আইলে বড়ুয়াঅল
হই যাইগুই পঅঁল
আরাকানরতুন লঅলী আঁই

Dhaka University Institutional Repository

কাইটতু ন দে ছঅঁল

অর্থাৎ আশ্বিন মাস আসলে বড়ুয়ারা ছাগল কাটার জন্য পাগল হয়ে উঠলেও আরাকান থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তা করতে দিতো না।

সংস্কার-পরবর্তীকালে বড়ুয়া জনগোষ্ঠী পায় নবপ্রেরণা ও প্রোৎসাহ। এ সময় বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনে প্রবারণা, কঠিনচীবর দানোৎসব, সীবলী পূজা, বিদর্শন ধ্যান ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন শুরু করে। কঠিন চীবর দানোৎসব ও বিদর্শন ধ্যান বড়ুয়া জনগোষ্ঠীকে ধর্মানুশীলনের দিকে নিয়ে গেছে। বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন না কিংবা ঐশ্বরিক গুণাগুণও তাঁর কাছে নেই। তারপরও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী তাদের প্রাত্যহিক পূজা অচর্নায়, ধর্মবিশ্বাস পরিপালনের সময় বুদ্ধকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে প্রার্থনা করে। এ সময় তারা সংসারের সুখ ও উন্নতি কামনা করে ; সর্বোপরি পরিবারের সবার মঙ্গল কামনা করে। বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠী লোকসংস্কৃতিতে খুবই সুসংহত ও সমৃদ্ধ । বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি নব প্রান্তর বিশেষ। লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকায়ত ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবনধারণের বস্তুগত উপকরণসহ ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্রমালা

Dhaka University Institutional Repository

# চিত্রসূচি

১. বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধবেদীতে উপাসক-উপাসিকার প্রদত্ত বুদ্ধপূজা।

২. গৃহের উঠানে সীবলী পূজা অনুষ্ঠান।

৩. বৌদ্ধ বিহারে পঞ্চশীল প্রদানরত ভিক্ষু এবং পাশে উপবিষ্ট শ্রামণ।

৪. বৌদ্ধবিহারে সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রবীণ বৌদ্ধভিক্ষু।

৫. পূর্ণিমায় পূজার বেদীতে উপাসিকার বুদ্ধপূজা অর্পন।

৬. পূর্ণিমা দিবসে পূজা নিবেদনের দৃশ্য।

৭. সংঘদান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘ সূত্রপাঠ করছেন।

৮. অষ্টপরিষ্কার দান অনুষ্ঠান।

৯. কঠিনচীবর দানানুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ভিক্ষুসংঘ (উপরে) ও মঙ্গলঘট বা পুরোহিত (নীচে)

১০. একটি সজ্জিত কল্পতরু বৃক্ষ।

১১. কঠিনচীবর দানানুষ্ঠানে আলোচনা সভা।

১২. গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২২.১০.২০০৬।

১৩. শ্মশান প্রস্তুতকরণের দৃশ্য।

১৪. শ্মশানে মৃতদেহকে মুখাগ্নি করা হচ্ছে।

১৫. মোচা ভাত-এর দৃশ্য।

১৬. মৃত্যুবার্ষিকীতে পরিত্তা পাঠে উপস্থিত সকলের নীরবতা পালন।

১৭. বরের তৈলাভিষেক অনুষ্ঠান।

১৮. বিয়ে বাড়িতে মেয়েলীগীত পরিবেশন।

১৯. গবেষক কর্তৃক মেয়েলীগীত সংগ্রহ

*Dhaka University Institutional Repository*

২০. গ্রুপ আলোচনা গবেষক, ২১.১০.২০০৬ ।

২১. মন্ত্রদাতার মন্ত্রপাঠ।

২২. ভূমি স্পর্শ দিবসে বরের প্রথমবার শ্বশুড়বাড়ি প্রবেশ।

২৩. শিশুর অন্নপ্রাশন।

২৪. কর্ণছেদন বা কান ফোঁড়ানি অনুষ্ঠান।

২৫. প্রব্রজ্যালাভীদের বিহারে গমন।

২৬. নবীন প্রব্রজ্যাধারী শ্রামণ।

২৭. ফানুস তৈরীতে ব্যস্ত যুবক ও কিশোর।

২৮. ফানুস উত্তোলনের দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

১

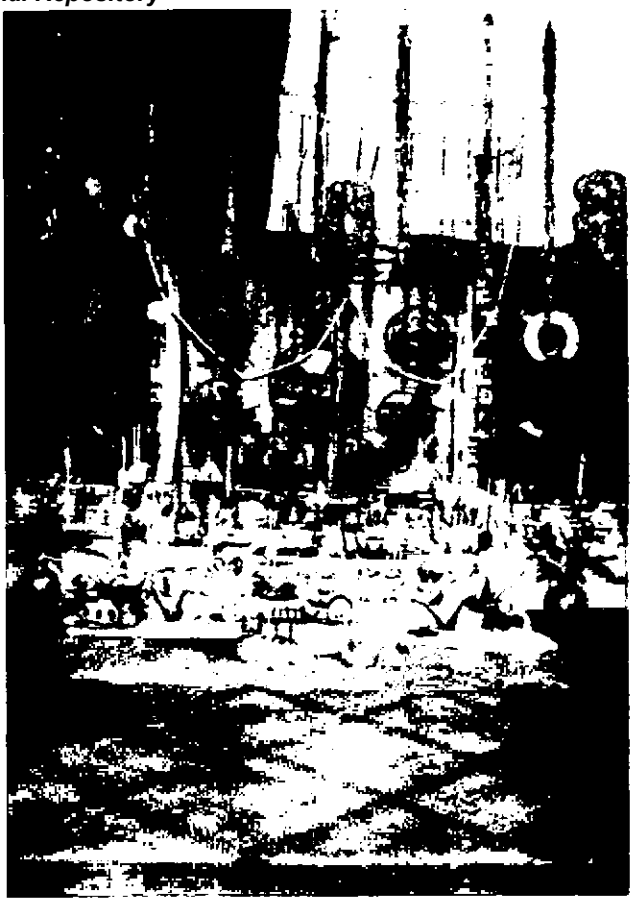

২

৩

৪

৫

৬

৭

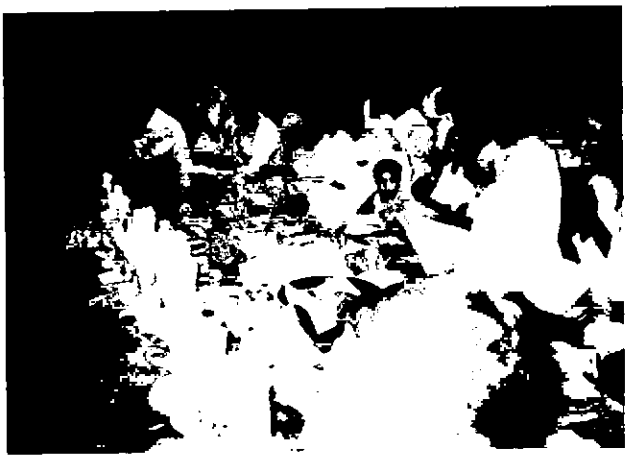

৮

৯

১০

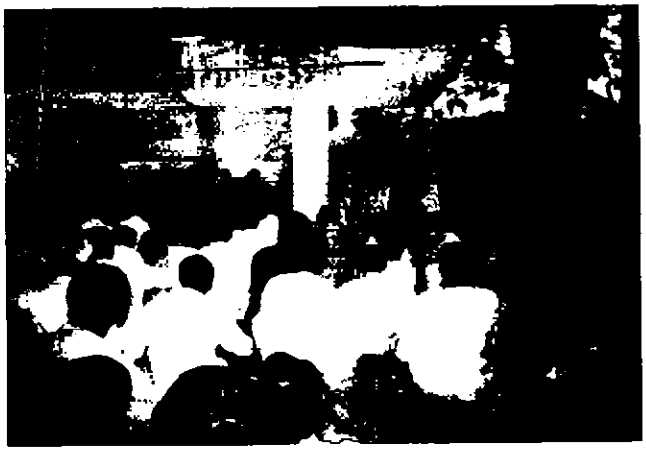

১১

১২

Dhaka University Institutional Repository



১৩



১৪



১৫



১৬



১৭



১৮



১৯



২০

২১



২২

২৩

২৪

tutional Repository

২৫

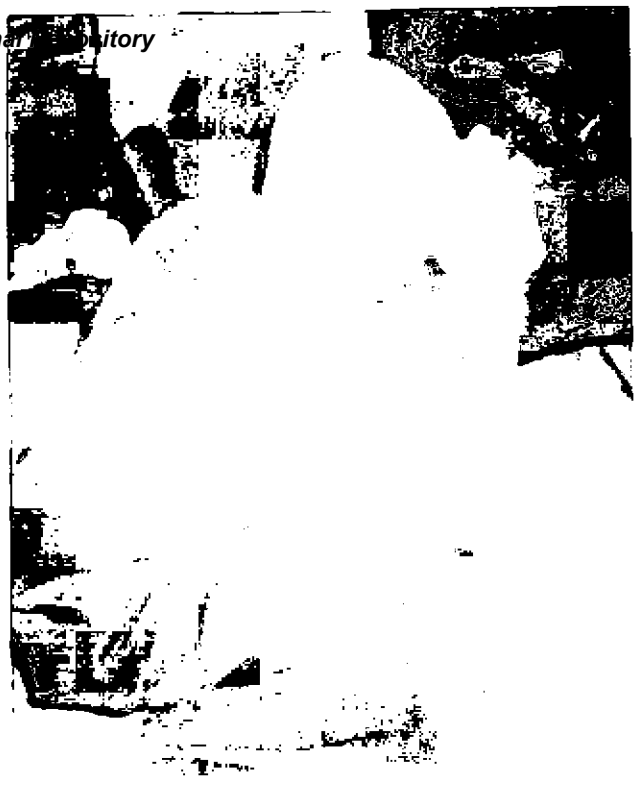

২৬

২৭

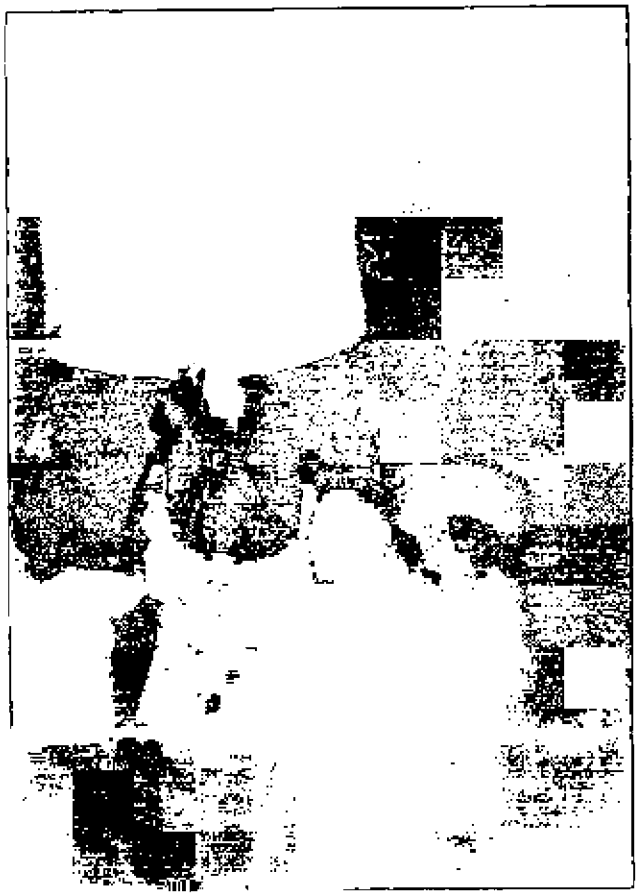

২৮

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

## সহায়ক বাংলা গ্রন্থপঞ্জি


অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯)

অতুল সুর, *বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ* (কলিকাতা : বেস্টবুক্স, ১৯৯১)

অরুন বিকাশ বড়ুয়া, *বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়* (চট্টগ্রাম : অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ১৯৮৯)

অমৃতানন্দ মহাস্থবির, *ধর্মদীপিকা* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৪)

অশ্বঘোষ, *বুদ্ধচরিত* (কলিকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮)

আশরাফ সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য* (ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৫)

আবদুল হাফিজ, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫)

আতোয়ার রহমান, *লোককৃতি কথা গুচ্ছ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ক্যালাকাটাবুক হাউজ, ১৯৬২)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য* (কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি. ১৯৭৩

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকশ্রুতি* (কলিকাতা : পুস্তকবিপনী, ১৯৮৫)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলিকাতা : এ মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. ১৯৯০)

আনন্দ মিত্র মহাথের, *উপাসনা* (কলিকাতা : ১৯৮৯)

*আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

আহমদ শরীফ, *কালের দর্শনে স্বদেশ* (ঢাকা : ১৯৮৫)

আহমদ শরীফ, *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* (ঢাকা : অক্ষর, ১৯৮৭)

আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনা বিবর্তনধারা* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮০)

আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২)

আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৫)

আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম : ১৯৮০)

আবদুল হক চৌধুরী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)

আবদুল মাবুদ খান, *সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম* (ঢাকা : সৌগত প্রকাশন, ১৯৯১)

ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪)

উমেশ মুচ্ছদ্দী, *বড়ুয়া জাতি* (চট্টগ্রাম : ১৯৫৯)

এম. নুরুল হক, *বৃহত্তর চট্টল* (চট্টগ্রাম : সন তারিখ অনুল্লেখিত)

ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ প্রবচন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

কালীপ্রসন্ন সেন, *শ্রী রাজমালা*, ২য় লহর (ত্রিপুরা : ১৯২৭)

কাজী দীন মুহাম্মদ সম্পাদিত, *লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯)

খোন্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলাদেশের উৎসব* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৫৫)

খোদেজা খাতুন, *বগুড়ার লোকসাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০)

জ্যোতিপাল ভিক্ষু, *উদান* (চট্টগ্রাম : ১৩৩৭ বাংলা)

জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (চট্টগ্রাম : ১৯৬৬)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্ম-অন্বেষা : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসম্প্রদায়* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)

জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাশ, *বাংলাভাষার অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)

ডা. সিতাংশ বিকাশ বড়ুয়া, *চট্টগ্রামে বৌদ্ধদেব ইতিহাস* (চট্টগাম : ১৯৮১)

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩)

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস*, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

দিলীপ বড়ুয়া দীপু সংকলিত, *দান* (চট্টগ্রাম : ২০০৩)

ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬)

ধর্মপাল ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্নমালা* (কলিকাতা : ১৯৮৪)

ধর্মদীপ্তি স্থবির, *বুদ্ধের বাণী ও জীবন* (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯ বাংলা)

ধর্মরত্ন মহাস্থবির, *মহাপরিনির্বাণ সুত্ত* (চট্টগ্রাম : ১৯৪১)

ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৩৬৬ বাংলা)

ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৮৭)

ধর্মাধার মহাস্থবির, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫)

ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৪ বাংলা)

নুরুল হক, *বৃহত্তর চট্টল* (চট্টগ্রাম : সন-তারিখ অনুল্লিখিত)

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির ইতিহাস* (চট্টগ্রাম, ১৯৮৬)

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্র ও ইতিবৃত্ত* (চট্টগ্রাম : ১৯৯০)

নারায়ণ চৌধুরী, *বাংলা গানের জগৎ* (কলিকাতা : ফার্মা কে.এম.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১)

নীলাম্বর বড়ুয়া ও ধর্মজ্যোতি স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৩৬৬ বাংলা)

নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং ১৪০২ বাংলা)

প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সমাজজীবন* (চট্টগ্রাম : ২০০৬)

Dhaka University Institutional Repository

প্রদ্যোত কুমার মাইতি, *বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি* (কলিকাতা : পূবার্দ্রি প্রকাশনা, ১৯৮৮)

প্রদ্যোত গুহ, *বাদশাহী আমলে বিদেশী পর্যটক* (কলকাতা : চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ১৯৭৩)

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড, ১৯৩৭)

পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৪)

পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১)

পবিত্র সরকার, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* (কলিকাতা : চিরায়ত প্রকাশনী, ১৯৯১)

প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, *সদ্ধর্মমিত্র* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৭)

প্রণব কুমার বড়ুয়া, *পালোত্তর যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, অপ্রকাশিত থিসিস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫)

বংশদ্বীপ মহাস্থবির, *কর্মবাচা সূত্র* (কলিকাতা : ১৯২৯)

বিশুদ্ধাচার স্থবির, *সীবলী ব্রতকথা* (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ২০০০)

বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস* (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯)

বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* (কলিকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্টেবিউটার্স, ১৯৮২)

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩)

ব্রতীনাথ মুখোপধ্যায়, বঙ্গ, *বাঙ্গালী ও ভারত* (কলকাতা : ২০০০)

বেণীমাধব বড়ুয়া, *বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি* (কলিকাতা : ১৯২৩)

বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত, *ভারতবর্ষ* (কলিকাতা : নাথ পাবলিশিং, ১৯৯৯)

বুদ্ধদেব রায়, *বাংলা গানের স্বরূপ* (কলিকাতা : ফার্মা কে.এল.এম.প্রা. লি., ১৯৯০)

বিপ্রদাশ বড়ুয়া সম্পাদিত, *শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস এবং চাকমা রাজবংশের ইতিহাস* (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫)

*বাংলাপিডিয়া*, সপ্তম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)

বিরাজ মোহন দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত* (রাঙামাটি : ২০০৫)

বাংলাদেশ বিপনন সংস্থা, *বাংলাদেশের মেলা* (ঢাকা : ১৩৯০ বাংলা)

ভাস্কর চট্টোপধ্যায়, *গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, প্রথম ভাগ (কলকাতা : প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩)

ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৫৪)

ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১ বাংলা)

ভিক্ষু প্রিয়দর্শী, *সীবলী চরিত্র* (চট্টগ্রাম : ১৩৬৮ বাংলা)

ভিক্ষু জে প্রজ্ঞাবংশ, *বিদর্শন ভাবনায় প্রজ্ঞাধূর* (চট্টগ্রাম : আর ফুরসো জ্ঞানরত্ন প্রকাশন, ১৯৯৮)

মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২)

মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তিমার্গ* (চট্টগ্রাম : ১৩৯৫ বাংলা)

মাহমুদা ইসলাম, *বিয়ে* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)

মুস্তাফা মাসুদ, *যশোরের লোকসাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, *নরসিংদী গাজীপুরের লোকঐতিহ্য : বিবাহ ও মেয়েলি ছড়াগীত* (নরসিংদী : গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশন, ২০০২)

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *লোকসাহিত্যে ছড়া* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮)

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমীপুরী সংকলিত, *লোকসাহিত্য ধাঁধা ও প্রবাদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮)

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩)

মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসাহিত্যের নানাদিক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোকউপাদান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬)

মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পাঠ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পাঠ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, *বৌদ্ধ গান ও দোঁহা* (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩)

মোহন বড়ুয়া, *বুদ্ধ সন্ন্যাস* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৬)

মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৮)

মাহবুব-উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস-পুরানা আমল* (চট্টগ্রাম : নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫)

মানবেন্দ্র বন্দ্রোপধ্যায়, *মনুসংহিতা* (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল, ১৯৯৫)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংকলন* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭ বাংলা)

রণব্রত সেন, *ধর্মপদ* (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৮)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মুখোপধ্যায়, *ফা-হিয়েনের দেখা ভারত* (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল.এম.প্রা.লি., ১৯৮৬)

শিপ্রা দত্ত, *চট্টগ্রামের লোকসংগীত* (কলিকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৯৭৫)

শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত স্থবির, *ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র* (রেঙ্গুন : ১৯৬০)

শ্রী কৈলাস চন্দ্র, *রাজমালা* (আগরতলা : ১৪০৫)

সতীশ চন্দ্র ঘোষ, *চাকমা জাতি* (কলিকাতা : ১৩১৬ বাংলা)

সামীয়ূল ইসলাম, *বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধূলা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)

Dhaka University Institutional Repository

সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা : ১৩৮০)

সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (ঢাকা : ১৯৮৭)

সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০)

সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, *মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম* (ঢাকা : ১৯৮৮)

সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়* (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০০৪)

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, *বৌদ্ধ মহিয়সী নারী* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৪০০)

সুশীল কুমার ভট্টাচার্য, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৭০)

সুশীল কুমার দে, *বাংলা প্রবাদ* (কলিকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৬)

সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫)

সুধীর চন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী, *কীর্তন পদাবলী* (কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, ১৩৪৫ বাংলা)

সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া, *মার বিজয়* (পার্বত্য চট্টগ্রাম : ১৯৬৬)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *রচনাসংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪)

হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া* (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৭১)

হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬)

হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *গৌরবঙ্গ সংস্কৃতি* (কলিকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯)

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য পত্রিকা, সংখ্যা-৪১, *কার্তিক-১৪০৪*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র (ঢাকা : ১৩৬৪)

দৈনিক আজাদী, ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, *হাজার বছরের চট্টগ্রাম* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৫)

অনোমা, নির্বাহী সম্পাদক : *বাদল বরণ বড়ুয়া*, ২২তম সংখ্যা (চট্টগ্রাম : ১৯৯৮)

অনোমা, নির্বাহী সম্পাদক : *বাদল বরণ বড়ুয়া*, ২৩তম সংখ্যা (চট্টগ্রাম : ১৯৯৯)

অনোমা, নির্বাহী সম্পাদক : *বাদল বরণ বড়ুয়া*, ২৪তম সংখ্যা (চট্টগ্রাম : ২০০০)

ত্রিরত্ন, সম্পাদক, *বিপুল বড়ুয়া* (চট্টগ্রাম : ১৯৯৫)

সম্যক, সম্পাদক, *স্বপন বড়ুয়া*, ১০ম বর্ষ, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা (চট্টগ্রাম : ২০০৫)

বোধি, সম্পাদক, অধ্যাপক অভিজিৎ বড়ুয়া মানু, *কঠিনচীবর দানসংখ্যা-পটিয়া* (চট্টগ্রাম : ২০০৩)

কালি ও কলম, অষ্টম সংখ্যা-জুলাই (ঢাকা : ২০০৫)

ভারত বিচিত্রা, *তেত্রিশ বর্ষ* (ঢাকা : ২০০৬)

দৈনিক ঈশান, ২৫/১২/১৯৯৭ (চট্টগ্রাম : ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ঈশান, ২৬/১২/১৯৯৭ (চট্টগ্রাম : ১৯৯৭)

দৈনিক ঈশান, ২৭/১২/১৯৯৭ (চট্টগ্রাম : ১৯৯৭)

দৈনিক ঈশান, ২৮/১২/১৯৯৭ (চট্টগ্রাম : ১৯৯৭)

পঞ্জিকা

শিবশংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *সুদর্শন ডাইরেক্টরী* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতি, ১৪১১ বাংলা)

লোকনাথ ডাইক্টেরী পঞ্জিকা (কলিকাতা : ১৩৮০)

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Alexander Staggerty Krappe, *The Science of Folklore* (U.S.A : Methuen & Co. Ltd. 1962)

A.K. Majumder, *Concise History of Ancient India* (New Delhi : Munshiram Manaharlal Publishers, 1983)

Anderson and Perker, *Society : Its Organization and Operation* (New Delhi : East West Press Pvt. Ltd. 1966)

Arthur. P. Phayre, *History of Burma* (London : Trubner & Ludgati Hill, 1883)

D.G.E. Hall, *Burma* (London : Hutchinson's University Library, 1950)

Dan-Ben-Amus, *Folklore Context Essays* (New Delhi : South Asian Publishers Pvt. Ltd, 1982)

Dilip Kumar *Barua*, Syncretism in Bangladeshi Buddism (Nagaya : 2000)

Dr. Mehm Tin Mon, *The Essence of Buddhist Abhidhamma* (Yangoon : Mya Mon Yadany Publication, 1995)

Dr. S.L. *Baruah* (New Delhi : Munshiram Monaharlal Publisher Pvt. Ltd. 1985)

Fausabal, *Jataka*, Vol-II (London : Pali Text Society, 1879)

Francis Story, *Demeion of Buddhist Thought*, vol-III (Kandy : Kandy Buddhist Publication Society, 1976)

George, G. Garey, *Maryland Folklore and Folklife* (Maryland : Tide Watere Publishers), 1979

G.E. Harvey, *History of Burma* (London : Frank Cass & Co. Ltd. 1967)

G.E. Harvey, *Out Line of Burmese History* (London : 1925)

Dhaka University Institutional Repository

Jan Harold Brunvand, *The Study of Americans Folklore* (New York : W.W. Norton & Company, 1980)

Jerzy Gluski Edited, *Proverbs* (Amsterdam : Elsevier Publishing Company, 1971)

K. Sri Dhammananda, *Human Life and Problems* (Kualalumpur : 1997)

M.K.U. Molla, *The New Provice of Eastern Bengal and Assam* (Rajshahi University : The Institute of Bangladesh Studies, 1981)

Robert Casesar Childers, *Dictionary of Pali Language* (Kyoto : Rinsen Book company, 1987)

Risely. H.R, *Tribes and Castes of Bengal*, Vol-II (Calcutta, 1981)

Sir Ediwn Arnold, *Light of Asia* (London : Routledge Kegan, Paul Ltd. 1964)

Sutra Translation committee of the U.S.A. & Canada, *The Seekers Glossary : Buddhism* (New York : 1988)

Ed. M. Leon Feer, *Samyutta Nikaya*, Vol-V, (London : Pali Text Society, 1976)

S. Dhammika, *Good Question, Good Answer* (Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1991)

Sandhya Mukerje, *Some Aspects of Social Life in Ancient India* [325-BC-200 AD] (Allahabad : 1976, Narayan Publishing House)

S.C. Sarker, *Some Aspects of the Earliest Social History of India* [Pre-Buddhist Ages] (Patna : Janaki Prakashan, 1985)

Sukamal Chaudhuri, *Contemporary Buddhism in Bangladesh* (Calcutta : 1982)

Sir Edword Gait, *History of Assam* (Calcutta : Thacker, Spink & co. 1926

T.W. Rhys Davids and Stede, *Pali English Dictionary* (New Delhi : Oriental Book Reprint Corporation, 1921)

Tristram. P. Coffin III, *American Folklore* (America : Voice of American Forum Lectures, 1968)

Tristram P. Coffin III and Henning Cohen, *Folklore in America* (New York : Doubleday & Company, 1960)

There Blanchetse, *Meaning and Rituals of Birth in Rural Bangladesh* (Dhaka : University Press Limited, 1994)

Dhaka University Institutional Repository

W.S. Desai, *A Pageant of Burmese History* (Calcutta : Orient Longmans, 1961)

## Gazetteers

B.C. Allen, *Assam District Gazetteers*, Vol-III (Calcutta : 1903)

L.S.S. Omaly, *Eastern Bengal District Gazetteer Chittagong* (Calcutta : 1908)

S.N.H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers*, Chittagong (Dhaka : 1970)

*Population Census-2001*, Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry Planning (Dhaka : 2003)

W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, vol-VI, ( London : 1876)

## English Journals

*Journal of the Pali Text Society*, vol-I (London : 1881)

*The Dacca University studies*, vol-XII, part-1 (Dhaka-1964)

*Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. VIII, No-1 (Dhaka, 1963)

*Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. X, No-1 (Dhaka, 1963)

*The Journal of Graduate School of Humanities* (Japan : Aichi Gakuin University, 2000)